ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

প্রথম বর্ষ □ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ সংখ্যা □ মে-জুন ২০১৩ □ ৩০ টাকা

Subscribe Online
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

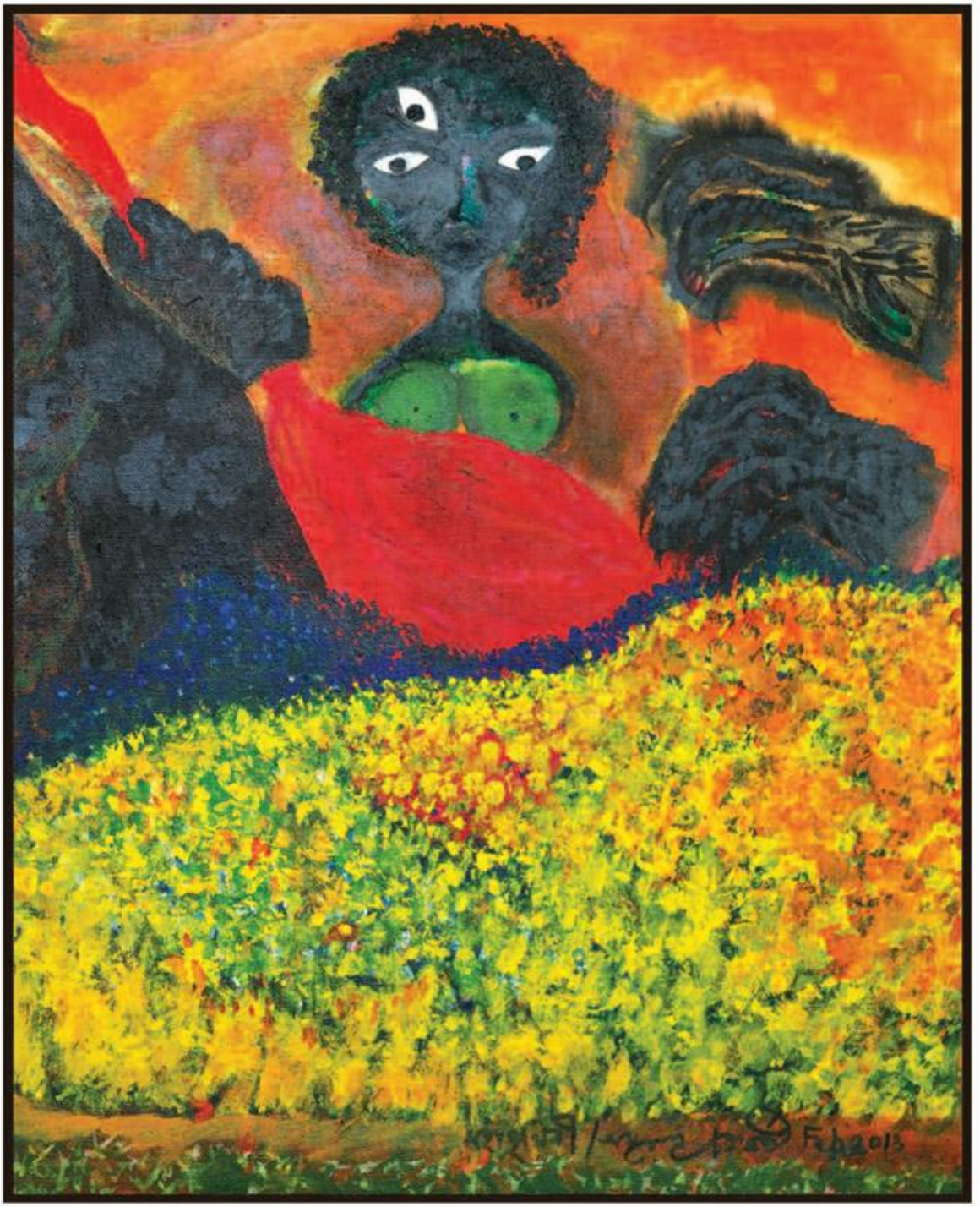

ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক। ১৮″×২৪″ (একাংশ)। শিল্পী: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ল

ছোটদের পরমাশ্চর্য পত্রিকা

ছেলেবেলা

মনরাঙানো ছুটিসংখ্যা। ১৩৬ পাতা। মাত্র ১৫ টাকা

এত সব গল্প উপন্যাস ছড়া কবিতা যে সারাদিন পড়েও শেষ হবে না।

এমনকী সারা বছর ফিরে ফিরে পড়তে হবে

আমাজনের জঙ্গলে কাহিনি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

চিত্রনাট্য ও ছবি: অর্ক পৈতণ্ডী

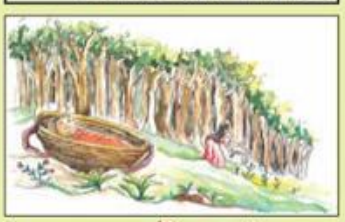

ধারাবাহিক: ছোট ডাইনির গপ্পো
উলিবুরুর জঙ্গলে, গৌর যাযাবর

বুনবুন্দুলুইদের কথা

মৈত্রেয়ী নাগের রহস্য-উপন্যাস মাকড়সার জালে

নষ্টামির গাছ

পাঁচ মহাদেশের ছয় উপকথা দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুবদেশি উপকথা
ফিরে পড়ার সম্পূর্ণ উপন্যাস ঋষিকুমার অশোক চক্রবর্তীর রূপান্তরে বিলিতি ছড়া

সুখ-দুঃখ, দত্যি-দানো, ভূত-ভগবানের আশ্চর্য সব গল্প। এছাড়া আরও অনেক কথা কাহিনি ধাঁধা কবিতা ছড়া ছবি

আগাগোড়াই মনভরানো লেখার সঙ্গে চোখজুড়ানো ছবি

সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছে ও পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে অনলাইন গ্রাহক হতে ▸ www.swarnakshar.in

www.ekashtipathar.com

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতায়ও সর্বত্র পাবেন
পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছে
আগে থেকেই বলে রাখুন।
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

এক বছরের গ্রাহকমূল্য ৩৬০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

মহাশ্বেতা দেবী: *জ্ঞানপীঠ, ম্যাগসেসে, আকাদেমি প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিতা লেখিকা।*

বহু ছেলেমেয়ে 'কর্মক্ষেত্র' পড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।
অন্তত চারটি ছেলে ও দুটি মেয়ের
কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।
যারা 'কর্মক্ষেত্র'-র সহায়তায়
কাজ পেয়েছিল। ওদেরকে আমিই
'কর্মক্ষেত্র'-র গ্রাহক করে দিয়েছিলাম।
'কর্মক্ষেত্র' প্রথম থেকেই ছোটখাটো
ব্যবসার এক আশ্চর্য নির্দেশিকা দিয়ে
আসছেন, যা অনুসরণ করলে যুবাপ্রজন্ম
বাঁচবার ও বাঁচাবার পথের সন্ধান পাবে।
টুথপেস্ট বানাবেন, না হাওয়াই চপ্পলের
ফিতে? মেশিনে পোট্যাটো চিপস বানিয়ে
বেচবেন, না ভিনিগার তৈরি করবেন?
'কর্মক্ষেত্র' এত বছরে, এরকম অন্তত
এক হাজার অল্প পুঁজির ব্যবসার হদিশ
দিয়েছে। ওই সব ব্যবসায় নেমে
কয়েক হাজার মানুষই স্বাবলম্বী হয়েছেন।
মৃত্যু যখন দরজায় ঘা দিচ্ছে, তেমন
সময়ে যে ঔষধ বাঁচাতে পারে, তাকে
আমাদের মুনিঋষিরা নাম দিয়েছেন
বিশল্যকরণী। আমি তো 'কর্মক্ষেত্র'কে
বলব বিশল্যকরণী।
'কর্মক্ষেত্র' যেভাবে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা
করার পরিকল্পনা জোগায়, তাতে তো
সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যেন
নতুন জীবনের রসদ পায়।
'কর্মক্ষেত্র' বলছে, পরিশ্রম করো
সততার সঙ্গে, শ্রমকে ভয় পেও না,
স্বীয় কর্মগুণে ভাগ্যকে জয় করো।
আজ দেশের তরুণ প্রজন্মকে এই কথা
বলার মহান দায়িত্ব 'কর্মক্ষেত্র' গ্রহণ করেছেন,
আমি অন্তর থেকে যেন সাড়া পাচ্ছি।

মহাশ্বেতা দেবী

৩ জুলাই, ২০০৫

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ
ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

প্রথম বর্ষ। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ সংখ্যা। মে-জুন ২০১৩। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২০

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৫

ক্ষণের বচন ৮। শব্দবক্র ৮

চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডী লাহিড়ী। মদনা ৭

পু র নো অ্যা ল বা ম

কালান্তর। লেখক-পরিচিতি। প্রতাপকুমার রায় ৬৪

হেঁয়ালির ছন্দ। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯

ধা রা বা হি ক

একাত্তরের দিনগুলি। জাহানারা ইমাম ১৪

আমার ছবিজীবন। শুভাপ্রসন্ন ২৪

বিষাদগাথা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৭১

মহাজনসঙ্গ। অমিতাভ চৌধুরি

তুষারকান্তি ঘোষ ১০ প্রেমেন্দ্র মিত্র ১২

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ। সবিতেন্দ্রনাথ রায়

অভিভাবক রাজশেখর বসু ৬৫

রাজশেখরের ছেলেবেলা। গিরীন্দ্রশেখর বসু ৬৯

ক বি তা র পা তা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি কবিতা ও চিঠি ৫৩

কবিতা-পরিচয়

একটি উজ্জ্বল মাছ: বিনয় মজুমদার ৬০

জ্যোতির্ময় দত্ত

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা, কবির উত্তর ● মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ৬২

ভ্র ম ণ ক থা

রাজা তেইদের দ্বীপে। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৩১

ল ঘু ভা ষ - গু রু ভা ব

মৃত্যু: জীবনের প্রথম পাঠ। পবিত্র সরকার ৪৭

বুড়োক্রেজি। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূরিভোজের ব্যয়ভার ৮৪

নি য় মি ত

কয়েকটি চিঠি ৮৬। বই ঠেক ৮৭

প্রচ্ছদ: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক। ২৪"×১৮" (একাংশ)। **শিল্পী:** অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।
Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনি

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹৯০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা **₹৭৫**

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড | ৩য় মুদ্রণ **₹৩৫০** **দ্বিতীয় খণ্ড** | ২য় মুদ্রণ **₹২৭৫**

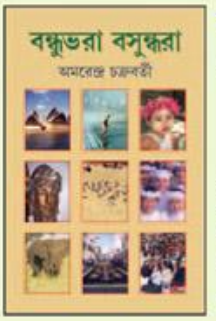

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। সঙ্গে রঙিন ছবি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

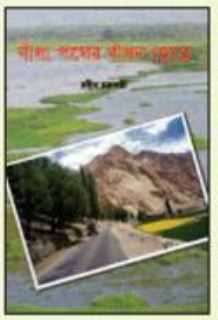

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

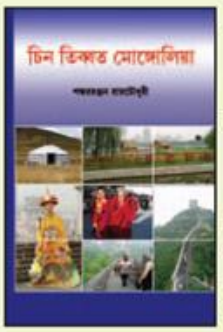

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা **₹৬০**

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

কালের কষ্টিপাথর

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২০ □ মে-জুন ২০১৩

উৎসর্গ

নাগরিক দৃশ্যের আড়ালে চাপা-পড়া অনাদি জীবনপ্রবাহের ভাষ্যকার, যাঁর জন্য সাহিত্যে নির্ধারিত বীরাসন, সেই জীবন-রসিক **সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে** *এই সংখ্যার 'কালের কষ্টিপাথর' উৎসর্গ করে আমরা ধন্য।*

জীবন সেটা নয়, যা একজন মানুষ কাটিয়ে যায়।
জীবন হল, একজন মানুষ যা মনে রাখে এবং রোমন্থন করার জন্য যেভাবে মনে রাখে।

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ
'লিভিং টু টেল আ টেল'

স ম্পা দ কী য়

বোধহয় তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে তখনকার বিশিষ্ট সাহিত্য-ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় কবিতা থেকে মিছিলে আনাগোনা-খ্যাত, পরবর্তীকালের 'আপিলা-চাপিলা'— আত্মকথাকার অশোক মিত্র তাঁর সাহিত্যনিবন্ধে বাংলা সাহিত্যে সংবাদপত্রের অভিভাবকত্ব নিয়ে খেদ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের তখন সেই সময় যখন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন প্রতিভাবান তরুণ কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকারদের বেছে বেছে খবরের কাগজের সাংবাদিক বানাবার উদ্যোগ দেখা যাচ্ছিল। যতদূর মনে পড়ে সন্তোষকুমার ঘোষের আগ্রহে ও অধিনায়কত্বে। ফলে সংবাদপত্রের বিপুল দাবিদাওয়া মেটাতে সদ্য-নিযুক্ত তরুণ লেখক-সাংবাদিককে প্রতিভার চেয়েও প্রভূত পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টি করতে হত।

এরই কুফল নিয়ে তখন কথা বলেছিলেন অশোক মিত্র। তাঁর সেই আশঙ্কার সত্যাসত্য বা কবি-লেখকদের আত্মবিকাশে সংবাদপত্রের অভিভাবকত্বের কুফল-সুফল নিয়ে ভাববার সময় হয়তো এখনও শেষ হয়ে যায়নি, এরই মধ্যে দাবানলতুল্য জনজীবনগ্রাসী অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির সংবাদ-মাধ্যমের মহাসেনীয় মালিকানাকাঙ্ক্ষায় কোনও-কোনও লেখক-কবি-সাংবাদিকদের সাগ্রহ আত্মসমর্পণ নিয়ে অন্য অনেকের মতো আমার মনেও শঙ্কা দুঃখ ও দুশ্চিন্তার মেঘ ছিল। সেই শঙ্কাচ্ছন্নতা নিয়েই 'কালের কষ্টিপাথর'-এর কয়েক সংখ্যার মধ্যে একদিন সকালে অশোক মিত্রকে আমার আকুল অনুরোধ জানিয়ে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় তাঁর মৌলিক ভাবনার মতো সমাজ-সাহিত্য-সাংবাদিকতার এই সাম্প্রতিক প্রবণতা নিয়ে লিখতে বলি।

সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনায় আযৌবন বদ্ধমূল মানুষটি সর্বান্তঃকরণে বিষয়টির গুরুত্ব মেনে নিলেও তাঁর দৃষ্টির ক্ষীণতা ও বয়সজনিত শারীরিক নানা অক্ষমতার কথাও জানালেন। এমনও বললেন যে, এবিষয়ে লেখার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও তাঁর হাতে নেই।

অশোক মিত্রের ভাষায় সমস্যাটির শাখাপ্রশাখা ও শেকড়বাকড় না ছুঁতে পারার সেই দুঃখ দূর হল, তাঁর সম্পাদিত 'আরেক রকম' পত্রিকায় তাঁর অসামান্য সম্পাদকীয় নিবন্ধটি পড়ে।

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই, বেড়াবার বই, কাজের বই

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণবই
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৯০

শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা
কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১৫০

প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে
প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। মজবুত বোর্ড বাঁধাই। **দ্বিতীয় সংস্করণ** ₹১২০

প্রতাপকুমার রায় ও হরপ্রসাদ মিত্রের
বহু দেশ ঘুরে
বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে দশ দিকের দশটি লেখা ₹৬০

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর
চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০

রবীন চক্রবর্তীর
বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য ₹৬০

ভ্রমণ ট্রেকিং
যাঁরা ট্রেকিং করবেন, এ বই তাঁদের পথ দেখাবে আর ট্রেকিং যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, বইটি তাঁদেরও পৌঁছে দেবে প্রকৃতির অমৃতলোকে। মজবুত বোর্ড বাঁধাই। দ্বিতীয় মুদ্রণ ₹১০০

নেকড়ের চোখ
বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক **দানিয়েল পেনাক** ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়। মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন: **মৈত্রেয়ী নাগ** ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। সহস্রাধিক পাতা। ₹৩৫০
দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

কাজের বই

কোন মেশিনে কী ব্যবসা
শুধু মেশিন চিনে, মেশিন কিনে ব্যবসা করুন। কোন মেশিনে কী ব্যবসা, কীভাবে কী করবেন, কোন মেশিন কোথায় পাবেন, কত দাম ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য। দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৪০

বাংলা সমাস
শিশিরকুমার আচার্য
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অপরিহার্য। ₹৬০

বাংলা প্রত্যয়
প্রকরণ ও পদ্ধতি
শিশিরকুমার আচার্য
সদ্য বেরিয়েছে ₹৯০

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

মহাশ্বেতা দেবীর বিস্ময়কর বই **তুতুল** ₹২৫
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের **বকবকম**
পাতায় পাতায় মজার ছবি ₹১৫
কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹২০
চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫
কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০
পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখায়-ছবিতে
আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের
কথামালা : ছড়ায় ঢালা ₹১৫
মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০
আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৭৫
শাদা ঘোড়া
দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।
পঞ্চম মুদ্রণ ₹৩০
আমাজনের জঙ্গলে
ষষ্ঠ মুদ্রণ ₹৫০
হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
নবম মুদ্রণ ₹৪৫
গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹৪০
টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত। ₹১৫
ঋষিকুমার ₹২০
পাখির খাতা ₹৪০
আমার বনবাস ₹১২
তালগাছের ডোঙা ₹২০
হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫
ভূতের বাঁশি ₹৪০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা
বোর্ড বাঁধাই ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে
বোর্ড বাঁধাই ₹৩০
নিমফুলের মধু
গল্পসংকলন ₹৬০
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
২১ জন কবির ৪০টি বিখ্যাত কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ₹১৫০

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

চণ্ডীমণ্ডপ

ভিখারীদের মেলা

লেখা ও ছবি: চণ্ডী লাহিড়ী

ভারত বিচিত্র দেশ। আরও ধনী হও, তোমার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স আকাশ-প্রসারী হোক এটাও যেমন কিছু মানুষের জীবন-দর্শন, আবার সঞ্চয় না করে ভিক্ষা করে ঈশ্বরের দেওয়া মূল্যবান জীবনটাকে ভোগ করে যাও। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। সঞ্চয়ের কী প্রয়োজন! এটাই জীবন-দর্শন।

এই বাংলায়, ডুয়ার্সের মানাগুড়িতে এমন একটি মন্দির আছে যেখানে ভিখারীদের ভীড় হয়। বাংলার নানা প্রান্তের ভিখারীরা সেখানে পুজো দেয়। ভক্ত ভিখারীদের ধারণা, এখানে পুজো দিলে সারা বছর ভালো ভিক্ষা জুটবে। মানাগুড়ির জল্পেশ্বর মন্দিরে তিস্তা থেকে জল নিয়ে ভিখারীরা মন্দিরে যায়। ভক্তদের বিশ্বাস ভিক্ষা নিলে এবং ভিক্ষা দিলেও পূণ্য হয়! জল্পেশ্বর শিবের মন্দির! আর শিব তো নিজেও ভিক্ষা করতেন।

ক্ষনের বচন

৬৭

রাঙাখোসাসম বাক্য, কিন্তু পচা শাঁস—
এমন মুখের কথা আনে সর্বনাশ।

৬৮

ক্ষমতা জিনিসটা কী?
লোভের আগুনে ঘি।
ক্ষমতাই দায়িত্বের নামান্তর হলে
দেশ ভরে সোনার ফসলে।

৭৬

কোনটা সত্যি, আর সেটা নয় সত্যি—
যেটায় স্বার্থ বাঁচে সেইটাই সত্যি।
মিথ্যাটাকেই জোর দিয়ে বলো, সত্যি—
মিথ্যা সে থাকবে না— আর এক রত্তি

৭০

নদীর ওপার জুড়ে কারা যেন নাচে
নদীর এপারে নাচ চলে এক ধাঁচে
দুই পাড়ই জল শোষে নদীটির থেকে
নদীর প্রাণীরা মরে জলাভাব দেখে

৭১

রাজার পতন যদি হয় জনরোষে
নতুন ভাষার বীজ ওড়ে শব্দকোষে
যত জনরোষ তার শাসকই জনক
নবাঙ্কুর দেখে তবু নড়ে না টনক।

ক্ষণকথক

ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শব্দবক্র

৭১। ব্রাইবেল

বিশেষ্য; ঘুষ্টামেন্টে লিখিত সমস্ত আইনকানুন, দূরভাষ নম্বরাদিকে সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়ে রেখে উপঢৌকন দেওয়া-নেওয়ার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখার নিমিত্ত অঞ্চল এবং দপ্তরবিশেষে যে বিভিন্ন নিয়মাবলি মেনে চলা হয়।
— বললাম তো হবে না। আপনি আসুন...এটা আবার কোন ফাইল?
— ঘুষ্টামেন্ট স্যার, সবসময় সঙ্গে রাখি। না না ঘাবড়াবেন না, মোটা ফাইল তো, তাই এর তলা দিয়ে দিতে সুবিধে...
— কোন জঙ্গল থেকে আসছেন বলুন তো? এখানকার ব্রাইবেল অনুযায়ী যা কিছু দেওয়ার সাদা খামে করে আপিসে ঢোকার পথে পানের দোকানে অগ্রিম দিয়ে আসতে হয়। এখন আসুন দেখি!

৭২। সিঁড়িখোড়

বিশেষ্য; যে বাড়ি বা অফিসের সব ওঠানামাই সিঁড়ি বেয়ে করে, তা সে লিফটজনিত ভয়েই হোক বা স্বাস্থ্যচর্চার ঝোঁকেই হোক— অবনীবাবুর মতো সিঁড়িখোড় লোক আর দেখিনি। ভদ্রলোক বাজার করে ফিরে হাতের থলি, ব্যাগ, ঠোঙা সবকিছু লিফটে ঢুকিয়ে সাততলার বোতাম টিপে দিয়ে নিজে তড়বড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন লিফটের আগেই পৌঁছনোর চেষ্টায়।

৭৩। কোটিসাপ্টা

বিশেষণ; মোটরবাইকে পিছনে বসা ব্যক্তিটিকে অনেক সময় চালকের কোমর জড়ানো যে ভঙ্গিতে দেখা যায়— সুমিত্রাদেবীকে সারাজীবন কোটিসাপ্টা হয়েই চলতে হল। ফারাক বলতে ছোটবেলায় বাবার ভুঁড়িটিকে নিজের সরু সরু হাত দিয়ে ঠিক বাগে আনতে পারতেন না আর এখন তাঁর দৃঢ় বাহুবেষ্টনীর মধ্যে তাঁর একান্ত আপন কর্তাটিকে কেমন বেচারা বেচারা দেখতে লাগে।

৭৪। জবরজাবর

বিশেষ্য; স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে অথবা শ্রোতাদের উদাসীনতার পরোয়া না করে নিজের বিগত গরিমার স্মৃতি রোমন্থন— মামাবাবুটি এমনিতে বেশ লোক, কেবল যখন তখন পূর্ববঙ্গে ফেলে আসা জমিদারি নিয়ে এমন জবরজাবর আরম্ভ করে দেন যে ভাগ্নে বেচারা সর্বদাই কুণ্ঠিত হয়ে থাকে।

৭৫। লুপ্তধন

বিশেষ্য; যে বস্তুকে অতিরিক্ত যত্ন সহকারে এমন গুপ্তস্থানে সরিয়ে রাখা হয় যে দরকারের সময় আর খুঁজে পাওয়া যায় না— পারিবারিক গুপ্তধন কোথায় রাখা আছে সে রহস্যের কিনারা করতে পেরেই মল্লিকবাবু সূত্র এবং সমাধান লেখা কাগজটাকে এমন জবরদস্ত লুকোলেন যে সেই লুপ্তধন খুঁজতে এখন গোয়েন্দা দরকার।

শব্দবক্রমুণি

হেঁয়ালির চন্দ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকস্মৃতি, যা নিয়ে ফোকলোর-বিদ্যা, তার বিপুল উপকরণের একটা বড় ভাগ ছড়া-প্রবাদ-হেঁয়ালির ভাগ। হেঁয়ালি— সেও বহুলতই হেঁয়ালি ছড়া। একটু ভাষার বেঁক আর একটু ছন্দের দোলা— দুয়ে জোড়া হয়ে সে হয়েছে স্মরণযোগ্য, উপভোগ্য।

লোকমুখের সেসব হেঁয়ালি-কথার ওপরে সংগ্রাহকের ভাষার ছন্দের দাগরাজি চড়েছে কোথাও, অন্তঃকরণ তাতে হয়তো বদলায়নি।

।। ১ ।।
সবাই ঘুমোতে গেল, দু হাত আগলে
একা জেগে রয়েছে হায়দার।
নিশ্চিন্তে ঘুমোয় যেন রাতটুকু সবাই—
এই মাত্র তার 'পরে ভার।

।। ২ ।।
রাজার মাথার পাগ,
সে নেই বা গোটানো থাক!
রানী পারেন না তুলতে, ধোপা সে
কাচতেও হাল্লাক!

।। ৩ ।।
গোল আপেলটি,
ঘড়া হাত-ডুবো,
লেজে টানো যদি
চেঁচিয়ে উঠব।

।। ৪ ।।
মামার বাগান ভরে
হলুদ পাখি,
তালি দি— ওড়ে না, সে কী!
ব্যাপারটা কী!
ধাওয়া দি— ও মা সে পাখি
ফূর্তি ক'রে
দোলে, লাল হয়ে ওঠে
গাছটা ভরে!

।। ৫ ।।
পোষা পাখি, তাকে খেতে দেয়া মিছেমিছি,
দুটো পা-য় পিষে খায় সে পাথর-বিচি।
দানা না, পানি না, কিছু না, কেবল তার
থেকে থেকে দুটো ঢিল-বিচি দরকার।

।। ৬ ।।
আমি তাকে বই, সেও বয়ে চলে আমাকে
বুঝে চলো খুব! কারও যেন চোট্ না লাগে!

।। ৭ ।।
অতি বিখ্যাত
পক্ষীপ্রবর,
গ্রামে-শহরে সে
চেনা ঘর ঘর।
বিপুলকর্মা,
তুলনারহিত,
সবুজে-হলুদে-
কালোয় জড়িত
অপরূপ পাখি—
তবু হুঁশ কোরো,
যত অমায়িক,
তেমনই হিংস্র।
তেমনই সঘন
গর্জন রাবে
রোষে ধেয়ে উড়ে
পড়ে লাফে লাফে!
জ্ঞানী যিনি তাঁর
নয় অজ্ঞাত
কে এই পাখিটি
অতি বিখ্যাত।

।। ৮ ।।
জ্বালো দীপ, বলো, কতটুকু ওর দীপ্তি!
তবে কোথায় উজালা হয়ে ওঠে আরো
দীপটি?

।। ৯ ।।
কালো বাইরে, লাল মাঝটা,
চার মোড় দেয়া গোল ধাঁচটা!
কাছে যাও, চায় দাঁত খিঁচিয়ে!
সেবা করতেও নয় পিছিয়ে।

।। ১০ ।।
সাত রাজ্যির সাতাশ রাঁধনা
একাই মরে রেঁধে।
পারলে পারে খেতেও! সবাই
অমনি রাখে বেঁধে।

।। ১১ ।।
ডোবে যেন শিলা— ভাসে যেন শোলা—
হাতে-পায়ে ঠিক যেন মানুষের পোলা,
বসে যেন মামাদের গলা-উঁচু কুকুর—
ভাঙানি দেও তো খোকা? বলো দিকি খুকু?

।। ১২ ।।
এক সে কামার— ছোটোমোটা, বিনি হাতে
রাত দিন খাটে, অসাধ্যি খাটা খাটে।
বিনি আগুনেই চুলো করে জ্বলা-নেবা।
বলে, সে-ই তার লোকসেবা, দেবসেবা।

।। ১৩ ।।
বাবার কাস্তে ঝুলিয়ে রেখেছে
মায়ের কাপড়ে
টানিয়ে,
নীল ঝলমল করে শাড়িখান
তা নিয়ে!
ধার ঝলমল করে কাস্তের
দু ফলা,
নীল শাড়ি দেখি চোখের নিমিষে
রুপোলা।

।। ১৪ ।।
এক ফোঁটা দিঘি করে টলমল—
কুটো পড়ল কি ফুলে ওঠে জল।
বেয়ে পড়ে জল— কী সর্বনাশ!
মাটি ফুলে ওঠে এ পাশ ও পাশ।

উত্তর:
(১) দরজার আগল বা খিল। *তুর্কি।* (২) আকাশ। *কন্নড়।* (৩) ঘণ্টা। *বিলিতি।* (৪) লেবু। *তামিল।* (৫) জাঁতি। *মারাঠি।* (৬) জুতো। *ফিলিপিনো।* (৭) মৌমাছি।... (৮) অন্ধকার। *বিলিতি।* (৯) উনুন। *বিলিতি।* (১০) আগুন।... (১১) ব্যাঙ। *রাজবংশী।* (১২) মৌমাছি। *বিলিতি।* (১৩) আকাশে এক ফলা চাঁদ। *সুইডেন।* (১৪) চোখ। *বাংলা।*

অমিতাভ চৌধুরি

। পর্ব ২৩।

তুষারকান্তি ঘোষ

একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে তুষারকান্তি ঘোষের সঙ্গে লেখক। ছবি লেখকের সৌজন্যে

আমাদের প্রতিদিনের এডিটোরিয়াল মিটিং ছিল চমৎকার। বিকেল চারটের সময় ডাক পড়ত তুষারবাবুর ঘরে। নব্বই-পার বয়সেও সব কটি কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন তিনি। এটা কেন বাদ গেল? না না, কোনও এক্সপ্লেনেশন দিও না। কাল ভালো ফলোআপ চাই। অমুক খবরটার শুরু আমাদের ঠিক হয়নি। এইভাবে লিখলে ভালো হত। ব্যারিস্টার খুনের ঘটনা— হ্যারিংটন স্ট্রিটে— শুধু 'অমৃতবাজার'-এ আছে, 'যুগান্তর'-এ নেই। কেন? কে দায়ী? চিফ রিপোর্টার? ডাকো তাঁকে।

চিফ রিপোর্টার নানা কারণ দেখালেন, 'অমৃতবাজার' খবরটা দিলেই পারত, দেয়নি— এ কথাও বললেন। তুষারবাবু মন দিয়ে সব শুনলেন এবং তারপর বললেন— 'ঠিক আছে, আই অ্যাম হ্যাপি। তবে তোমাকে 'যুগান্তর'-এর পাঠকদেরও সেই কৈফিয়ত জানাতে হবে। যাও, একখানা গাড়ি করে। সঙ্গে নাও সার্কুলেশন ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে 'যুগান্তর'-এর গ্রাহকদের লিস্টি। যত জন পারা যায়, সবাইকে বলে এসো, 'অমৃতবাজার' তোমাকে দেয়নি, তাই তুমি খবরটা দিতে পারোনি।' অর্থাৎ তুষারবাবু বলতে চাইছেন, মিস করেছ, ঠিক আছে, কিন্তু কোনও কৈফিয়ত

চমৎকার গলা। টপ্পার দানা সুন্দর গড়িয়ে যায়। বলতেন, 'না, আগের মতো গাইতে পারি না। একটা পাখোয়াজও নেই অফিসে যে, ফুর্তিতে গান গাইতে পারি।' বলেই তিনি টেবিলটিকে তবলা বানিয়ে বলে উঠতেন, 'বলো তো কী?...'

দিও না। পরদিন আরও ভালো খবর দিয়ে ক্ষতিপূরণ কোরো।

এই হচ্ছেন তুষারবাবু। ১৯৯৪ সালের ৩০ আগস্ট ৯৫ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন। কিন্তু তার আগে বাহাত্তর বছর ধরে তিনি ছিলেন দীপ্যমান। কাজের কথা সেরে ওই মিটিংয়েই হঠাৎ গান ধরতেন— 'ওই দেখা যায় বাড়ি আমার চৌদিকে মালঞ্চ ঘেরা।' কিংবা 'কাদের কূলের বউ গো তুমি।' চমৎকার গলা। টপ্পার দানা সুন্দর গড়িয়ে যায়। বলতেন, 'না, আগের মতো গাইতে পারি না। একটা পাখোয়াজও নেই অফিসে যে, ফুর্তিতে গান গাইতে পারি।' বলেই তিনি টেবিলটিকে তবলা বানিয়ে বলে উঠতেন, 'বলো তো কী? পারলে না তো! দশকোষী। জানো, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি ডুয়েট গেয়েছি— শান্তিনিকেতনে। 'মোরে বারে বারে ফিরালে।' কী রাগ বলো তো? পারলে না তো! মেঘমল্লার।'

তারপর বিকেল পাঁচটা বাজতেই চলে যেতেন বারাসতে। নিজের বিরাট বাড়ি শিশিরকুঞ্জে। আমি কখনও বলতাম, 'দরকার পড়লে আপনাকে ফোন করব বাড়িতে।' লিফটের দিকে এগোতে এগোতে জবাব দিতেন, 'মোটেই না। তুমি আছ কী করতে? বাড়িতে ফোন করে আমায় জ্বালিয়ো না। আমার যা বলবার, কাল বলব।'

এই হচ্ছেন তুষারবাবু। যশোরের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের ছেলে, বাবা শিশিরকুমার, কাকা মতিলাল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র একদা-সম্পাদক অশোককুমার সরকারের দিদিমা সরলাবালা সরকার তাঁর আপন পিসতুতো দিদির মেয়ে। তাঁকে সবাই ডাকত 'অমৃতবাজার'-এর ভাগ্নি। ১৮৭৮ সালে তুষারবাবুর বাবা-কাকারাই বের করেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আবার বের হয় তুষারবাবু ও সুরেশচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে। পরে তুষারবাবুরা মালিকানা ছেড়ে দেন।

তুষারবাবু কাজে যোগ দেন ১৯২০ সালে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র সম্পাদক হন ১৯২৮ সালে। ত্রিশ বছর বয়সে। দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন অনেক বার। 'টাইমস' পত্রিকার মালিক, 'গার্ডিয়ান'-এর সম্পাদক, 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর সম্পাদক— সবাই ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু। মোতিলাল, জওহরলাল, ইন্দিরা, রাজীব— চার প্রজন্মের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। তাছাড়া মহাত্মা গান্ধি, চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু, বল্লভভাই প্যাটেল, জি ডি বিড়লা— সবাই ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ। ঠিক তেমনই বাংলার সব সাহিত্যিকের সঙ্গে ছিল অন্তরঙ্গতা। অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখ ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ। তাছাড়া সত্যজিৎ রায়ের

মাঝরাত্তিরে হঠাৎ টেলিফোন। তুষারবাবুর গলা— 'ও হে সত্যজিৎ, তোমার ঠাকুরদার বইগুলো বাজারে মেলে না কেন?' সত্যজিৎবাবু পরে বলেছেন, 'বিদেশে এসে মাঝরাত্তিরে ফোনে এইরকম প্রশ্ন করা একমাত্র তুষারবাবুর পক্ষেই সম্ভব।'

সঙ্গে ছিল প্রগাঢ় সখ্য।

এমন বইপড়ুয়া মানুষও বিরল। নতুন বই কিনলে কিনতেন পাঁচ কপি করে। এক কপি বারাসতের বাড়িতে, এক কপি এলাহাবাদের বাড়িতে, আরেক কপি দেওঘরের বাড়িতে এবং চতুর্থ কপি বিন্ধ্যাচলের বাড়িতে। কিন্তু পাঁচ কপি কেন? তুষারবাবুর চটজলদি জবাব ছিল— বইটি চোরের জন্য। একখানা অন্তত চুরি তো হবেই। ম্যাগনিফায়িং গ্লাস হাতে নিয়ে বইয়ে মগ্ন থাকতেন। একবার বিলেতে যেতে তাঁর বিমানটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। তুষারবাবু বিপদ ভুলতে ছোটদের জন্য লেখা একখানি বাংলা বই মগ্ন হয়ে পড়তে থাকেন। ভাগ্যিস শেষপর্যন্ত দুর্ঘটনা ঘটেনি।

বারাসতের বাড়িতে তুষারবাবুর লাইব্রেরি দেখতে সত্যজিৎ রায় প্রায়ই যেতেন। তাঁর কাছে তিনি চেয়েছিলেন বিলেতের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনগুলো। তুষারবাবুর কাছে স্ট্র্যান্ড ও পাঞ্চ ম্যাগাজিন প্রথম সংখ্যা থেকেই ছিল। ষাটের দশকে জুরি হিসেবে সত্যজিৎ যখন বার্লিনে তখন তুষারবাবুও অন্য কাজে বার্লিনে। মাঝরাত্তিরে হঠাৎ টেলিফোন। তুষারবাবুর গলা— 'ও হে সত্যজিৎ, তোমার ঠাকুরদার বইগুলো বাজারে মেলে না কেন?' সত্যজিৎবাবু পরে বলেছেন, 'বিদেশে এসে মাঝরাত্তিরে ফোনে এইরকম প্রশ্ন করা একমাত্র তুষারবাবুর পক্ষেই সম্ভব।'

তুষারবাবু মনেপ্রাণে পোশাকে-আশাকে ছিলেন ষোলো আনা বাঙালি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দখল ছিল প্রশ্নাতীত। 'থার্ড ডিভিশনে এনট্রান্স পাশ' করলেও চমৎকার ইংরিজি বলতেন ও লিখতেন। প্রখর ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি। জীবনের সব কথা মনে করতে পারতেন শেষ বয়স পর্যন্ত। প্রায়ই বলতেন, তাঁর বাল্যকালের কথা, বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের কথা। কখনও ভুলতে পারেননি পিতৃভূমি যশোরকে। শৈশবে কোনও এক আত্মীয়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন বেনারস। অথচ অনেক পরেও হাওড়া থেকে বেনারস সিটি পর্যন্ত সবকটি রেল স্টেশনের নাম অনর্গল পরপর বলে যেতে পারতেন। খেতে পারতেন তাজা যুবকের মতো! বাটিভর্তি ক্ষীর, আস্ত মুরগির রোস্ট, ভাপা ইলিশ— অনায়াসে একসঙ্গে খেয়ে হজম করতে পারতেন। ব্লাড সুগার ছিল না। ব্লাড প্রেশার আশি ও একশো চল্লিশে দাঁড়িয়ে থাকত।

তুষারবাবু বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে। কিন্তু তুষারবাবু কি ভগবদগত প্রাণ ছিলেন? তাঁর কথাবার্তায় তা মনে হত না। একদিন বলেছিলেন— 'জানি না ঈশ্বর আছেন কিনা। থাকলে তো উত্তম, না থাকলে কী আর করা যায়।' মালা জপাজপি, দেবস্থানে ছোটাছুটি তাঁর ধাতে ছিল না। তিনি ভালো বুঝতেন এই সংবাদপত্র, বাংলা সাহিত্য, গান-বাজনা ও তাঁর পরিবার।

তুষারবাবুর নিজের গল্পের যেমন কোনও শেষ ছিল না, তেমনই তাঁকে নিয়ে গল্পেরও শেষ নেই। লন্ডনের এক দামি রেস্তোরাঁয় তুষারবাবু চা খাচ্ছিলেন, কাপের চা প্লেটে ফেলে সুড়ুৎ-সুড়ুৎ করে। পাশের ইংরেজ ভদ্রলোক কাছে এসে বিনীতভাবে বললেন, 'জেন্টলম্যান, চা ওইরকম কেউ খায় না।' তুষারবাবু তাঁর দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিলেন, 'এইভাবে খাওয়াই নিয়ম। আমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছি। তোমাদের দেশে চা আসে আমাদের দেশ থেকে। তুমি তো চা খাওয়ার রীতিই জানো না।' বলেই আবার সুড়ুৎ-সুড়ুৎ।

তুষারবাবু বিদায় নিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে বিদায় নিয়েছে তাঁর সাধের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর'।

। পর্ব ২৪।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র

একদিন সন্ধেবেলা তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। দেখি, শম্ভু মিত্র মশায়ের সঙ্গে তিনি আলোচনারত। আমাকে বসতে বললেন। আলোচনা শুনতে শুনতে মনে হল শম্ভুবাবু যেন শিক্ষার্থী আর প্রেমেনদা আসল গুরুমশায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র মশাইকে প্রথম দেখি শান্তিনিকেতনে। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে তিনি প্রায়ই যেতেন সেখানে। তাঁর এক মেয়ে এবং দুই ছেলে— মাধবী, মৃন্ময় ও হিরণ্ময়, পড়ত ওখানে। উনিও ওখানকার ছাত্র ছিলেন। ১৯২২ সালে শ্রীনিকেতন পত্তন হওয়ার পর তিনি ছাত্র হিসেবে যাতায়াত শুরু করেন। লেনার্ড আমহার্স্টকে বলে-কয়ে নিখরচায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেন। কিছুদিন ক্লাস করেই ফিরে আসেন কলকাতায়। ১৯৮৮ সালে শেষ যান শান্তিনিকেতনে। আমিও সঙ্গী ছিলাম। সেবার তাঁকে বিশ্বভারতী থেকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেওয়া হয়। দুজনে থাকতাম রতনকুটিতে পাশাপাশি ঘরে। তখন দুরারোগ্য কর্কট রোগে তিনি আক্রান্ত। জানতেন না। মাসকয়েক পরেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রর শৈশব কেটেছে তাঁর দাদামশায়ের কাছে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে, তারপর বীরভূমের নলহাটিতে। কলকাতায় এসে থাকেন হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে, দিদিমার বাড়িতে। স্কুলে পড়তে পড়তেই সহপাঠী শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। পড়তেন ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিন্নবাঁধা পলাতক বালক। সবসময়ই তিনি শুনতে পান হেইডি হাইডি হাই, অরণ্য ডাকে ওই যাই। সেই ছোটবেলায় বাড়ি থেকে পালানো। বেশি দূর নয়, পালিয়ে হাওড়া স্টেশন। এক মামা খুঁজে বের করে বাড়ি নিয়ে আসেন। ছোটবেলায় দিদিমার সঙ্গে গঙ্গাসাগর যাওয়ার স্মৃতি থেকেই লিখেছেন 'সাগর সঙ্গমে' এবং 'সাগর থেকে ফেরা'। মাঝখানে একবার ঢাকা। সেইখানে ছাত্রজীবনের স্মৃতি। তাঁর কাছেই শোনা, বড়ই সুখপ্রদ সে স্মৃতি। প্রথম গল্প লেখেন— 'শুধু কেরানী'। একটা মেসে থাকতে একটি পোস্টকার্ডে লেখা পুরনো চিঠি হাতে পেয়ে তাকে অবলম্বন করেই গল্পটি লেখা। তারপর 'প্রবাসীতে' প্রথম গল্প ছাপানোর আনন্দ। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পাঁক'। তারপর শুরু তাঁর সাহিত্যের দৌড়। যুক্ত হলেন কল্লোল ও কালিকলম কাগজের সঙ্গে। বন্ধুত্ব হল অচিন্ত্যকুমার, শৈলজানন্দ, শিবরাম চক্রবর্তী, গোকুল নাগ ও দিনেশরঞ্জন দাশের সঙ্গে। ওদিকে সাংবাদিকতাও চলছে। কিছুদিন ছিলেন 'দৈনিক বাংলার কথা' কাগজে সহকারী সম্পাদক হিসেবে। তারই ফাঁকে কাজ করেছেন ওষুধ কোম্পানিতে, কিছুদিন বিজ্ঞাপনের কপি লিখে সংসার চালান। মাঝে মাঝে গানও লেখেন সিনেমায়। মনে আছে, ছোটবেলায় রিক্তা সিনেমায় রমলার কণ্ঠে 'জানি না কোথায় আছি, রাশিয়া কিংবা রাঁচি'। গানটি ভালো লেগেছিল। পরে জানতে পারি গীতিকার প্রেমেন্দ্র মিত্র।

তারপর কত সুন্দর সুন্দর গান তিনি লিখে দিয়েছেন আমাদের জন্য। তিনি এবং সজনীকান্ত দাস বাংলা গান লেখা ছেড়ে দেওয়ার পরই তার এত দুর্দশা। প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত সিনেমাগুলোও চমৎকার। 'কালো ছায়া' নামক ছবিতে তাঁর অভিনেতা-বন্ধু ধীরাজ ভট্টাচার্যকে দিয়ে দ্বৈত অভিনয় করিয়েছিলেন। তাঁর তোলা 'বিদেশিনী' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন কানন দেবী। শুধু সিনেমা নয়, থিয়েটার পাড়াতেও তাঁর যাতায়াত ছিল। শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্কও ছিল। শুধু তাই নয়, রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে 'সহকারী গবেষক' হিসেবে কাজও করেছেন কিছুদিন।

তা ছাড়া গল্প উপন্যাস ও কবিতা লেখার কাজ চলেছে অনবরত। মনে আছে, ছাত্রজীবনে তাঁর লেখা 'প্রথমা' বইটি পড়ে কী আলোড়িত হয়েছিল মন! ছোটদের ছড়া, বড়দের কবিতা, ছোটদের গল্প, বড়দের গল্প-প্রবন্ধ— সবকিছুতে এমন সব্যসাচী লেখক আর মিলবে না।

কাজি নজরুল ইসলাম যখন ঢাকায় মারা

গেলেন, তখন 'যুগান্তর' অফিস থেকে তাঁকে ফোন করি একটি লেখার জন্য, স্মৃতিকথামূলক। বললেন, আধঘণ্টা পর ফোন কোরো। করলাম এবং তিনি গড়গড় করে হাজার দেড়েক শব্দের একটি চমৎকার স্মৃতিকথামূলক রচনা আমাকে উপহার দিলেন। সবই মুখে মুখে। নজরুলের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল একসময়। তিনি তাঁর হুগলির বাড়িতে প্রায়ই যেতেন।

লাইব্রেরিতে গিয়ে তিনি নিরন্তর পড়াশুনো করতেন। সেই পড়াশুনোর ফসল তাঁর রচনা ও আলাপচারিতা। তাঁর কাছে একঘণ্টা বসলেই এক ভলিউম বইয়ের আস্বাদ পাওয়া যায়। কী যে জানেন না তিনি! নিউগিনি বা পাপুয়ার ঘাসের বৈশিষ্ট্য, বেদুইনদের খাদ্যাভ্যাস, অঙ্গামি নাগার পোশাক, পুরকায়স্থ পদবির আদি ইতিহাস— সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে। সুন্দর করে তিনি বুঝিয়ে দিতে পারেন, কে কী কেন কবে কোথায়?

একদিন সন্ধেবেলা তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। দেখি, শম্ভু মিত্র মশায়ের সঙ্গে তিনি আলোচনারত। আমাকে বসতে বললেন। আলোচনা শুনতে শুনতে মনে হল শম্ভুবাবু যেন শিক্ষার্থী আর প্রেমেনদা আসল গুরুমশায়। আলোচনার বিষয় ছিল অভিনয় ও নাট্যকলা। শেষদিকে তিনি চোখে কম দেখতেন, কিন্তু লেখালেখির বিরাম ছিল না, আর চেনা কেউ এলে তো গল্পের শেষ থাকত না। কেউ কোনও বিষয় নিয়ে কথা বললে তিনি দিতেন শেষ রায় এবং সেই রায়ে ফাঁকি থাকত না।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি কিছুটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। সবসময় ফিটফাট প্রেমেনদার অনেক বাতিক ছিল। সেই বাতিক সামাল দিতেন তাঁর স্ত্রী। তারপর এল বাড়ির বড় বউ— মৃন্ময়ের স্ত্রী। তাঁর বন্ধুসংখ্যা ছিল প্রচুর। অনবরত যাতায়াত ছিল বাড়িতে। তা সামাল দিতেন তাঁর স্ত্রী, পরে বড় বউ। তাঁর সঙ্গে বহু পার্টিতে সন্ধেবেলা গিয়েছি। সৌন্দর্যবিলাসী ছিলেন তিনি। পকেটের রুমালে অগুরু মাখিয়ে রাখতেন এবং সেই রুমাল নাকের সামনে অনবরত নাড়াচাড়া করতেন।

একটি সংবর্ধনাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে লেখক। ছবি লেখকের সৌজন্যে

তাঁর সঙ্গে বহু পার্টিতে সন্ধেবেলা গিয়েছি। সৌন্দর্যবিলাসী ছিলেন তিনি। পকেটের রুমালে অগুরু মাখিয়ে রাখতেন এবং সেই রুমাল নাকের সামনে অনবরত নাড়াচাড়া করতেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত 'বিদেশিনী' ছবির একটি দৃশ্যে কানন দেবী ও ধীরাজ ভট্টাচার্য

পদ্মশ্রী, অকাদেমি পুরস্কার— ইংরিজি নানা সম্মানে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। তবে আরও বেশি সম্মান পেয়েছেন পাঠকদের কাছে। এখনও তাঁর বই পড়তে আগ্রহী বাঙালি পাঠক। কী গল্প, কী উপন্যাস, কী প্রবন্ধ— যা-ই লিখুন না কেন, বাঙালি পাঠক আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। আমি তাঁর নতুন রচনার অভাব তো অনুভব করিই, তার চেয়ে বেশি অনুভব করি একজন হৃদয়বান মানুষের অভাব। যা-তা লিখে তাঁর কাছে পার পাওয়া যেত না। খারাপ লাগলে তিনি তৎক্ষণাৎ ফোন করে তাঁর মতামত জানিয়ে দিতেন।

শেষদিকে বাড়ির বাইরে বিশেষ বেরোতেন না। লেখাপড়ার কাজের জন্য একজন সহকারিণী রেখে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে বারান্দায় বসে আদিগঙ্গার দিকে তাকাতেন আর তাকাতেন বাড়ির ভেতরে উঠোনের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো ছোট্ট আমগাছের দিকে। ওই গাছটি তাঁর স্ত্রীর অতি যত্নে লাগানো। সেদিন বড় ছেলে মৃন্ময় বলছিল— 'গাছটা কেটে ফেলব কিনা ভাবছি।' আমি বলি, 'না, কাটিস না, ওতে তোর মা ও বাবার অনেক স্মৃতি।'

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

দশ-বারো বছর আগে একবার এক একুশে ফেব্রুয়ারি আর একবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনীর সাহিত্যানুরাগী কর্ণধার, আমাদের অনেকেরই বন্ধু, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আতিথ্যে সারা রাত সারা দিন ঢাকার পথে পথে ঘুরে দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর গাজী শাহাবুদ্দিন সস্ত্রীক কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেইসময় নিজের প্রকাশনীর একটি বই— জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাকে উপহার দেন। ওঁরা দেশে ফিরে যাবার দিনই রাতে আমি বইটি শুরু করে ভোরবেলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমাদের এত কাছে, একদা আমাদেরই ভাঙা হৃদয়ের একটা টুকরো এক ভূখণ্ডের স্বাধীন দেশ হয়ে জন্মানোর রোজকার রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি এভাবে চোখের সামনে জীবন্ত দেখব কখনও কল্পনাও করিনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাক সেনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে থেকে বিধ্বংসী ঝড় ওঠার আগের থমথমে মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পরদিন পর্যন্ত এ এক পরম মূল্যবান ইতিহাসের সজীব ধারাভাষ্য।

১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বইটির বিংশতিতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন ঢাকা থেকে ফোনে জানালেন, পাকিস্তানেও নাকি এ বইয়ের উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছে। আমাদের ঘরের পাশেই বাংলা ভাষাভিত্তিক এই নতুন দেশের জন্মযুদ্ধের একজন ভুক্তভোগী জননী ও জায়ার লেখা এমন মহামূল্য দলিল পাঠ থেকে এপার বাংলার আমরাই বা বাদ থাকব কেন! 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এই দৈনন্দিন দলিলের পুনর্মুদ্রণ প্রয়াত লেখিকার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। বইটির প্রকাশক ও জাহানারা ইমাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য গাজী শাহাবুদ্দিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি এই বাংলায় শুধু আমাদেরই এই বই পুনর্মুদ্রণের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন।—সম্পাদক

তেরো

২১ আগস্ট শনিবার ১৯৭১

সকালে রুমীর ফোন পেলাম রেবাদের বাসা থেকে। রুমী ওখানে রয়েছে, ওকে নিয়ে আসতে হবে।

গেলাম। রুমী ঢাকা আসার পর থেকে গাড়িটা বাড়িতেই থাকে, কখন লাগে— তার জন্য। শরীফ, বাঁকা কিংবা মঞ্জুরের গাড়িতে অফিসে যাওয়া-আসা করে।

গিয়ে দেখি, রুমীর চেহারার অবস্থা করুণ। দু'দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উসকোখুসকো চুল, রাতজাগা লাল চোখ, কুঁচকানো কাপড়চোপড়। রুমী বলল, 'এই চেহারা-সুরত নিয়ে বেবিতে যেতে সাহস পেলাম না। গুলশান লেকের ঘাট থেকে মিনিমামার বাসাটা, একদম কাছে, তাই এদিক দিয়ে এলাম।'

বুঝলাম নদীর ওপারে যে গ্রামে ওদের ক্যাম্প আছে, সেইখান থেকে এসেছে।

বাড়ির দিকে গাড়ি চালিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে। অসুবিধে তো কিছু নেই আমার। কিন্তু চেহারা-সুরত এরকম হল কী করে, বলা যাবে?'

'যাবে' বলে রুমী বিষণ্ণ হাসি হাসল, পিছনে

মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে আস্তে আস্তে বলল, 'পরশু রাতে দুটো নৌকোয় করে আমরা কয়েকজন সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের আশপাশটা একটু দেখতে বেরিয়েছিলাম। সামনের নৌকোয় কাজি ভাই, বদি আর জুয়েল ছিল। অন্ধকার রাত, কিছু দেখা যায় না। আমরা পিছনের নৌকোয় একটু দূরে। আসলে কাজি ভাইরা কী যেন একটা চেক করে দেখার জন্য এগিয়ে গেছে, আমাদের একটু পিছনে থাকতে বলেছে। হঠাৎ শুনি ভয়ানক গুলির শব্দ। কিছুই বুঝতে পারি না। অন্ধকারে শুনলাম চিৎকার, পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। একটু পরে কাজি ভাইদের নৌকো কাছে এলে সব জানতে পারলাম। কাজি ভাইরা একটা মিলিটারি ভর্তি নৌকোর সামনে পড়েছিল। মাঝিটা ছিল রাজাকার। সে বাংলায় শুধিয়েছিল 'কে যায়', মিলিটারিগুলো একদম চুপ করে ছিল। কাজি ভাই একটু ঘুরিয়ে জবাব দেয় 'সামনে।' নৌকোটা একদম কাছে আসতেই ওরা দেখে নৌকোভর্তি মিলিটারি। কাজি আর জুয়েল তাদের স্টেনগান নৌকোর পাটাতনে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বদি তা রাখেনি। সে কোলের মধ্যে রেখেছিল। ভাগ্যিস রেখেছিল। তাই আমরা সবাই বেঁচে গেছি। বদি সঙ্গে সঙ্গে স্টেন তুলে ওদের নৌকোর ওপর ব্রাশফায়ার করে। পুরো ম্যাগাজিন একেবারে খালি করে দেয়। মিলিটারিরাও গুলি চালিয়েছিল, তবে বদির ব্রাশের মুখে একদম সুবিধে করতে পারেনি। কেবল জুয়েলের আঙুলে গুলি লেগেছিল। মিলিটারিদের কয়েকটা মরে, বাকিরা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওদের নৌকোটা উল্টে যায়। বদিও পানিতে পড়ে গিয়েছিল। ওকে পরে তুলে আমরা সবাই পিরুলিয়া গ্রামে ফিরে যাই। জুয়েলকে নিয়ে যা বিপদে পড়েছিলাম। সে রাতে কোনওমতে ফার্স্ট এইড দিয়ে রাখা হল। গতকাল কাজি বদি, জুয়েলকে ঢাকা নিয়ে এসেছে। ওর আঙুলে অপারেশন করতে হবে।'

আমার গা শিরশির করতে লাগল। একটু হলেই সবাই গুলি খেয়ে মরতে পারত, জখম হয়ে নদীর পানিতে তলিয়ে যেতে পারত। কোনওদিন জানতেও পারতাম না ছেলেগুলোর কী হল!

রুমীকে সে কথা বলতে সে হাসল, 'আমাদের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল খালেদ মোশাররফ কী বলেন, জান? তিনি বলেন, 'কোনও স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না; চায় রক্ত-স্নাত শহিদ।' অতএব মা মণি, আমরা সবাই শহিদ হয়ে যাব— এই কথা ভেবে মনকে তৈরি করেই এসেছি।'

আমার হঠাৎ দু'চোখে পানি এসে গেল। গাড়ি চালাতে অসুবিধে হবে, তাই আর কথা না

কাজি ভাইরা একটা মিলিটারি ভর্তি নৌকোর সামনে পড়েছিল। মাঝিটা ছিল রাজাকার। সে বাংলায় শুধিয়েছিল 'কে যায়', মিলিটারিগুলো একদম চুপ করে ছিল। কাজি ভাই একটু ঘুরিয়ে জবাব দেয় 'সামনে।' নৌকোটা একদম কাছে আসতেই ওরা দেখে নৌকোভর্তি মিলিটারি।

বলে মাথা উঁচু করে চোখের পানি আবার ভেতরে পাঠাবার প্রয়াসে বড় বড় শ্বাস নিতে লাগলাম। রুমী বুঝতে পেরে কথা ঘুরিয়ে দিল, 'জানো আম্মা, জুয়েল জখম হওয়াতে আমাদের তৎপরতা একটু ঢিলে পড়ে যাবে। জুয়েলকে সাবধানে লুকিয়ে রাখতে হবে। আমাদেরও একটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে। আসলে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনটা এখনও ওড়াতে পারা গেল না, তাই মনে একদম শান্তি নেই। অথচ এই সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ওড়াবার জন্য মেলাঘরে হায়দার ভাই আমাদের দলকে স্পেশাল ট্রেনিং দিয়েছে। কাজি ভাই এই দলের লিডার। এই কাজের জন্য আমরা সঙ্গে এনেছি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। একটা ৩.৫ রকেট লাঞ্চার, সেটা চালাবার জন্য আর্টিলারি থেকে একজন গানারকেও আমাদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আটটা রকেট শেল, কী যে ভারী, বয়ে আনতে আমাদের জান বেরিয়ে গেছে। এ ছাড়া দুটো এস এল আর উইথ অ্যানার্গালঞ্চার। প্রত্যেকের জন্য একটা করে স্টেনগান, চারটে করে ম্যাগাজিন, অসংখ্য বুলেট, দুটো করে হ্যান্ড গ্রেনেড। এখানে এসে দেখা গেল, যা হেভি সিকিউরিটি, তাতে শুধু বাইরে থেকে রকেটশেল মেরে কিছু করা যাবে না, মেরে দিয়ে পালানোও যাবে না। তখন ভেতর থেকেও স্যাবোটাজ করার কথা চিন্তা করা হল। কাজি ভাই, আলম, শাহাদত ভাই, আরও কয়েকজন একত্রে বসে প্ল্যান অব অ্যাকশান ঠিক করা হল। সেইমতো আলম আর শাহাদত ভাই এখন কাজ করছে। পাওয়ার স্টেশনের ভেতরের দুজন কর্মচারীকে, বিস্ফোরক কীভাবে নাড়াচাড়া করতে হয়, সে বিষয়ে কিছু ট্রেনিং দিয়ে তাদের সাহায্যে একটু একটু করে পি কে স্টেশনের ভেতরে পাচার করা হচ্ছে। সবসুদ্ধ ৮০/৯০ পাউন্ড পি কে লাগবে। একেকবারে ৮/১০ পাউন্ড পি কে রুটির মতো বেলে গাড়ির দরজার ভেতর দিকের হার্ডবোড কভার খুলে তার মধ্যে সেঁটে, আবার কভার এঁটে পাওয়ার স্টেশনের ভেতরে নিয়ে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। এই কাজে সময় বেশি লাগছে। তাছাড়া এত পি কে ঢাকাতে মজুত নেই। ওগুলোও আনাতে হচ্ছে। সব পি কে স্টেশনের ভেতরে নিয়ে যাওয়া শেষ হলে, তখন একটা তারিখ ঠিক করা হবে ভেতর থেকে ব্লাস্ট করানোর। এবং ওই একই দিনে একই সময়ে আমরা বাইরে থেকে রকেটশেল মেরে খানসেনাদের ব্যতিব্যস্ত রাখব। এই প্ল্যান যদ্দিন কার্যকর না হয়, তদ্দিন আমরা অন্যসব অ্যাকশান চালিয়ে যাব।'

রকেট লঞ্চার, এস এল আর উইথ অ্যানার্গালঞ্চার কী জিনিস বুঝলাম না। কিন্তু জিগ্যেস করতেও সাহস হল না। আমার চোখের পানি থামানোর জন্য রুমী গড়গড় করে এত কথা বলে গেল, যা সে কখনও করে না, তার ওপর আবার প্রশ্ন করে তার মুড নষ্ট করতে চাই না। পরে এক সময় জেনে নেব।

বাড়ি পৌঁছেই রুমী বলল, 'আম্মা, নাশতা রেডি করো। আমি শেভ, গোসল সেরে আসছি।'

ধোপদুরস্ত কাপড় পরে নাশতা খেয়ে বলল, 'যাই, জুয়েলের খবর নিয়ে আসি।'

'তাড়াতাড়ি ফিরিস। আমিও জুয়েলের খবর জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকব।'

কোথায় তাড়াতাড়ি ফেরা! ফিরল একেবারে সন্ধ্যা পার করে। সঙ্গে বদি। রুমী ঢুকেই বলল, 'আম্মা, এই দুর্দান্ত সাহসী ছেলেটাকে ভালো করে খাইয়ে দাও তো। ওর জন্যই আমরা সেদিন সবাই প্রাণে বেঁচে গেছি।'

বদি বিব্রত মুখে রুমীকে মৃদু ধমক দিল, 'খালি বেশি বকে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'জুয়েলের খবর কী?'

'জুয়েল ভালো আছে। কাল সন্ধ্যায় কাজি আর বদি জুয়েলকে ডাঃ রশীদউদ্দিন আহমদের চেম্বারে নিয়ে গিয়েছিল। কাজির এক বন্ধু আছে, কুটু, ওর বাবা শামসুল আলম ডাঃ রশীদের বন্ধু। ওই আলম সাহেবের গাড়িতে করে ওরা যায়। তবে ডাঃ রশীদের চেম্বারে অপারেশনের ব্যবস্থা নেই। তাই ডাঃ রশীদ জুয়েলকে ডাঃ মতিনের ক্লিনিকে নিয়ে যান। ওখানে অপারেশন থিয়েটার আছে। সেখানে গিয়ে ডাঃ রশীদ জুয়েলের আঙুলে অপারেশন করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন। কয়েকদিন পরে আবার দেখাতে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

আলম, বদি, স্বপন, কাজি, চুল্লু আরও দু-একবার বাসায় এসেছে, কখনও খেয়েছে, কখনও খায়নি। ওরা খেলে আমি খুশি হই, কারণ শুধু ওই সময়টাতে খাবার টেবিলে ওদের পাই, মুক্তিযুদ্ধ, মেলাঘর, খালেদ মোশাররফ, হায়দার— বিভিন্ন বিষয়ে দু-চারটে কথা শুনতে পাই।

সঙ্গের ছবিতে পশ্চিম ত্রিপুরার মেলাঘর অঞ্চলের প্রবেশদ্বার

বদি বলল, 'ডাঃ মতিনের ক্লিনিক কোথায় জানেন? রাজারবাগ পুলিশ স্টেশনের ঠিক উল্টো দিকে। তাই ডাঃ রশীদ তার 'ডক্টর' লেখা ভোকসওয়াগনে জুয়েলকে বসিয়ে নিয়ে গেছেন। ওনার সাহস আছে বলতে হবে। কিন্তু জুয়েলকে দেখবার জন্য আমরা আর যাচ্ছি না ওইখানে।'

রুমী বলল, 'এই এলিফ্যান্ট রোডেই আজিজ মামার পলিক্লিনিক আছে, সেখানে নিয়ে গেলেই হবে।'

২৪ আগস্ট মঙ্গলবার ১৯৭১

দিনগুলো যেন কী একরকম নেশার ঘোরে কেটে যাচ্ছে। রুটিনটা অনেকটা এরকম: আমি সকালে উঠেই একগাদা রান্না করে ফ্রিজে রেখে দিই, রুমী প্রায়-প্রায়ই দু-একজন বন্ধু সঙ্গে নিয়ে আসে। কখনও খায়, কখনও খায় না; তবু খাবার সব সময় মজুত রাখি— যদি এসেই বলে 'খিদে লেগেছে, খেতে দাও।' মাঝে মাঝে দু-একটা রাত বাসায় থাকে, তখন আমাদের মধ্যে আনন্দের ধুম পড়ে যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের বেডরুমে বড় বিছানায় সবাই গোল হয়ে বসে আড্ডা দিই, বেশিরভাগ সময় রুমীই বক্তা, আমরা প্রশ্নকর্তা।

আলম, বদি, স্বপন, কাজি, চুল্লু আরও দু-একবার বাসায় এসেছে, কখনও খেয়েছে, কখনও খায়নি। ওরা খেলে আমি খুশি হই, কারণ শুধু ওই সময়টাতে খাবার টেবিলে ওদের পাই, মুক্তিযুদ্ধ, মেলাঘর, খালেদ মোশাররফ, হায়দার— বিভিন্ন বিষয়ে দু-চারটে কথা শুনতে পাই। খালেদ মোশাররফকে এতদিন বাঁকার ভাগনে 'মণি' হিসেবেই চিনতাম, এখন মেলাঘরের এই গেরিলাদের মুখে শুনে শুনে তার একটা অন্য ভাবমূর্তি মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। যে হায়দারকে কোনও দিন চোখে দেখিনি, সেও যেন একটা চেহারা নিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। এস. এস. জি, অর্থাৎ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর 'স্পেশাল-সার্ভিস গ্রুপ'-এর অর্থাৎ কম্যান্ডো গ্রুপের ক্যাপ্টেন এ. টি. এম. হায়দার— যে কিনা পাকিস্তানের আটাকফোর্টে স্পেশাল কম্যান্ডো ট্রেনিংপ্রাপ্ত, যাকে বলা হত জেনারেল মিঠ্ঠা খানের হাতে গড়া কম্যান্ডো— সেই দুর্ধর্ষ হায়দার এই ছেলেগুলোকে কম্যান্ডো ট্রেনিং দিয়ে থাকে। এদের মুখে শুনে শুনে সেই হায়দারও যেন আমার অতি চেনা, অতি আপন হয়ে উঠেছে।

চেনা হয়ে উঠেছে ডঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ডাঃ এম এ মোবিন। এরা দুজনে ইংল্যান্ডে এফ. আর. সি. এস পড়ছিল। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস পাস করে বিলেতে চার বছর হাড়ভাঙা খাটুনির পর যখন এফ. আর. সি. এস. পরীক্ষা মাত্র এক সপ্তাহ পরে, তখনই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু। ছেলে দুটি পরীক্ষা বাদ দিয়ে বাংলাদেশ আন্দোলনে অংশ নিল, পাকিস্তানি নাগরিকত্ব বর্জন করল, ভারতীয় ট্র্যাভেল পারমিট জোগাড় করে দিল্লিগামী প্লেনে চড়ে বসল। উদ্দেশ্য ওখান থেকে কলকাতা হয়ে রণাঙ্গনে যাওয়া। প্লেনটা ছিল সিরিয়ান এয়ারলাইনস-এর। দামাস্কাসে পাঁচ ঘণ্টা প্লেন লেট, সব যাত্রী নেমেছে। ওরা দুজন আর প্লেন থেকে নামে না। ভাগ্যিস নামেনি। এয়ারপোর্টে এক পাকিস্তানি কর্নেল উপস্থিত ছিল ওই দুজন 'পলাতক পাকিস্তানি নাগরিক'কে গ্রেপ্তার করার জন্য। প্লেনের মধ্য থেকে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না, কারণ প্লেন হল ইন্টারন্যাশনাল জোন। দামাস্কাসে সিরিয়ান এয়ারপোর্ট কর্মকর্তা ওদের দুজনকে জানিয়েছিল— ওদের জন্যই প্লেন পাঁচ পাঁচ ঘণ্টা লেট। এমনিভাবে ওরা বিপদের ভেতর দিয়ে শেষপর্যন্ত মে মাসের শেষাশেষি সেক্টর টু রণাঙ্গনে গিয়ে হাজির হয়েছে।

চেনা হয়ে উঠেছে ডাঃ নাজিমও। সে সদ্য এম. বি. বি. এস. পাস করে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে ইন-সার্ভিস ট্রেনিংয়ে ছিল। ২১ এপ্রিল পর্যন্ত ময়মনসিংহ মুক্ত ছিল। তারপর পাকিস্তানিরা শহর দখল করলে, নাজিম কোনওমতে পালিয়ে পায়ে হেঁটে, নৌকোয়, ট্রাকে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পেরিয়ে, মে মাসের প্রথমদিকে বর্ডারের ওপারে গিয়ে দাঁড়ায়। খোঁজখবর করে আগরতলা হয়ে মতিনগরে যায়। সেখানে ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের লোকেরা তাকে গ্রেপ্তার করে। সে সময় কেউ ঠিকমতো রেফারেন্স দিতে না পারলে বি. এস. এফ-এর লোকেরা তাকে ধরত পাকিস্তানি গুপ্তচর সন্দেহে। শাহাদতের ছোট ভাই ফতেহ চৌধুরীও প্রথম মতিনগরে গিয়ে বি. এস. এফ-এর লোকের হাতে পড়েছিল। সে তার আগের চেনা পাড়ার ছেলে ডাঃ আখতার আহমদের নাম বলেছিল। তারপর আর কোনও অসুবিধা হয়নি। ডাঃ নাজিমও আগরতলার এক পরিচিত লোকের নাম বলে পার পেয়েছিল। তারপর সোনামুড়ার হাসপাতালে কাজে লেগে যায় সে। সবচেয়ে নাটকীয় ব্যাপার হল— পাঁচ মে নাজিমও মতিনগরে গেল, আর তার পরপরই এগারো

মে পাকিস্তানি সৈন্যরা বিবিরবাজার আক্রমণ করে দখল করে নিল। পূর্ব বাংলার বর্ডারের ঠিক ভেতরেই এই বি. ও. পি-টা এতদিন মুক্তিবাহিনীর দখলে ছিল। বিবিরবাজার যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বেশ ক'জন জখম হয়। শ্রীমন্তপুর বি. ও. পি ভারতীয় বর্ডারের ঠিক ভেতরেই, প্রায় বিবিরবাজারের মুখোমুখি। পাকিস্তানিদের নিক্ষিপ্ত শেল শ্রীমন্তপুরেও এসে পড়ছিল। ডাঃ আখতার আহমদ তার 'এক-বেডের ক্যাম্প হাসপাতালটি' সরাতে ব্যস্ত ছিল। ওখানে রুগি রাখা মোটেও নিরাপদ ছিল না। তাই যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথমে সোনামুড়ার ভারতীয় হাসপাতালে পাঠানো হতে থাকে। ওই একই সময়ে খালেদ মোশাররফ ডাঃ নাজিমকে সোনামুড়ায় পাঠায়। সেখানে ফরেস্ট ডাকবাংলোটা দেওয়া হয় মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য। ডাঃ নাজিম ওইখানেই আহতদের চিকিৎসায় লেগে যায়। ইতোমধ্যে আখতারও এসে পড়ে শ্রীমন্তপুর থেকে।

ডালিয়া সালাহউদ্দিন ঢাকায় ডাক্তারি পড়ত, বাফার নাচের স্কুলের ছাত্রী ছিল। ভালো নাচে বলে বেশ নামও ছিল। সেই ডালিয়া আর তার হবু স্বামী শামসুদ্দিন এখন সেক্টর টু'র হাসপাতালে। শামসুদ্দিনও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে শেষ বর্ষের ছাত্র ছিল।

চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে তৈয়ব আলীর চেহারা। তাকে কখনও দেখিনি, কিন্তু রুমীর মুখে শুনে শুনে মনে হয় তৈয়ব আলী এসে দাঁড়ালেই আমি তাকে চিনতে পারব। ঢাকার উপকণ্ঠে মাদারটেকে বাড়ি তৈয়ব আলীর। লেখাপড়া করেছে ক্লাস সিক্স-সেভেন পর্যন্ত। আম কলা লিচু ফেরি করে জীবিকা নির্বাহ করত ক্র্যাকডাউনের আগে। কিন্তু বুকের ভেতরে ছিল দেশপ্রেম। মার্চের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ক্র্যাকডাউনের পর চলে যায় দু'নম্বর সেক্টরে। তৈয়ব আলীর সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি আশ্চর্য রকম। তার স্পষ্টবাদিতার কারণে মেলাঘরে সে খুব জনপ্রিয় ছিল না; কিন্তু এই গুণের জন্যই রুমী তাকে বিশেষ চোখে দেখত। ক্রমে সেও রুমীর খুব ভক্ত হয়ে ওঠে। ক্যাম্পের ছেলেদের কথা তৈয়ব আলী তেমন শুনত না। তাকে দিয়ে কোনও কাজ করাতে হলে অন্য ছেলেরা রুমীকে গিয়ে ধরত। রুমী বললে তৈয়ব আলী বিনা প্রতিবাদে সব কাজ করে দিত। তৈয়ব আলী তার সাহস আর নিষ্ঠার জন্য খুব তাড়াতাড়িই সেক্টর টুতে সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে।

তৈয়ব আলী এখন পিরুলিয়া ক্যাম্পে রুমীদের দলের সঙ্গেই রয়েছে। সেখানে সে সকালে নাশতা বানিয়ে রুমীদেরকে খাওয়ায়।

দুপুরে, রাতে রান্না করে রাখে, সারা দিনের পর রুমীরা ক্লান্ত হয়ে ফিরলে তাদের যত্ন করে খাইয়ে শুইয়ে দেয়।

রুমীর বন্ধুরা খেতে এলে সাধারণত মেলাঘরের কথাই জিগ্যেস করি। আজ সাহস করে ঢাকার কথা জিগ্যেস করে ফেললাম। অবশ্য ঘুরিয়ে। কদিন আগে গ্রিন রোডে এক দুঃসাহসিক অ্যাকশান হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন বিচ্ছু মিলিটারি ট্রাকে বোমা ছুঁড়েছে, গুলি করেছে। নানা লোকের মুখে যে আশ্চর্যজনক ঘটনাটা শুনতে পেয়েছি, তা হল— ট্রাকের পাকিস্তানি সৈন্যগুলো বিচ্ছুদের প্রতি-আক্রমণ করার কোনও চেষ্টা না করে পালিয়ে যায়। সেই কথার সূত্র ধরে বললাম, 'সত্যি সাহস বটে বিচ্ছুগুলোর আর আওয়াজ যা হয়েছিল না, সারা পাড়া কেঁপে উঠেছিল। আমার মা ধানমন্ডি ছয় নম্বর রোডে থাকেন। তিনিও আওয়াজ পেয়েছিলেন। সত্যি বলতে কী, আমরা আজকাল দিনরাতের প্রায় সব সময়ই এত ধরণের আওয়াজ শুনি যে, ভেবেই পাই না তোমরা কী করে এত আওয়াজ করো। তবে মজা কী জানো, আজকাল ওইসব আওয়াজ না শুনলে আমাদের ঘুমই হয় না।'

আলম ছেলেটি কথা কম বলে (হয়তো বা আমার সামনে!), সে বেশ ধীরে-সুস্থে গম্ভীর গলায় আস্তে করে বলল, 'আপনাদের ঘুমানোর

'সত্যি বলতে কী, আমরা আজকাল দিনরাতের প্রায় সব সময়ই এত ধরণের আওয়াজ শুনি যে, ভেবেই পাই না তোমরা কী করে এত আওয়াজ করো। তবে মজা কী জানো, আজকাল ওইসব আওয়াজ না শুনলে আমাদের ঘুমই হয় না।'

সঙ্গের ছবিতে আক্রমণরত মুক্তিযোদ্ধারা

জন্য আওয়াজটা খুবই দরকার বলে মনে করছেন। কিন্তু ঢাকার মানুষের ঘুম পাড়ানোর ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য আমাদের মোটেও নেই। আমাদের উদ্দেশ্য হল, খানসেনাদের দিনের আরাম, রাতের ঘুম হারাম করা, ওদেরকে সব সময় 'মুকুতের ভূত' দেখানো। খালেদ মোশাররফ এগুলোকেই সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার বলেন।'

আমি আড়চোখে রুমীর দিকে তাকালাম, সে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে চুল্লুর সঙ্গে কী যেন বলছে। আমি গলা নামিয়ে আলমকে প্রশ্ন করে ফেললাম, 'বলো না, তোমরা কীভাবে এগুলো করো।'

আলম বলল, 'এগুলো ছোট ছোট অ্যাকশান। এর কোনও ধারাবাহিকতা বা পূর্ব-নির্ধারিত প্ল্যান থাকে না। এটা যে যার সুবিধেমতো চলতে ফিরতে করে যাচ্ছে। নানারকম জিনিস দিয়ে এগুলো করা হয়ে থাকে, তবে এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী যে জিনিসটা, তা হচ্ছে 'এ্যান্টি পার্সোনাল মাইন।' এগুলো খুব ছোট্ট সাইজের বিস্ফোরক, প্যান্টের পকেটে বা গাড়ির গ্লাভ-কম্পার্টমেন্টে সহজেই লুকিয়ে রাখা যায়।'

কথা বলতে বলতে আলম দেয়ালের পাশে কাপ-ডিস রাখার ছোট আলমারির দিকে আঙ্গুল তুলে বলল, 'ওটা কিসের কৌটো?'

তাকিয়ে দেখলাম, খাটো আলমারিটার মাথায় গ্লাস, ওষুধের শিশি-বোতলের সঙ্গে একটা ছোট কৌটো। বললাম, 'ওটা ওরিয়েন্টাল বাম' বলে একটা মলমের কৌটো। কপালে লাগালে মাথা ধরা ছেড়ে যায়।'

আলম হেসে বলল, 'ওইরকম ছোট টিনের কৌটোর চেয়ে একটু বড় দেখতে এই মিনি মাইনগুলো। বলতে পারেন ডবল ওরিয়েন্টাল বাম। এগুলো বিচ্ছুরা সুযোগ-সুবিধেমতো গাড়ির চাকার নীচে বসিয়ে দেয়। যে রাস্তা দিয়ে মিলিটারির কনভয় যাবে, আগে থেকে জানতে পারলে সেই রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে আসে। জিপ বা ট্রাকের চাকা মাইনের ওপর পড়লেই বিকট আওয়াজে চাকা ফাটে। বেশির ভাগ সময়ই গাড়ি উল্টে যায়।

জামী হেসে বলল, 'ওই ওরিয়েন্টাল বামে খানসেনাদের মাথাধরা ছাড়ে না, আরও বেড়ে যায়।'

২৫ আগস্ট বুধবার ১৯৭১

রুমী বলল, 'আম্মা, আমাকে একটু ২৮ নম্বর রোডে নামিয়ে দেবে?'

সাড়ে ছ'টা প্রায় বাজে। পশ্চিম আকাশে সূর্য লালচে হয়ে এসেছে। যেতে যেতে জিগ্যেস করলাম, 'কখন ফিরবি? নিতে আসব?' রুমী অন্যমনস্কভাবে বলল, 'কখন ফিরব? কী জানি। ঠিক বলতে পারছি না। তা, আধঘণ্টা পরে এসো না হয় একবার।'

রুমীকে একটু যেন কেমন কেমন লাগছে। গতকাল দুপুরে খাওয়ার পর চলে গিয়ে আজই বিকেল পাঁচটার দিকে বাড়ি ফিরেছে। কী এক চাপা উত্তেজনায় ও চনমন করছে। মুখচোখ লালচে। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে, সেটা চাপতে ওর কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে কিছু জিগ্যেস করতে সাহস হল না।

ধানমন্ডির ২৮ নম্বর রোডের যে বাড়িটায় ওদের আস্তানা সেটার মালিক দিলারা হাশেম। সে তার স্বামী-সন্তান নিয়ে করাচিতে থাকে। বাড়িটা ভাড়া দিয়েছে রাইকার ল্যাবরেটরিজকে। চুল্লু অর্থাৎ মাসুদ সাদেক ওই কোম্পানির ফিল্ড ম্যানেজার। বাড়িটা রাইকার ল্যাবরেটরিজ-এর অফিস, তাই অফিস বন্ধের পর দারোয়ান আর নাইটগার্ড ছাড়া আর কেউ ও বাড়িতে থাকে না।

রুমীকে নামিয়ে দিয়ে তক্ষুনি বাড়ি ফিরলাম না। আধঘণ্টা পরে তাকে নিয়ে আসতে বলেছে। তাহলে ধরে নেওয়া যায় সে রাতে বাড়িতেই থাকবে। সুতরাং কিছু স্পেশাল খাবারের ব্যবস্থা করা যায় আজ। রুমী খেতে ভালোবাসে। ঢাকা ক্লাবে চলে গেলাম। স্মোকড হিলশা আর চিকেন ক্র্যাব চপ কয়েক প্লেট নিলাম। নিতে নিতে আধঘণ্টা কেটে গেল। সুতরাং আবার চলে গেলাম ২৮ নম্বর রোডের বাড়িটায়। গেটের কাছে পৌঁছতেই দেখি একটা ফিয়াট ৬০০ বেরোচ্ছে। আমাকে দেখে গাড়িটা আমার ডানপাশে থামল। চালক হ্যারিস, রুমীর বন্ধু। ওকে দেখে আমিও থামলাম; কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ না করেই জিগ্যেস করলাম, 'রুমী আছে ভেতরে?' হ্যারিসও গাড়ির ভেতর থেকেই বলল, 'না চাচি, রুমী তো এই পাঁচ মিনিট আগে বেরিয়ে গেল।' আমি এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, 'ও, আচ্ছা, বেস্ট অব লাক।'

বাড়ি ফিরে এলাম। এখন সমস্ত ব্যাপারটাই অনিশ্চিত হয়ে গেল। রুমী বাড়ি ফিরবে কি ফিরবে না, খাবে কি খাবে না, কিছুই বলা যাচ্ছে না। তবু খাবারগুলো গুছিয়ে রেখে ভাবলাম, ফ্রিজে কিমা রান্না করা আছে, কয়েকটা মোগলাই পরোটা বানাই। রুমীর ভীষণ প্রিয়। আজ না আসে, কাল খাবে।

আধঘণ্টাও কাটেনি, দরজায় ঘন ঘন বেল। বেল টিপে আর যেন ছাড়েই না; শরীফ, জামী ওপরে বাবার কাছে। আমিই রান্নাঘর থেকে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতেই হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকল রুমী, কাজি আর অচেনা একটি অল্পবয়সী ছেলে। আমি অবাক। মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে। তিনজনেরই মুখ লাল। ঠোঁট টিপে শান্ত হয়ে রয়েছে, কিন্তু আমার মনে হল ওদের ভেতরে চাপা উল্লাস আর হাসি ফুলে ফুলে উঠছে। রুমী ঢুকেই দরজা বন্ধ করে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বলল, 'আম্মা, ওপরে চলো, কথা আছে।'

দোতলায় রুমীর ঘরে এসে সবাই ঢুকলাম। হলে বসা শরীফ আর জামী আমার হাতের ইশারায় পিছু পিছু এল। রুমী চাপা আনন্দ আর উত্তেজনায় ফিসফিস করে বলল, 'আম্মা, আব্বু, আমরা একটা অ্যাকশান করে এলাম এইমাত্র। সাত-আটটা খানসেনা মেরে এসেছি।'

আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল, 'বলিস কী রে?'

আনন্দ-ডগমগ গলায় কাজি বলল, 'হ্যাঁ চাচি, ১৮ নম্বর রোডে। ওখানে একটা বাড়ির সামনে আমরা সবাই গাড়ি থেকে গুলি করে খানসেনা মেরে পাঁচ নম্বর রোড দিয়ে আসছিলাম। মিলিটারি জিপ পিছু নিয়েছিল। রুমী তাই দেখে গাড়ির পিছনের কাচ ভেঙে গুলি চালায়। ওর দুই পাশ থেকে স্বপন, বদিও গুলি করে। জিপ উল্টে সবগুলো মরেছে।'

রুমী বলল, 'আম্মা দেখো, আমার ঘাড়ে কাঁধে স্টেন থেকে আগুনের ফুলকি ছুটে কীরকম ফোসকা পড়ে গিয়েছে। রাস্তায় মিলিটারি ধরলে এইটার জন্যই ফেঁসে যাব।'

রুমীর শার্টের কলার সরিয়ে দেখলাম ঘাড়ে-গলায় কাঁধে অনেকগুলো কালো কালো ছোট ছোট ফোসকা। শার্টও ফুটো ফুটো হয়ে গিয়েছে। জিগ্যেস করলাম 'কী করে হল?'

রুমী বলল, 'স্টেনগান ফায়ার করার সময় তার গা দিয়ে আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরোয়। আমার ঘাড়ের দু'পাশ থেকে বদি ভাই, স্বপন বাই ফায়ার করেছে তো, তাই আগুনের ফুলকিগুলো আমার গায়েই পড়েছে। তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'উঃ। কানে এমন তালা লেগে গিয়েছে, কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না।'

ডেটল-তুলো দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করতে করতে বললাম, 'এত অল্প সময়ের মধ্যে কী কাণ্ড? কী করে করলি?'

'বলব পরে। পাশের গলিতে এক বাড়িতে অস্ত্র রেখে এসেছি। এক্ষুনি নিয়ে আসতে হবে। তোমাকে যেতে হবে গাড়ি নিয়ে। মহিলা ড্রাইভার দেখলে ওরা গাড়ি থামাবে না— আশা করা যায়। আমি যাব তোমার সঙ্গে। কাজি ভাই, সেলিম, তোমরা ছাদের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো। আমরা অস্ত্র নিয়ে আসছি। আম্মা, দুটো ছালা নিয়ে নাও। আব্বু, আমরা যাবার পর পোর্চের বাতি নিভিয়ে রেখো। যদি মেহমান আসে, তাহলে জ্বালিয়ে রেখো। পোর্চে বাতি দেখলে আমরা ঢুকব না।'

নীচে নেমে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বারেককে বললাম, 'ভাত আর ডাল চড়াও।' স্টোর থেকে দুটো বস্তা বের করে নিলাম।

গাড়ি ব্যাক করে রাস্তায় নামলাম। রুমী পিছনে বসল। পাশের গলিটা একেবারে

পাশেই। মেইন রোডে উঠে দুটো বাড়ির পরেই। গলিতে ঢোকার মুখে রুমী চাপা স্বরে বলল, 'একদম গলির শেষ মাথায় চলে যাও।' বলা বাহুল্য, এ গলিটাও কানা, আমাদের গলির মতোই।

আমিও ফিসফিসিয়ে বললাম, 'শেষ মাথার বাড়িটা হাই সাহেবের যে! ওই বাড়িতে?'

'না। ঢুকে দুটো বাড়ির পরে, ডান-হাতি। কিন্তু গাড়িটা শেষ মাথায় নিয়ে আগে দেখব কেউ ফলো করছে কি না।'

গলির শেষ বাড়িটা ইঞ্জিনিয়ার হাই সাহেবের। ডান-হাতি। গেট খোলা ছিল। গাড়ি ভেতরে ঢোকালাম। হাই সাহেব দোতলায় থাকেন। একতলাটা ভাড়া। পোর্চ বেশি বড় নয়। গাড়ি ঢুকিয়ে বের করতে হলে ব্যাক করে রাস্তায় নামতে হয়। আমরা গাড়ি থেকে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে নামলাম। একতলার সামনের দিকের ঘরের জানালার পর্দা বাতাসে উড়ছে। ভেতরে উজ্জ্বল আলো। খাটে বসে চারজন লোক তাস খেলছে। পাশে চেয়ারে তিন-চারজন মহিলা-পুরুষ কথা বলছে। সবাই খেলা আর আড্ডা নিয়ে এমনই মগ্ন যে মাত্র চার ফুট দূরে বাইরে একটা গাড়ি এসে থামল, কেউ একবার চোখ তুলেও তাকাল না। আমরা গাড়ি থেকে নেমে গেটের মুখে দাঁড়ালাম। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। রুমী বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি হেঁটে গিয়ে দেখে আসি ও বাসায় বাইরের লোক কেউ আছে কি না।'

আমি বৃষ্টির ফোঁটা এড়াবার জন্য একতলার ওই জানালাটার পাশেই দেয়াল ঘেঁষে একবার দাঁড়াই, আবার অস্থির হয়ে গেটের কাছে যাই। বাতাসে জানালার পর্দা উড়ছে, ভেতরে উজ্জ্বল আলোয় বসে সাত-আটটি নরনারী তাস খেলছে, কলকণ্ঠে কথা বলছে, তুমুল হাসিতে ভেঙে পড়ছে, ভয় হচ্ছে এই বুঝি কেউ জানালার বাইরে তাকিয়ে 'কে, কে?' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, কিন্তু কেউ একবারও ভুলেও জানালার দিকে তাকাচ্ছে না। আমার খুব স্বস্তি লাগছে, আবার আশ্চর্যও লাগছে। এমন দিনকাল, একতলার জানালার বাইরেই গাড়ি থামছে, লোক নামছে, কেউ কেউ আবার সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরাও করছে, তারা একবার খেয়ালও করবে না? মনে হচ্ছে আমি অনন্তকাল ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, লোকগুলোও অনন্তকাল ধরে ওইরকম হাসি-গল্প-আড্ডা-খেলায় মেতে রয়েছে। যেন কার অভিশাপে ওরা বিশ্বসংসার ভুলে ওইরকম কলবল করছে।

রুমী ফিরে এসে চুপিচুপি বলল, 'চলো। আস্তে চালাবে।'

গাড়ি ব্যাক করে আবার গলিতে। নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে এসে রুমী থামতে বলল। এবার

সিঁড়ি বেয়ে একেবারে ছাদের ঘরে। এতক্ষণে আমার হাতে-পায়ে জোর ফিরে এসেছে, ধুকপুকুনির বদলে বুকে এখন উত্তেজনার জোয়ার। বললাম, 'বের কর তো, দেখি তোদের কীরকম অস্ত্র।' রুমী, কাজি বস্তা খুলে সাবধানে অস্ত্র বের করে জাজিমের ওপর রাখল। পাঁচটা স্টেনগান, একটা পিস্তল, দুটো হ্যান্ড গ্রেনেড। জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

বাঁয়ে গাড়িটা। আমি গেট ঘেঁষে গলিতেই গাড়ি পার্ক করে গাড়িতে বসে রইলাম। রুমী বস্তা দুটো নিয়ে ভেতরে চলে গেল। তার ফিরে আসার সাড়া পেতেই আমি গাড়ি থেকে নেমে পিছনের বুটি খুলে দিলাম।

এ গলি থেকে পাশের গলি— কতটা পথ? পোয়া মাইল? তাও হবে কি না সন্দেহ। কিন্তু বুকে এমন ধুকপুকুনি, হাতে-পায়ে এমন গিঁট-ছাড়া ভাব, মনে হচ্ছে পঞ্চাশ মাইল চালিয়ে এসেছি।

পোর্চের বাতি নেভানো। শরীফ, জামী বুঝিবা দরজার ওপাশেই দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি থামতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল। রুমী বুটি খুলল। সঙ্গে সঙ্গে গেট দিয়েও কে যেন ঢুকল। আমরা আঁতকে উঠলাম। কিন্তু না, বাইরের কেউ নয়, মাসুম। শরীফ, জামী টুক করে বস্তা দুটো তুলে ঘরে ঢুকে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে একেবারে ছাদের ঘরে। এতক্ষণে আমার হাতে-পায়ে জোর ফিরে এসেছে, ধুকপুকুনির বদলে বুকে এখন উত্তেজনার জোয়ার। বললাম, 'বের কর তো, দেখি তোদের কীরকম অস্ত্র।' রুমী, কাজি বস্তা খুলে সাবধানে অস্ত্র বের করে জাজিমের ওপর রাখল। পাঁচটা স্টেনগান, একটা পিস্তল, দুটো হ্যান্ড গ্রেনেড। জীবনে এই প্রথম দেখলাম। আমি, শরীফ, জামী, মাসুম— চারজনে হুমড়ি খেয়ে বসে অস্ত্রগুলো হাতে তুলে উল্টেপাল্টে দেখলাম, সেগুলোর গায়ে হাত বুলোলাম, হ্যান্ড গ্রেনেড দুটোও একটু ছুঁয়ে দেখলাম। রুমীরা এগুলোকে বলে 'পাইন অ্যাপল— আনারস।' যতই আনারস বলুক, এগুলো মোটেই আনারসের মতো নিরীহ নয়।

আমি আবার বলতে যাচ্ছিলাম, 'বল দেখি কী করে কী করলি—' কিন্তু শরীফ থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ওসব পরে শুনব। এগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখব, তাই ঠিক কর আগে।'

অনেক চিন্তাভাবনা করে ঠিক হল, নীচের উঠোনে পানির যে বিরাট হাউজটা আছে, সেটার ভেতরে একটা টুল বসিয়ে তার ওপর অস্ত্র রাখা হবে। হাউজটা চওড়ায় আট ফুট, লম্বায় দশ ফুট, উঁচুতে তিন ফুট। তার এ মাথার এক কোণে লোহার তৈরি গোল একটা ম্যানহোল, এইটে দিয়ে হাউজটার ভেতরে নামা যায়। হাউজটা এখন কানায় কানায় ভর্তি। আমাদের প্যান্ট্রিতে কয়েকটা টুল আছে, সেগুলো সওয়া দু'ফুট উঁচু। হাউজের নীচের ট্যাপটা খুলে দেওয়া হল খানিকটা পানি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। একটা টুল ভেতরে বসালো যেন তার বসার জায়গাটা পানির ওপর জেগে থাকে। বারেককে কিছু একটা কিনতে রশীদের দোকানে পাঠানো হল। জামী হাউজের ভেতরে নেমে টুলটা দূরতম কোণে নিয়ে বসালো। অস্ত্রগুলো ছালা দুটোতে ভরে ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ওই টুলের ওপর রাখা হল। যদি রাতে মিলিটারি আসেও, এই পানিভর্তি হাউজের ঢাকনা খুলে তাকায়ও, তাহলে টলটলে পানি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। কারণ এখান থেকে উঁকি দিয়েও ওই কোণার টুল দেখা যায় না। টুল আবিষ্কার করতে হলে কাউকে হাউজের ভেতর নামতে হবে।

একটু পরে কাজি আর সেলিম চলে গেল। সেলিম ছেলেটিকে এই প্রথম দেখলাম। শুনলাম, ও শাহীন স্কুলের ছাত্র, এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। এপ্রিলেই মেলাঘরে চলে গিয়েছিল।

খাওয়াদাওয়ার পর রুমীকে ঘিরে আমরা চারজনে বসলাম। ওদের এই চমকপ্রদ অ্যাকশানের কথা শুনবার জন্য আর তর সইছিল না। রুমী যা বলল, তা হল এই:

ধানমন্ডির বিশ নম্বর রাস্তার একটা বাড়িতে চাইনিজ এমব্যাসির কোনও বড় কর্তা বাস করে। সে বাড়ির সামনে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি মিলিটারি পুলিশ পাহারা দেয়। আঠারো নম্বর রোডের একটা বাড়ির সামনেও বেশ সাত-আটজন মিলিটারি পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অনুমান হয়, ও বাড়িতে কোনও ব্রিগেডিয়ার থাকে। কয়েকদিন থেকে বদি, আলমের মাথায় চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

গতকাল হঠাৎ বদি, আলম, শাহাদত এরা মিলে প্ল্যান অব অ্যাকশান ঠিক করে ফেলে। ২৫ আগস্ট সন্ধ্যারাতে কয়েকটা অ্যাকশান হবে— বদি, আলম, কাজি, রুমীরা একটা গাড়িতে, হ্যারিস, মুক্তার, জিয়ারা আরেকটা গাড়িতে। পাঁচ মাস আগে এই ২৫ তারিখের রাতেই বিবেকহীন বর্বর হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বিচ্ছুরা উপলব্ধি করে এই তারিখে এমন কিছু করা দরকার, যাতে সামরিক জান্তা ভালোমতো নাড়া খায়।

রুমীরা পিরুলিয়া গ্রামে ওদের ক্যাম্প থেকে দরকারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে আজকেই দুপুরে। হ্যারিস আর জাহির গুলশান লেকের ঘাট থেকে রুমীদেরকে দুটো গাড়িতে তুলে ২৮ নম্বর রোডের বাড়িতে নিয়ে যায়। তারপর বদি, আলম একদিকে, হ্যারিস, মুক্তার অন্যদিকে— এই দু'দল দু'দিকে বেরিয়ে যায় দুটো গাড়ি হাইজ্যাক করতে। বদি, আলম, ধানমন্ডি চার নম্বর রোড থেকে একটা মাজদা গাড়ি হাইজ্যাক করে। গাড়িটা ছিল আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের বড় ছেলে মাহবুব আনামের। হ্যারিসরা একটা ফিয়াট ৬০০ হাইজ্যাক করে ধানমন্ডি ২২ নম্বর রোডের মোড় থেকে।

ঠিক হয়: আলম, বদি, কাজি, রুমী, স্বপন ও সেলিম প্রথমে ধানমন্ডিতে অ্যাকশান করবে। হ্যারিস, জিয়া, মুক্তার, আনু ও আরও দুটো ছেলে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে। আলমরা গিয়ে ওদের সঙ্গে জয়েন করবে। তারপর দু'গাড়ি মিলে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের গেটে এবং তারপর শহরের অন্যান্য দিকে সুযোগ-সুবিধেমতো আরও কিছু অ্যাকশন করবে।

রুমীটা যখন বেরোয়, শাহাদত জিজ্ঞেস করে, 'হোয়াট আর ইয়োর টার্গেটস? কোন দিকে যাচ্ছ?' আলম জবাব দেয়, ডেস্টিনেশান— আননোন। টার্গেট— মোবাইল।'

রুমীরা সন্ধ্যা ৭-২৫ মিনিটে ২৮ নম্বর রোড থেকে বেরিয়ে ৩২ নম্বর দিয়ে পুল পেরিয়ে ডাইনে ও বাঁয়ে ঘুরে ২০ নম্বর রোডে পড়ে। গাড়ি চালাচ্ছিল আলম, তার বাঁ পাশের প্রথমে সেলিম ও তারপরে কাজি। পিছনের সিটে মাঝখানে রুমী, তার ডান পাশে (অর্থাৎ আলমের ঠিক পিছনে) স্বপন, বাঁ পাশে বদি। চাইনিজ ডিপ্লোম্যাটের বাসার সামনে গিয়ে দেখে পুলিশগুলো নেই। ওরা হতাশ হয়। আলম বলে তাহলে ১৮ নম্বরে যাই। ১৮ নম্বর রোডে নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে গিয়ে দেখে সাত-আটজন মিলিটারি পুলিশ বেশ মৌজ করে গল্প করছে, সিগারেট খাচ্ছে।

আলম বলল, 'ব্রিগেডিয়ার সাহেব বাড়ি

নেই নিশ্চয়, তাই খুব হেলে-বেঁকে আড্ডা দেওয়া হচ্ছে। অলরাইট বয়েজ, ইউ হ্যাভ থ্রি মিনিটস। আমি সামনের সাত মসজিদের মোড় থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি।'

এখন বাড়িটা ডান হাতে রয়েছে। গাড়ি ঘুরিয়ে আনলে বাড়িটা বাঁয়ে পড়বে। তাহলে গাড়ির বাঁদিকে বসা কাজি ও বদি সামনের-পিছনের দুই জানালা দিয়ে ফায়ার করতে পারবে। গাড়ি ঘুরিয়ে আনতে আনতে আলম নির্দেশ দিল কাজি, সেলিম আর বদি গুলি করবে, রুমী ও স্বপন নজর রাখবে, ও তরফ থেকে কেউ অস্ত্র তোলে কি না, তুললে তাদের শেষ করার ভার রুমী আর স্বপনের।

গাড়ি ধীরগতিতে বাড়িটার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আলমের চাপা গলার কম্যান্ড শোনা গেল: 'ফায়ার।' অমনি গাড়ির দুই জানলা দিয়ে ঝলকে ঝলকে ছুটে গেল স্টেনগানের গুলি। দুটো স্টেন থেকে দুই লেভেলে গুলি গেল— বদির স্টেন থেকে ওদের পেটের লেভেলে, কাজির স্টেন থেকে ওদের বুকের লেভেলে। সেলিমও কাজির সামনে দিয়ে বাঁয়ে ঝুঁকে গুলি করল। পুলিশগুলো গল্পের মৌজে ছিল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধপাধপ পড়ে গেল সাত-আটটা তাগড়া শরীর। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগল মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তার পরই গাড়িটা হঠাৎ যেন জেটের গতিতে গিয়ে ঢুকল ২০ নম্বরে, তাদের আগের টার্গেটে। কিন্তু ওদের কপাল মন্দ। চিনা ডিপ্লোম্যাটের বাসার সামনে এখনও কোনও প্রহরী নেই। কী হতে পারে? কিন্তু আলমদের দেরি করার উপায় নেই। অ্যাকশনটা মনোমতো

এরপর আলম ধানমন্ডির ভেতরের বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে এসে সাত নম্বর রোডের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে মিরপুর রোডে পড়ে। ডাইনে মোড় নেয় নিউ মার্কেটের দিকে মুখ করে। পাঁচ নম্বর রোডের মুখ বরাবর আসতেই ওরা দেখে কী— সামনে লাইন ধরে গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তার মানে ওখানে মিলিটারি চেকপোস্ট বসে গিয়েছে, গাড়ি চেক হচ্ছে।

সঙ্গের ছবিতে ধানমন্ডি এলাকা, এখন

হল না। কিন্তু কী করা?

এরপর আলম ধানমন্ডির ভেতরের বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে এসে সাত নম্বর রোডের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে মিরপুর রোডে পড়ে। ডাইনে মোড় নেয় নিউ মার্কেটের দিকে মুখ করে। পাঁচ নম্বর রোডের মুখ বরাবর আসতেই ওরা দেখে কী— সামনে লাইন ধরে গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তার মানে ওখানে মিলিটারি চেকপোস্ট বসে গিয়েছে, গাড়ি চেক হচ্ছে। তার মানে, ১৮ নম্বর রোডের বাড়ির সামনে এম পি মারার খবর এর মধ্যেই ওরা জেনে গিয়েছে।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল আলম। সামনের রাস্তায় ব্যারিকেড। দুটো ট্রাক মিরপুর রোড জুড়ে এদিকপানে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা জিপ রাস্তার ডানদিকে, সেটার মুখও এদিকেই ফেরানো। আরেকটা জিপ, রাস্তার বাঁপাশে পেট্রল পাম্পটার সামনে নিউ মার্কেটের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো। এবং মাটিতে, রাস্তার ওপর দু'জন শুয়ে— এল এম জি নিয়ে।

আলম যেমন ভেবে রেখেছিল, দু'জন এম পি হাত উঠিয়ে চেঁচিয়ে গাড়ি থামাতে বলতেই সে হেডলাইট অফ করে ডানদিকে টার্ন নেবার ইনডিকেটার দিয়ে সামান্য ডানদিকে ঘুরবার ভাব দেখাল। এম পি দুটো চেঁচিয়ে একটা গাল দিয়ে বলে উঠল, 'কিধার যাতা হ্যায়?' সঙ্গে সঙ্গে আলম তীব্রগতিতে বাঁয়ে টার্ন নিল। বদি আর রুমী একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও-ই এলেমজি নিয়ে শুয়ে আছে মাটিতে। ফায়ার!' আলমও চেঁচিয়ে উঠল, 'ফায়ার!' ঠাঠা ঠাঠা করে স্বপন ও বদির স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে গুলি ছুটে গেল। রুমী স্টেন হাতে সিটের ওপর হাঁটু চেপে উল্টো হয়ে বসে পিছনের কাচের ভেতর দিয়ে এদিক-ওদিক দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকল— ওদিক থেকে কারও হাতের অস্ত্র উদ্যত হচ্ছে কিনা। আশ্চর্যের ব্যাপার ওদিক থেকে একটাও গুলি ছুটে এল না। তার মানে মাটিতে শোয়া আর্মি দু'জন খতম, অন্যরা ঘটনার দ্রুততা ও আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়েছে। এই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আলম গাড়ি পাঁচ নম্বর রোডে ঢুকিয়ে ফেলেছে। রোডটা অল্প একটুখানি গিয়েই গ্রিন রোডে পড়েছে। প্রায় গ্রিন রোডে গাড়ি পৌঁছে গিয়েছে, এমনই সময় হঠাৎ রুমীর চোখে পড়ে একটা মিলিটারি জিপ তাদের পিছু নিয়েছে। সে সেই তখন থেকেই পিছনের সিটে উল্টো বসে কাচের ভেতর দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়েছিল। সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'লুক, লুক, আ জিপ ইজ ফলোয়িং আস।' এবং সঙ্গে সঙ্গে তার স্টেনের বাঁট দিয়ে আঘাত করে পিছনের কাচ ভেঙে ফায়ার শুরু করে জিপটার

> কিন্তু মজার ব্যাপার হ্যারিসরা 'বাঙালি পুলিশ মারব না' বলে সিদ্ধান্ত নেয়, একই সঙ্গে বাঙালি পুলিশরাও 'ওরে বাবা! মুক্তিবাহিনী' বলে ওদের দিক থেকে চোখ উঠিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

ওপর। একই সঙ্গে রুমীর দুই পাশ থেকে বদি এবং স্বপনও ফায়ার শুরু করে ভাঙা কাচের ফাঁক দিয়ে। ক'জন মরল তার হিসেব না পেলেও জিপের ড্রাইভার যে প্রথম চোটেই মরেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ব্রাশ ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গেই জিপটা হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোড়ের ল্যাম্পপোস্টে গিয়ে ধাক্কা খেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্টে গেল। সেই মুহূর্তে আলম আরেকটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। বাঁদিকে টার্ন নেওয়ার ইন্ডিকেটার লাইট জ্বালিয়ে বাঁয়ে গ্রিন রোডের দিকে একটু ঘুরেই শাঁ করে তীব্রগতিতে ডাইনে ঘুরে আবার নিউ মার্কেটমুখো হল। এবং ঝড়ের গতিতে সেই পেট্রল পাম্পটার অন্য পাশ দিয়ে নিউ এলিফ্যান্ট রোডের দিকে গাড়ি ছোটাল। আলম ছাড়া বাদ বাকি সবাই পিছনদিকে তাকিয়ে দেখল, যেমনটি আলম ভেবেছিল— ট্রাকদুটো, বাকি জিপটা গ্রিন রোডের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে বিচ্ছু গাড়িটাকে ধরবার জন্য!

এতক্ষণে গাড়ির ভেতরেই সবাই স্বস্তির প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল। নিউ এলিফ্যান্ট রোডে ঢুকে তবে আলম আবার হেড লাইট জ্বালল।

এবার ওরা চিন্তা করতে লাগল অস্ত্রগুলো কোথায় রাখা যায়। গাড়িটা তাড়াতাড়ি ডাম্প করা দরকার। ঝির-ঝির করে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। আমাদের গলির পরের গলিতে আলমদের পরিচিত ওই ভদ্রলোকের বাড়িতে অস্ত্র রেখে রুমী, কাজি, সেলিমকে মেইন রোডে নামিয়ে আলম, বদি আর স্বপন গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছে সুযোগমতো কোথাও গাড়িটা ফেলে রেখে বাড়ি চলে যাবে।

২৭ আগস্ট শুক্রবার ১৯৭১

খাওয়ার টেবিল ঘিরে সবাই বসেছে— বদি, আলম, কাজি, স্বপন, চুল্লু, রুমী, জামী, মাসুম। শুধু শরীফ নেই। তার আজ ডি সি জি আর-এ লাঞ্চের দাওয়াত। টেবিলের ওপর সাজানো পোলাও, কাবাব, চপ, রোস্ট, কোর্মা, পটল-ভাজি, সালাদ। রুমীর আবদারে আজ এই ভোজের আয়োজন। সবাই খেতে খেতে গত পরশুর কথাই আলোচনা করছে। গাড়িটা আলমরা ভূতের গলিতে একটা বাড়ির সামনের খোলা লনে পার্ক করে রেখে এসেছে। বৃষ্টি পড়ছিল বলে রাস্তায় লোক ছিল না, ফলে ওদের কেউ দেখেনি। রিকশাও ছিল না, বৃষ্টির মধ্যেই বেশ খানিকটা হেঁটে হাতিরপুল বাজার পর্যন্ত এসে তারপর রিকশা পায়।

কানে এল আলম রুমীকে বলছে, 'উঃ! খুব সময়ে তুই কাচ ভেঙে গুলি করেছিলি, নইলে কেউই বাঁচতাম না আমরা।'

রুমিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আর তুইও অমন চালাকি করে গ্রিন রোডের সিগনাল দিয়ে এলিফ্যান্ট রোডে না ছুটলে ওদের হাতে ঠিক ধরা পড়ে যেতাম। থ্যাংকস ফর টেকিং দ্য রাইট ডিসিশান অ্যাট দ্য রাইট মোমেন্ট।'

বদি হাসতে হাসতে বলল, 'চাচি, এই দুর্দান্ত সাহসী ছেলেদুটোকে খুব ভালো করে খাইয়ে দ্যান তো। ওদের জন্যই আজ আমরা জানে বেঁচে পালিয়ে আসতে পেরেছি।'

আমি বললাম, 'সাহসী তোমরা সবাই। তোমাদের রিফ্লেক্স নিখুঁত। অপূর্ব তোমাদের টিমওয়ার্ক। তোমরা সবাই দুর্দান্ত।'

কাজি আপশোস করে বলল, 'জুয়েলটার বড় মন খারাপ। সে আমাদের আজকের অ্যাকশনে থাকতে পারল না। আগে কতগুলো অ্যাকশনে সে ছিল। চল আলম, আজ ওরে দেখতে যাই।'

জুয়েল আছে আলমদের বাড়িতে, ওর বোনেদের হেফাজতে। খাওয়া শেষ হলেও গল্প শেষ হতে চায় না। দেওয়ালে ঝোলানো কোকিল ঘড়ির কোকিলটা তার ছোট্ট ঘরের দরজা খুলে মুখ বের করে চারবার কুকু কুকু করে ডাকল।

বাইরে পোর্চে গাড়ি থামার শব্দ পাওয়া গেল। গাড়ির দরজা খোলার শব্দের সঙ্গে তিন-চারজনের গলার স্বর। ওরা সবাই চকিত হয়ে একই সঙ্গে কথা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল এবং পায়ের আগার ওপর ভর দিয়ে নিঃশব্দে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

জামী গিয়ে দরজা খুলল। আমিও পিছু পিছু গেলাম বসার ঘরে। শরীফের সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন দাদাভাই, মোর্তুজা, ফকির। ঢুকেই মোর্তুজা চোখ বড় বড় করে বলে উঠলেন, 'শুনেছেন ভাবী কী কাণ্ড? পরশু সন্ধ্যারাতে ১৮ নম্বর রোডে বিচ্ছুরা এক সাংঘাতিক অ্যাকশন

করেছে। এক ব্রিগেডিয়ারের বাড়ির সামনে আট-দশটা এম পি কে মেরে দিয়ে চলে গিয়েছে। তারপর পাঁচ নম্বর রোডের মোড়ে আরেক সাংঘাতিক কাণ্ড। ঐ রাতেই আরেক দল বিচ্ছু একটা জিপে গুলি মেরে একেবারে উল্টে দিয়েছে। জিপে যারা ছিল, সবাই মারা গিয়েছে।'

আমাকেও চোখ বড় বড় করতে হল, 'বলেন কী? এইরকম বেপরোয়া কাণ্ড-কারখানা? ওদের সাহস আছে বলতে হয়! কী করে যে করে। কারাই বা করে? কোথায় থাকে বিচ্ছুগুলো? ধরা পড়েছে নাকি কেউ?'

'না ভাবী, কাউকেই ধরতে পারা যায়নি। ওরা কি মানুষ, না জ্বিন? চোখের সামনে দিয়ে নাকি উধাও? সারা শহরে একেবারে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে।'

ফকির খুব আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলল, 'সারা শহরে কী যে হচ্ছে আজকাল। যখন-তখন আসাদগেটে, মোহাম্মদপুরে, গুলিস্তান, নবাবপুরে সবখানে গাড়ি, বাস, চাকা ফেটে উল্টে যাচ্ছে। আজ সকালে দেখি কার্জন হলের কোণের চৌমাথায়— বাংলা অ্যাকাডেমির দিকের যে চৌমাথাটা— ওখানকার আয়ল্যান্ডটার পাশে এক ডবল-ডেকার উল্টে পড়ে আছে। বারো চোদ্দোজন বিহারি, রাজাকার, মিলিশিয়া ওটাকে তুলে সরাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

জামী আস্তে করে বলল, 'ডবল ওরিয়েন্টাল বাম।'

ফকির চমকে বলল, 'কী বললে বাবা?'

'কিছু না চাচা। মাথা ধরেছিল। ওরিয়েন্টাল বাম দিয়েছিলাম। ছাড়েনি, উল্টে মাথাধরা বেড়ে গিয়েছে।'

২৮ আগস্ট শনিবার ১৯৭১

২৫ আগস্ট রাতের অ্যাকশনের গল্প আর ফুরোচ্ছে না, মানে আমিই ফুরোতে দিচ্ছি না। এর আগে ঢাকায় যত অপারেশন, অ্যাকশন হয়েছে, সবগুলোর বিবরণ লোকমুখে শোনা। এই প্রথম আমি প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষকর্মীর মুখে জানতে পারছি অ্যাকশানের বিস্তারিত বিবরণ।

অন্যদিকে একটা অসুবিধেও হচ্ছে। আগের মতো বন্ধুবান্ধব ও পড়শিদের সঙ্গে শোনা কথায় অংশ নিতে পারছি না, মানে শুধু শুনেই যাচ্ছি, নিজের অনুমান কিছু যোগ করতে পারছি না। কী জানি যদি কেউ সন্দেহ করে বসে! তাই মোর্তুজা ভাইরা, বাঁকারা, ফকিররা যখন ২৫ রাতের অ্যাকশান সম্বন্ধে ডাল-পালা বিস্তারিত নানা কথা বলতে থাকেন, তখন শরীফ, জামী, আমি শুধু মাথা নেড়ে নেড়ে অবাক হই আর চুপ করে শুনি!

আজ হ্যারিস এসেছে দুপুরে খাওয়ার সময়। রুমীর অনেকদিনের বন্ধু। ঢাকা কলেজে পড়ার সময় থেকেই বন্ধুত্ব। একটা শখে দুজনের মিল আছে— তবলা বাজানোতে। হ্যারিসের বাবা হাসিব সাহেবও ইঞ্জিনিয়ার, শরীফের কয়েক বছরের সিনিয়র।

২৫ তারিখ সন্ধ্যায় হ্যারিসদের অ্যাকশানের কী হয়েছিল, আজ তা শুনলাম ওর মুখে।

সেই সন্ধ্যায় হ্যারিসরা তাদের হাইজ্যাক করা ফিয়াট ৬০০তে ছয়জন ছেলে গাদাগাদি করে বসে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের চারপাশের রাস্তা দিয়ে কয়েকবার চক্কর দেয়। কিন্তু আলমদের গাড়ির কোনও পাত্তা দেখতে পায় না। তারা তো আর জানে না, আলমরা কী ঘাপলার মধ্যে পড়েছে। খানিক পরে গাড়ির ইঞ্জিন গরম হয়ে গিয়েছে, পানি দিতে হবে, কোথায় পানি পাওয়া যায়— এই চিন্তাভাবনা করতে করতে ওরা শাজাহানপুর বাজারের কাছে মুক্তারের চেনা একটা পানের দোকানে গিয়ে পানি চাইল। ছেলেগুলো গাদাগাদি করে বসেছিল, নিজেরাও গাড়ি থেকে নামল একটু হাত-পা ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য। স্টেন হাতে ওদের নামতে দেখে মুহূর্তে বাজারের লোকজন খালি। ওরা গাড়িতে পানি ভরে আবার রাজারবাগ পুলিশ লাইনের চারপাশের রাস্তা ধরে কয়েকটা চক্কর দিল। শেষে আলমদের না পেয়ে হতাশ হয়ে নিজেরাই কিছু একটা করবে বলে কাকরাইলের দিকে রওনা দেয়। কাকরাইলের মোড়ে কয়েকজন বাঙালি পুলিশ 'হল্ট' বলে ওদের থামায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হ্যারিসরা 'বাঙালি পুলিশ মারব না' বলে সিদ্ধান্ত নেয়, একই সঙ্গে বাঙালি পুলিশরাও 'ওরে বাবা! মুক্তিবাহিনী' বলে ওদের দিক থেকে চোখ উঠিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। হ্যারিস দ্রুত গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্ট রোডে দারুল কাবাবের দিকে যায়। দারুল কাবাবে মাঝে মাঝে পাঞ্জাবি আর্মি অফিসাররা টিক্কা তন্দুরী কাবাব এসব খেতে আসে। ওরা গিয়ে একটা আর্মি জিপ দাঁড়ানো দেখে। জিয়া বলে, গাড়িটা ইউটার্ন দিয়ে ঘুরিয়ে আনো। তাহলে জিপটা মেরে মগবাজারের দিকে পালিয়ে যেতে সুবিধে হবে। হ্যারিসদের লাক খারাপ, ওরা ইউটার্ন করে ঘুরে দারুল কাবাবের সামনে এসে দেখে জিপ উধাও!

কথার মাঝখানে রুমী হাসতে হাসতে বলল, 'শুধু স্কিল হলেই হয় না, লাকও লাগে। লাক ফেভার না করলে হাজার স্কিলও ভণ্ডুল।'

হ্যারিস বলল, 'তা ঠিক। কাউকে মারতে পারলাম না বটে কিন্তু লাক খুব খারাপ ছিল না। তাইতো দুই নম্বর রোডে ফেরার সময় মিলিটারি চেকপোস্টে ধরা পড়িনি।'

হ্যারিসরা দারুল কাবাব থেকে পিজি হাসপাতালের মোড় হয়ে এলিফ্যান্ট রোড দিয়ে দুই নম্বর রোডে ঢোকার আগের ট্রাফিক পোস্টটার কাছে আসে। বাঁদিকে দুই নম্বর রোডের মুখে একটা জিপ নজরে পড়ে। হ্যারিস বলে 'লেটস অ্যাটাক দ্যাট জিপ।' সঙ্গে সঙ্গে জিয়া বলে ওঠে, 'থাম থাম। জিপটার পিছনে লাইট নেভানো কয়েকটা ট্রাক দেখা যায় যেন।' তখন ওরা ঠাহর করে দেখে জিপটার পিছনে লাইট নেভানো বেশ কয়টা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। আরও খেয়াল হয় সোজা সামনে মিরপুর রোডেও যেন অনেক গাড়ি, লোকজন। ওরা তখনও বোঝেনি যে মাত্র বিশ পনেরো মিনিট আগেই ওইখানে আলমরা অ্যাকশন করে গিয়েছে। ওরা বাঁয়ে ঘুরে দুই নম্বর রোড দিয়ে সাতমসজিদ রোড পেরিয়ে ২৮ নম্বরে য়ায়।

আলমরা কথামতো রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যায়নি বলে হ্যারিসরা প্রথমে রাগ করেছিল, কিন্তু পরদিন দুপুরে যখন জানতে পারে যে কীরকম সাক্ষাৎমৃত্যুর ছোবল থেকে ওরা বেঁচে এসেছে, তখন আর রাগ থাকে না। এরকম দুঃসাহসিক অ্যাকশানের জন্য সবাই আলমদের ধন্য ধন্য করতে থাকে।

হ্যারিস বলল, 'চাচি, রুমী তো হিরো হয়ে গিয়েছে। ও যেভাবে গাড়ির পিছনের কাচ ভেঙে গুলি করেছে, সেরকম কাহিনি আমরা এতদিন কমিক বইতে পড়েছি, বিদেশি সিনেমায় দেখেছি। আমারই বন্ধু এরকম একটা কাজ করেছে ভেবে আমারও খুব গর্ব হচ্ছে।'

চেয়ে দেখলাম, রুমীর মুখ গর্বে, লজ্জায়, খুশিতে লাল হয়ে উঠেছে। কদিন থেকে বন্ধুদের মুখেও এইসব কথাই শুনছে। আমি বললাম, এরকম কোনও একটা অ্যাকশানে কোনও একজনকে কিন্তু হিরো বলা যায় না। আসল হিরো হচ্ছে পুরো টিমটাই। প্রত্যেকটি সদস্যের নির্ভুল রিফ্লেক্স আর পারফেক্ট সেন্স অব টাইমিং থাকলে যে নিখুঁত টিমওয়ার্ক হয় তার ফলেই অ্যাকশানে সাফল্য আসে।

হ্যারিস বলল, 'চাচি গতকাল আমি তূর্যদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। রুমীরা যে বাড়ির সামনে খানসেনা মেরেছে, তার উল্টোদিকের বাসায় তূর্যের বাবা-মা থাকে। তূর্য তো ইন্ডিয়ায় চলে গিয়েছে। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলে রয়েছে। তূর্যকে চেনেন কি? ওই যে খুব ভালো ফুটবল খেলে। সালাউদ্দিন ভালো নাম। আমার বন্ধু।'

'চিনি। শুধু তূর্য নয়, তূর্যের মা সিমকিকেও চিনি একেবারে ছোটবেলা থেকে। তূর্যের এক চাচা শুকুর সাহেব রুমীর আব্বার বন্ধু।'

'রুমীরা আসলে কতগুলো মারতে পেরেছে, সেটা জানবার জন্যই ওখানে গেলাম। কিন্তু মুখে বললাম, 'কেমন আছেন খালাম্মা? আপনাদের খোঁজ নেওয়ার জন্য এলাম।' তূর্যের মা বললেন, 'আর বোলো না বাবা,

দু'দিন আগে সন্ধ্যার মুখে একটা গাড়িতে মুক্তিবাহিনী এসে সামনের বাসার সবকটা গার্ডকে মেরে দিয়ে গিয়েছে।' তূর্যের মা সেই সময় সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাড়ি থেকে গুলির শব্দ হতেই উনি তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে চুপিচুপি দোতলায় উঠে একটা জানালার ফাঁক দিয়ে সব দেখেন। বাড়ির সামনে যতগুলো গার্ড ছিল, সবক'টা মরেছে।'

বিকেল হতেই হ্যারিস চলে গেল। রুমী রেকর্ড প্লেয়ারে জিম রিভসের একটা রেকর্ড চড়িয়ে চৌকিতে আমার পাশে এসে বসল। আমি বললাম, 'তুই দেখছি এবার জিম রিভস বেশি শুনছিস!'

রুমীর স্বভাবটা বরাবরই এরকম। যে শিল্পীর গান ওর ভালো লাগে, পারলে তার সবগুলো রেকর্ড কিনে ফেলে। এবং একেক সময় একেক শিল্পী ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে ওঠে। এভাবেই গত কয়েক বছরে আমাদের বাড়িতে জমে উঠেছে শচীন দেব বর্মনের, ফিরোজা বেগমের, টম জোনসের, জিম রিভসের যতগুলো রেকর্ড ঢাকায় পাওয়া যায়— সবগুলো। বইয়ের ব্যাপারেও তাই।

রুমী বলল, 'এই রেকর্ডটা আজ চুল্লু ভাইয়ের বাসা থেকে নিয়ে এসেছি। কালই ফেরত দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'আজ চুল্লু, আলম, ওরা কেউ আসেনি।'

'আলম ঢাকায় নেই। আজ ভোরে শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে মেলাঘরে গিয়েছে।'

'হঠাৎ?'

'ওরা গেল ঢাকায় কিছু ভারী অস্ত্র আনা যায় কিনা, তার খোঁজখবর করতে। তাছাড়া এখানে এখন প্রচুর টাইম-পেনসিল আর পি কে দরকার। সেগুলোও আনবে ওরা।'

'ভারী অস্ত্রটা কী?'

'এল এম জি। ঢাকার গেরিলাদের এখনও পর্যন্ত হালকা অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে— স্টেন, এস এম জি গ্রেনেড, বিস্ফোরক— এইসব। এল এম জি ভারীও বটে, দামিও বটে। একটা ধরা পড়লে বহুত লস। তবে ঢাকায় এখন যেরকম উন্নত ধরনের গেরিলা অ্যাকশান হচ্ছে, তাতে আমাদের খুব বিশ্বাস ভারী অস্ত্র এলে আরও বড় বড় টার্গেট হিট করতে পারব। তাই ঢাকার গেরিলাদের ইচ্ছে কয়েকটা এল এম জি আসুক। আলম, শাহাদত ভাই, খালেদ মোশাররফ, হায়দার ভাইয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য গিয়েছে। জানো আম্মা, যদি এল এম জি আসে ঢাকায়, তাহলে প্ল্যান আছে ছয় সেপ্টেম্বর ঢাকায় একটা বড় ধরনের অ্যাকশান করা হবে।'

'কেন, ছয় সেপ্টেম্বর কী জন্য?'

'পাকিস্তান সরকার ওইদিন প্রতিরক্ষা দিবস পালন করার আয়োজন করছে। সব যদি ঠিকঠাকমতো চলে, তাহলে ওইদিন ঢাকার সমস্ত গেরিলা কয়েকটা গ্রুপে ভাগ হয়ে একই সময়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটা পয়েন্ট হিট করতে পারে— রাজারবাগ পুলিশ লাইনের প্যারেড গ্রাউন্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠ।

'পাকিস্তান সরকার ওইদিন প্রতিরক্ষা দিবস পালন করার আয়োজন করছে। সব যদি ঠিকঠাকমতো চলে, তাহলে ওইদিন ঢাকার সমস্ত গেরিলা কয়েকটা গ্রুপে ভাগ হয়ে একই সময়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটা পয়েন্ট হিট করতে পারে— রাজারবাগ পুলিশ লাইনের প্যারেড গ্রাউন্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠ।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠ কেন?'

'ওখানে যে প্রতিরক্ষা দিবসের জন্য খুব প্যারেড, পিটির প্র্যাক্টিস করানো হচ্ছে, তাই। জানো আম্মা, ঢাকায় এখন নয়টা গেরিলা গ্রুপ রয়েছে। ছয় তারিখের প্ল্যানটা যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে আরও অনেক গেরিলা এর মধ্যে ঢাকা চলে আসবে।'

'আর তোদের সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের প্ল্যানটা?'

'ওটাও আছে। ওটার জন্যও পি কে আনবে ওরা।'

জিম রিভসের গলা থেমে গেল। রুমী উঠে রেকর্ডের পিঠ পাল্টে দিয়ে এসে আবার বসল, 'আচ্ছা আম্মা, তোমরা ঢাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পার না?'

আমি চমকে বললাম, 'কেনরে?'

'তোমরা ঢাকায় না থাকলে আমার পক্ষে অ্যাকশান করতে আরও সুবিধে হত।'

'কোথায় যাব? আর যাওয়ার জায়গা যদিবা পাই, খুঁজলে হয়তো পেয়েও যাব, তাহলেও তোর দাদাকে নিয়ে যাবই বা কী করে?'

'দাদাকে কিছুদিন ফুপুর বাড়িতে রেখে দিলে হয় না?'

'তাহলে তো আরও তুলকালাম লেগে যাবে। তোর দাদা তাহলে আসল ব্যাপার সব বুঝে যাবে, তখন আপসেট হয়ে তার ব্লাড প্রেসার ভীষণ বেড়ে যাবে। স্ট্রোক হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। না রুমী, তা হয় না।'

রুমী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। জিম রিভস বেজে বেজে একসময় থামল। রুমী উঠে আরেকটা রেকর্ড লাগাল, বলল, আম্মা গানটা শোনো মন দিয়ে।'—

টম জোনসের 'গ্রিন গ্রিন গ্রাস' গানটা বেজে উঠল। বহুবার শোনা এ গান। রুমী এটা প্রায়ই বাজায়। শুনতে শুনতে সুরটা আমারও প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, যদিও ইংরিজি গানের কথা বিশেষ বুঝি না। তিন মিনিটের গানটা শেষ হলে রুমী আস্তে আস্তে বলল, 'গানটার কথাগুলো শুনবে? এক ফাঁসির আসামি তার সেলের ভেতর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল সে তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়েছে। সে ট্রেন থেকে নেমেই দেখে তার বাবা-মা আর প্রেয়সী মেরী তাকে নিতে এসেছে। সে দেখল তার আজন্মের পুরনো বাড়ি সেই একইরকম রয়ে গিয়েছে। তার চারপাশ দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে সবুজ সবুজ ঘাস। তার এত ভালো লাগল তার মা-বাবাকে দেখে, তার প্রেয়সী মেরীকে দেখে। তার ভালো লাগল গ্রামের সবুজ সবুজ ঘাসে হাত রাখতে। তারপর হঠাৎ সে চমকে দেখে সে ধূসর পাথরের তৈরি চার দেওয়ালের ভেতরে শুয়ে আছে। সে বুঝতে পারে সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল।—'

আমি বলে উঠলাম, 'চুপ কর রুমী, চুপ কর।' আমার চোখে পানি টলমল করে এল। হাত বাড়িয়ে রুমীর মাথাটা বুকে টেনে বললাম, 'রুমী। রুমী। এত কম বয়স তোর, পৃথিবীর কিছুই তো দেখলি না। জীবনের কিছুই তো জানলি না।

রুমী মুখ তুলে কী একরকম যেন হাসি হাসল, মনে হল অনেক বেদনা সেই হাসিতে। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শন একটা কথা আছে না আম্মা? হয়তো জীবনের পুরোটা তোমাদের মতো জানি না, ভোগও করিনি, কিন্তু জীবনের যত রস-মাধুর্য-তিক্ততা-বিষ-সবকিছুর স্বাদ আমি এর মধ্যেই পেয়েছি আম্মা। যদি চলেও যাই, কোনও আক্ষেপ নিয়ে যাব না।'

ক্রমশ

“জীবনে প্রথম চড়া সোনালি রঙের মার্সিডিজ। জীবনে প্রথম পাড়ি ইউরোপের মায়াবী শহর প্যারিস থেকে শান্তি-স্বর্গের দেশ সুইজারল্যান্ডে। গাড়ি চালাচ্ছেন ছ-ফুটের অধিক দীর্ঘ সুঠাম প্রৌঢ়, প্রতিষ্ঠিত, কৃতী, ধনী, বিজ্ঞানী এবং তিনি জার্মান। আমি তাঁর পাশে অতিথি সওয়ারি। গাড়ি চলেছে অতি দ্রুত। চারদিকে ধূসর শীতল আবহাওয়া, টুকরো টুকরো রুপোর মতো ঝরছে তুষার চারদিকে। আমি উষ্ণ, নিয়ন্ত্রিত তাপে। তখন আমি সুখী কী দুখি কিছুই জানি না! অজানা ভয়ে শত কৌতূহলেও নিশ্চুপ হয়ে আছি। অসংখ্য বনানী প্রায় পল্লবহীন। কখনও-কখনও ছিটকে আসে মেপলপাতা গাড়ির কাচে।... হাজার হাজার ফুট উঁচু থেকে বিমানের জানালা দিয়ে যে ধূসর স্বর্গীয় পথ দেখা যায়, চারপাশের আবহ যেন ঠিক তেমনই। মাঝে মাঝে শীতের প্রাক-সন্ধ্যায় বরফের ফুলঝুরি। মেঘধূসর দেশ চিরে এগিয়ে চলেছি ভূস্বর্গের পথে। ”

আমার ছবি জীবন

শুভাপ্রসন্ন

৯

এই সময় একটি ফরাসি মেয়ে কলকাতা, শান্তিনিকেতন ঘুরে বেড়াত। বিনয় ঘোষ আর আউবাউলদের মধ্যে সে খুব পরিচিত ছিল। গবেষণার কাজে মাসের পর মাস কাটাচ্ছিল এই বাংলায়। সেভাবেই আমার সঙ্গে তার পরিচয়। ঠিক ওই সময়ে ও খুব ঘন ঘন আমার স্টুডিওর ছোট্ট ঘরে আসত। সহজ পরিচয় হওয়ার আরও একটা কারণ, ফরাসি, ইংরিজি ছাড়াও ভালো বাংলা শিখে ফেলেছিল। ফলে সহজেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ওর নাম রোজিতা ডেশলভা। উচ্ছল, প্রাণবন্ত আর পরিশ্রমী। যে-কোনও জায়গায় যে-কোনও স্তরে দ্বিধাহীনভাবে পৌঁছে যেত। ভালোবেসেছিল ওর গবেষণার কাজকে আর মাটির বাংলাকে। একদিন সকালে কোনও কাজে আমার স্টুডিওতে এলে ওকে সেই চিঠিটা হাতে দিই। চিঠিটা পড়ে ওর যে কী উত্তেজনা! ও ফরাসি ভঙ্গিমায় ইঙ্গবঙ্গ উচ্চারণে আমাকে বলে লুক শুভা, দে আর জার্মান। দে আর ভেরি সিরিয়াস পিপ্‌ল, ওঁরা কোনও হালকা কথা বলেন না। ওটা তুমি খুব ভালো খবর পেয়েছ। তুমি চেষ্টা করো ওঁর কাছে যাওয়ার, তোমার ভালো হবে।

কেন জানি না, রোজিতার কথা বিদ্যুতের মতো আমাকে জাগিয়ে দিল। আমার মনে স্বপ্ন তৈরি হতে লাগল। পরদিন সাতসকালে মৃণালদার কাছে পৌঁছে গেলাম। মৃণালদা

সাধারণত খুব ভোরে উঠতেন।

ভোর ছটার মধ্যে উনি তৈরি হয়ে যেতেন, আর ওটাই ওঁর সবচেয়ে ভালো সময়। আমি সবিস্তারে জানাই, উনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পরামর্শ দেন, এবং এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থাও করে দেন। তিনি সন্ধ্যা মজুমদার। ম্যাকিনান ম্যাকেঞ্জির ট্র্যাভেল এজেন্সির দায়িত্বে। ছ-হাজার টাকার বিনিময়ে এয়ার ইন্ডিয়ার ডাবল চার্টার বিমানের ব্যবস্থা করে দেন যাতায়াতের জন্য। আমি টাকা জোগাড় করে ফেলি। আর বিশেষ সুবিধা হল এই যে, কলকাতা থেকে মুম্বই হয়ে প্যারিস। সেই প্যারিস পর্যন্ত যাত্রার সঙ্গিনী পেলাম রোজিতাকে। ইতিমধ্যে ডঃ কার্টেলকে আমার ইচ্ছা এবং যাওয়ার দিন জানিয়েছি। উনি আমাকে সঙ্গে কী কী আনতে হবে জানিয়ে দেন। তেলরঙে আঁকা ছবিগুলো ক্যানভাস থেকে খুলে নিয়ে রোল করে তার সমস্ত কাঠগুলো বেঁধে প্যাক করে কার্গোতে পাঠিয়ে দিই, জেনিভার উদ্দেশে আগেই। পরে রোজিতার সঙ্গে পৌঁছে যাই ছবির রোল হাতে, প্যারিসে। কলকাতার অলিতে-গলিতে ঘোরা একজন রোগা স্বপ্নচারী সদ্য যুবকের কাছে উড়োজাহাজ থেকে নেমে প্যারিস দেখা সে বড় বিস্ময়ের। তার স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ কিছুটা হালকা হলেও এখনও ভেসে আসে বিস্ময়ের মতো। রোজিতার মা-র সূত্রে ওরা বনেদি ফরাসি ও ধনী। পাঁচ বোন, দুভাই। রোজিতার পরের বোন মা-র সম্পত্তির ভাগে পেয়েছে প্যারিসের প্রায় কেন্দ্রবিন্দুতে একটি গোটা বাড়ি। সেই বোনের নাম অলিভিয়া। অসাধারণ পাপেট শিল্পী। দরজা খুলে ঢুকলেই বিশাল স্টুডিও। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে নানান মুখোশ, পাপেট আর কত রকমের সরঞ্জাম। এসব জায়গায় ঢুকলে হাত নিশপিশ করে, মনে হয় এ জায়গা যদি আমার হত! অলিভিয়াকে দেখলে মনে হত না ও এত বড় শিল্পী ও কারিগর। অসম্ভব সব পাপেট সৃষ্টি করে চলেছে।

ওদের গোষ্ঠীতে ছজন পুরুষ, একজন নারী। নারী বলতে অলিভিয়া। বাকিরা কেউ কবি, কেউ মিউজিশিয়ান, গায়ক আর পরিচালক। এই মিলিত দল মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়ে গোটা ফ্রান্সের ছোট শহরে, গ্রামে। কোনও জায়গা ঠিক করে সেখানে তাঁবু খাটিয়ে নেয়। সেই তাঁবুর ভিতরে প্রায় একশোজন বসতে পারে। পাপেট শো হয় সেই তাঁবুর ভেতরেই। এইভাবে চলে ওদের জীবন। একটা রংবেরঙের বড় ভ্যানগাড়ি চড়ে বেদুইনের মতো ঘুরে বেড়ায় তারা। অলিভিয়া সুন্দরী, স্বল্পবাক। তাকে ঘিরেই মূলত ওর পুরুষবন্ধুরা।

আমি দুদিন ছিলাম সেখানে। স্টুডিওর ওপরে মাঝখান থেকে কাঠের সিঁড়ি চলে গিয়েছে দোতলায়। বারান্দা থেকে ঘুরে গিয়ে একটা জায়গা-সেখানে বিছানা, আলমারি, স্তূপীকৃত বই। খোলা কোনও জায়গা নেই। একপাশে একটি বাথরুম। সেবার প্যারিসের আর কোথাও যাইনি। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা চলে এসেছি রোজিতার বোনের বাড়ি। রোজিতারা ভেতরের কোনও একটা ঘরে থাকে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অলিভিয়াকে ঘিরে থাকে সবাই। কেউ বাঁশি বাজায়, কেউ অনর্গল গান গায়।

> ক্বচিৎ-কদাচিৎ আপেলের টুকরোর স্বাদ পেয়েছি স্বগৃহে মায়ের পরিবেশনে। এখানে অজস্র আপেল ঝরে পড়ে রয়েছে। ফলবান গাছ ভরে রয়েছে আপেল, পিয়ার্সে। অজস্র বিদেশি রঙিন ফুলে ঢেকে আছে চারদিক। একটু দূরেই প্রবাহিত বিশাল জলরেখা। রুপোলি হারের মতো। আকাশের নীল ও আমার জলছবির নীলের সঙ্গে অনেক তফাত। আমার আকাশে আশমানি, ফিরোজা নেই। এখানে সুখী মেঘেরা ঘুরে বেড়ায়।

আমি পৌঁছেই ফোন করি ডঃ কার্টেলকে। পরদিন ঠিক হয় উনি আমায় নিতে আসবেন অপরাহ্নে। তখন শীত। বাইরে ঝুরঝুরে বরফ। আর আমার মনে অজানা বিস্ময়। বিদেশি হাওয়া, আলো। ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনে অহেতুক কাঁপুনি আসে। পরদিন যথাসময়ে ডঃ কার্টেল আসেন বিশাল মার্সিডিজ গাড়ি নিয়ে। আমার সমস্ত বাক্স-প্যাঁটরা, ছবি নিজেই তুলে নেন। গাড়িতে, কিছু জিনিস গাড়ির ছাদে। মোটা প্লাস্টিকে ঢেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয় তা। আমি রোজিতা, অলিভিয়াদের বিদায় জানিয়ে অন্য পৃথিবীর সওয়ারি হয়ে অতি দ্রুতগতির গাড়িতে এগিয়ে যাই জেনিভার উদ্দেশে।

জীবনে প্রথম চড়া সোনালি রঙের মার্সিডিজ। জীবনে প্রথম পাড়ি ইউরোপের মায়াবী শহর প্যারিস থেকে শান্তি-স্বর্গের দেশ সুইজারল্যান্ডে। গাড়ি চালাচ্ছেন ছ-ফুটের অধিক দীর্ঘ সুঠাম প্রৌঢ়, প্রতিষ্ঠিত, কৃতী, ধনী, বিজ্ঞানী এবং তিনি জার্মান। আমি তাঁর পাশে অতিথি সওয়ারি। গাড়ি চলেছে অতি দ্রুত। চারদিকে ধূসর শীতল আবহাওয়া, টুকরো টুকরো রুপোর মতো ঝরছে তুষার চারদিকে। আমি উষ্ণ, নিয়ন্ত্রিত তাপে। তখন আমি সুখী কী দুখি কিছুই জানি না! অজানা ভয়ে শত কৌতূহলেও নিশ্চুপ হয়ে আছি। অসংখ্য বনানী প্রায় পল্লবহীন। কখনও-কখনও ছিটকে আসে মেপলপাতা গাড়ির কাচে। স্বপ্নের মতো যেন উড়ে যাই স্বর্গের পথে। চেনা নয়, জানা নয়, তাই সুখের শিহরনেও ভয় আসে মনে। অন্য কোনও যানকেই উনি আগে দেখতে চান না। আমি তাঁকে তো সেভাবে চিনি না। সেই কলেজ রো-র স্টুডিওতে দেখা। তখন আমার খুব অসহায় অবস্থা। জলমগ্ন শহর কলকাতার শীর্ণ গলিতে হঠাৎ ঝলসে-ওঠা বিদ্যুতের মতো ওঁদের দুজনকে দেখি। আমার ছোট্ট ছ-ফুটের ছাদের তলায় ওনারা ঢুকতে পারেননি। বসিয়েছিলাম দরজার পাশে ছোট্ট চাতালে। সেখান থেকে আমি তাঁকে ছবি দেখাই। পছন্দ হয়। সাকুল্যে ছিলেন দশ কী পনেরো মিনিট। পরের দেখা গ্র্যান্ড হোটেলে। সে মহল আলাদা। তা সুইজারল্যান্ডও হতে পারে, প্যারিস কিংবা নিউ ইয়র্ক। প্রতিষ্ঠিত পাঁচতারা হোটেলের অন্দরের হাওয়া-বাতাস, গন্ধ-বর্ণের খুব বেশি তফাত হয় না। কিছুক্ষণ আমার স্টুডিওর সাক্ষাতের চেয়ে ওই প্রেক্ষাপটে তাঁকে দেখা অন্য এক অভিজ্ঞতা। গ্র্যান্ড হোটেলেও দশ-বারো মিনিট। দক্ষিণার কাগজ নিয়ে সোজা বাড়ি। তারপর চিঠিচাপাটি। আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আমি তার পাশে আজ উড়ে চলেছি আকাশপথের মতো। হাজার হাজার ফুট উঁচু থেকে বিমানের জানালা দিয়ে যে ধূসর স্বর্গীয় পথ দেখা যায়, চারপাশের আবহ যেন ঠিক তেমনই। মাঝে মাঝে শীতের প্রাক-সন্ধ্যায় বরফের ফুলঝুরি। মেঘধূসর দেশ চিরে এগিয়ে চলেছি ভূস্বর্গের পথে।

কলকাতায় হঠাৎ-দেখা বিদ্যুৎঝলক আজ বাস্তবে শিহরনের মতো। জেনিভায় যখন পৌঁছই তখন রাত হয়েছে। গাড়ির গতি, অপরিচিত সংস্কৃতির ধক আর অস্পষ্ট ভবিষ্যতের আশঙ্কায় আমার অসুস্থবোধ হচ্ছিল। বিশাল ফটক পেরিয়ে ঢুকে যায় গাড়ি। চারদিকে আপেলের গাছ। অজস্র আপেল ছড়িয়ে আছে। গাড়ির আলোতে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ততক্ষণে স্বাদ-বর্ণ-রূপ গ্রহণের ক্ষমতা আমার স্তিমিত হয়ে এসেছে। অবশেষে গাড়ি বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছয়।

গ্যালারির মাঝে মাঝে একটি ছোট টেবিলের ওপরে রাখা আছে কাঠের পিপে। তাতে ছোট কল দেওয়া, মাটিতে রাখা একটি ট্রে, তাতে দশ-বারোটি করে কাচের সুরাপাত্র। দর্শকেরা স্বাধীনভাবে কল খুলে ভরিয়ে নিচ্ছেন গাঢ় লাল রঙের ওয়াইন। একটা টেবিলে রাখা নানা ধরণের চিজ। সকলের হাতে-হাতে ঘুরছে তা।... কার্টেল জার্মানি ভাষায় আমার পরিচয় দিলেন দর্শকদের। বিন্দুমাত্র সে ভাষা না বুঝলেও বুঝলাম তিনি আমায় কীভাবে আবিষ্কার করেছেন আর সেই আবিষ্কারের ফলস্বরূপ আমি যে আজ এখানে এসেছি এবং প্রদর্শনী করছি, এটাই ছিল আলোচ্য বিষয়।

বেল বাজাতেই মিসেস জলি কার্টেল আর তার তিন ছেলেমেয়ে বেরিয়ে আসে। অনর্গল বাবার সঙ্গে জার্মান ভাষায় কৌতূহলী প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। আমি যেন অন্য গ্রহের জন্তু। আমাকে কেন ওদের বাবা এখানে এনেছে, আমি কোনও উপদ্রব করব কিনা? ও কোথায় থাকবে, কোথায় শোবে? ও কেন ছবি আঁকে? আর ওর দাড়ি, চুল এত কালো কেন? আর এসব অসংখ্য প্রশ্ন-উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর জোগান দিতে হয়। আর উত্তর না পেলে চ্যাঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। ছোট ছেলেটির নাম অ্যালেক্স। বয়স ছয়। ভয়ংকর দুষ্টু ও আদুরে। জলি আজ এমুহূর্তে অন্য পোশাকে। ওখানে কোনও সহকারী নেই। সব কাজ সবাই করেন। ছবি-প্যাঁটরা বার করে নিই। ডঃ কার্টেল আমায় নিয়ে যান দোতলার এককোণে আমার জন্য রাখা নির্দিষ্ট একটি ঘরে। ঘরটি ছোট, সম্পূর্ণ কাঠে মোড়া। এককোণে খাটবিছানা ঝকঝকে, নতুন। জলি আমায় দেখিয়ে দেয়, খাটটার একদিকের অংশে একটু চাপ দিয়ে তুললে সেটি উঠে যায়, উঠে গিয়ে আলমারি হয়ে যায়। সেই আলমারিতে জামাকাপড় টাঙাবার ব্যবস্থা আছে। অনুরূপভাবে অন্য একটি অংশ হাত ধরে একটু চাপ দিলে নেমে আসে, খাট হয়ে যায়। এত নিখুঁত কলকবজা, তাই মনেই হয় না উঠিয়ে দিলে অদৃশ্য খাট ওয়ার্ডরোব-এ পরিণত হয়। সকলেই আমরা অল্পস্বল্প খেয়ে ওদের বিদায় জানিয়ে আমার ঘরে উঠে পড়ি।

সারাদিনের ক্লান্তি, ভয়, অজানা আশঙ্কা ছাপিয়ে ভোর হয় এক নতুন দিনে। উষ্ণ তাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে আমি। বড় বড় জানালা, স্বচ্ছ কাচে অন্য পৃথিবীর ছবি দেখি। আমি কোথা থেকে কোথায় এসেছি, কোথায় সেই কলেজ রো, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, আমার ছোট, স্টুডিও, চেনা বাথরুম, চেনা পয়ঃপ্রণালীর কলতান। সেই যেন আমি স্বর্গারোহণ করেছি। যেন স্বেচ্ছায় নীল বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে আন্দামান দ্বীপের সেলুলার জেলের এক কামরায়। এই বন্দিদশায় কত মানুষ কত সৃষ্টিশীল লেখা লিখেছেন। আমি তো লিখি না। কিন্তু ছবি আঁকতে কি পারব এই পরিবেশে! আমি যেন অন্যগ্রহে। ক্বচিৎ-কদাচিৎ আপেলের টুকরোর স্বাদ পেয়েছি স্বগৃহে মায়ের পরিবেশনে। এখানে অজস্র আপেল ঝরে পড়ে রয়েছে। ফলবান গাছ ভরে রয়েছে আপেল, পিয়ার্সে। অজস্র বিদেশি রঙিন ফুলে ঢেকে আছে চারদিক। একটু দূরেই প্রবাহিত বিশাল জলরেখা। রুপোলি হারের মতো। আকাশের নীল ও আমার জলছবির নীলের সঙ্গে অনেক তফাত। আমার আকাশে আশমানি, ফিরোজা নেই। এখানে সুখী মেঘেরা ঘুরে বেড়ায়। রোদও যেন বড় উজ্জ্বল। কুচি বরফের ঝড় চলে আসে। আবার সেই সোনালি রোদ উছলে ওঠে উচ্ছলতায়। ঘরের ভেতরে জানালা দিয়ে উপভোগ করি। উপভোগ শব্দটা কি ঠিক হল?

ডঃ রুডি কার্টেল অত্যন্ত পরিশ্রমী। সবকিছু নিজের হাতে করেন। ঘুমের পর থেকে তিনি দমদেওয়া মেশিনের মতো।

বিগত যুগের জার্মান যারা, যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে যাঁরা কাটিয়েছেন তারুণ্যে, যৌবনে— উনি সেই জার্মানির প্রতিনিধি। তখনও জানি না, কোথায়-কীভাবে-কখন আমার প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে এ শহরতলিতে! মূল শহর থেকে মাইলের পর মাইল পেরিয়ে দুধারে অসংখ্য উর্বর দ্রাক্ষাখেত, টান টান সুতোয় মাপা নিখুঁত সারিতে শুধুই দ্রাক্ষা। কিছু কিছু জায়গায় স্ট্রবেরির চাষ। দূরে কখনও-কখনও চোখে পড়ে একটি বাড়ি অতি সাজানো, আর গাছগাছালি। কে কোথায় আছে? কে কাকে চেনে! এখানে আমার ছবি কে দেখবে? কী আকর্ষণে মানুষ আসবেন? ওঁরা অনর্গল জার্মান ভাষায় কথা বলে যান। ক্বচিৎ-কদাচিৎ আমার সঙ্গে ইংরিজিতে কথাবার্তা হয়। আমি শুনি, বুঝি, ইচ্ছা বা মতামত প্রকাশের জন্য যত শব্দ ব্যবহার করা যায় সেই বিদেশি উচ্চারণের সাহস-অভ্যাস আমার ছিল না। তাই উত্তর হয় কম শব্দে। কিন্তু উনি বুঝেছেন আমাকে, সেজন্য আমার কোনও কথোপকথনে অসুবিধা হয় না।

সকালে আমাকে বাড়ির তলায় সেলারে নিয়ে গেলেন। নীচে দোতলা, বিশাল এলাকা। কোনও ঘরে থরে থরে সাজানো ওয়াইনের বোতল। উল্লম্বভাবে নয়, মধুর চাকের মতো ফায়ারব্রিকসে গোল গোল ছিদ্রে শোয়ানো বোতলগুলি, সমস্ত ঘরজুড়ে। তারপরে অফিসের সরঞ্জাম। একদিকে একটা সদ্য রং-করা সাজানো ঝকঝকে আলোয়-মোড়া প্রায় দুহাজার স্কোয়্যার ফুটের একটি কামরা। এটাই ডঃ কার্টেলের বিলাসবহুল বাগান-প্রাসাদে ভালোবাসার অন্যতম সংযোজন, আর্ট গ্যালারি। আমার ছবি দিয়ে উদ্বোধন হবে। সেদিন সন্ধ্যায় কিছু মানুষ এলেন। রুডি তাঁদের ডেকেছেন। আলোচনার বিষয় আমার প্রদর্শনী, জলি তাঁদের আপ্যায়িত করলেন লাল-সাদা দ্রাক্ষারসে। রাতের আহারের জন্য রান্নাঘরে ব্যস্ত থেকেও মাঝে মাঝে মিটিংয়ে অংশ নিচ্ছিলেন। গোটা আলোচনা ফরাসি আর জার্মান ভাষা সংস্কৃতিতে মুখরিত ছিল।

কোনও ইংরিজি শব্দ কারও উচ্চারণ ছিল না। ও, হ্যাঁ, প্রথমেই রুডি বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, শুভা দ্য আর্টিস্ট ফ্রম কলকাতা, ইন্ডিয়া। সকলেই করমর্দন করলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। একজন আদ্যোপান্ত ফরাসি, একটু ছোটখাটো গোলগাল চেহারার মহিলা এগিয়ে এসে আমার গালে গাল ঠেকিয়ে চুম্বন করলেন। উনি জ্যাকলিন জোনারে। জানলাম, ইনি অত্যন্ত পরিচিত। খুব বড় একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যমণি। উনিই দায়িত্ব নিয়েছেন এই প্রদর্শনী সঠিকভাবে আয়োজন করার। ইতিমধ্যে তাঁরা দিনক্ষণ ঠিকও করে ফেলেছেন। আমার হাতে তখনও পাঁচদিন সময় আছে। নিমন্ত্রণপত্র ছাড়া হয়ে গিয়েছে।

আমার আসলে কিছু করার নেই। আমি একজনকেও চিনি না। এই বিশাল আবাস থেকে বেরোতে কত সময় লেগে যায়! তারপর আরেকটা বাড়ি মানে প্রায় হাফ কিলোমিটার। কোনটা পূর্ব, কোনটা দক্ষিণ কিছুই জানি না। ওদের সঙ্গে যাতায়াত করি আরোহী হয়ে। পরদিন জ্যাকলিনের বাড়ি গেলাম সকাল সাড়ে

১৯৭৫ সালে জেনিভায় ডঃ রুডি কার্টেলের পরিবারের সঙ্গে লেখক

দশটায়। রুডি নিয়ে গেলেন, একেবারে শহরের মাঝখানে। এক অন্যরকম বাড়িতে। লোহা আর কাচ, ভেতরে কিছু কাঠের ব্যবহার। এই দিয়ে চারতলা বাড়ি। রুডি কথোপকথন করে চলে গেলেন। তাঁকে বিদায়-চুম্বন দিয়ে জ্যাকলিন আমায় ভেতরে নিয়ে গেলেন। বিশাল ঘর, সেখানে অজস্র বইপত্র। ক্যামেরা, কার্পেট, আসবাব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সবকিছুর মধ্যে একটা অন্যরকম গৃহসজ্জা। চেনা, সহজ, সুন্দর আর গোটাকয়েক সুখী মার্জার। আমি দাঁড়াতে তারা গা-ঘেঁষে চলে যায় যে যার জায়গায়। জ্যাকলিন হাসিতে-খুশিতে অনর্গল কথা বলে যান ফরাসিতে। মাঝে মাঝে চমক ভেঙে দুয়েকটা ইংরিজিও। সে ইংরিজি কোনও কঠিন নয়। খুব তাড়াতাড়ি ওঁদের যেন বহু যুগের চেনা হয়ে যাই।

ভূস্বর্গ বড় বেশি সুন্দর। বৈভব, সৌন্দর্য যে ক্লান্ত করে, আগে কখনও বুঝিনি। সেখানে রোদ আছে, ফিরোজা নীল আকাশ আছে, ঠান্ডা আছে, বরফ ঝিরঝিরে রুপোলি কুচির মতো ঝরে যায়। আপেলের বাগানে অজস্র আপেল ফলে থাকে। সুখী ঝলমলে ফুলেরা খুশির হাওয়ায় দোলে। অন্দরে রোজ-উড়ের আসবাবঘেরা বিলাসী জীবনের সবকিছু উপচে পড়ে। আমি যা চাই যেন তাই পেয়ে যাই। কী নেই তা মাথায় আসে না। সকলে ব্যস্ত, যে যার কাজে বেরিয়ে যান, ভরপুর ঐশ্বর্যের মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। জ্যাকলিনের বাড়িতে যেন মুক্তি পাই। আসলে এখানে ঠ্যাং ছড়িয়ে খোলামেলা আড্ডা মারার কোথায় যেন একটা প্রশ্রয়, একটা আশ্রয়। প্রতিষ্ঠিত জার্মান ডঃ কার্টেলের জীবনসংস্কৃতির থেকে ভিন্ন তালে বাঁধা এ আলয়। অন্য এক এলোমেলো স্বাধীন পরিবেশ এখানে জ্যাকলিন ঘুরে দেখান তাঁর ব্যুরো। এক-এক করে দেখাতে থাকেন অন্যান্য ঘর, নিয়ে যান নীচে। সেখানে কয়েকজন প্রোজেক্টর নিয়ে কাজকর্ম করেছেন। বিশাল লাইব্রেরি, নানারকম স্থাপত্যবিদ্যার চর্চা চলে এখানে। জ্যাকলিন জোনারে জগদ্‌বিখ্যাত স্থপতি-শিল্পী লে কর্বুজিয়ের বোন। কর্বুজিয়র ফাউন্ডেশনের ইনি প্রধান, দায়িত্বশীল পরিচালক। তাই সারা পৃথিবীর নামী স্থপতিরা এখানে গবেষণা আর স্থাপত্যবিদ্যার নানা কাজে আসেন। আরেকটি প্রতিষ্ঠান চালান, নাম 'সিরকা'। এটি তরুণ শিল্পী, স্থপতি আর নানান সৃষ্টিশীল মানুষদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। সেই সুবাদে পৃথিবী-জুড়ে তাঁর যোগাযোগ, কর্মকাণ্ড। কর্বুজিয়র এক বিস্ময়কর প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন। আমি ল্যুভারে ওঁর ছবি দেখেছি। উনি বাও হাউস মুভমেন্টের অন্যতম প্রধান মানুষ। পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তির স্রষ্টা কর্বুজিয়র। ভারতের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে আছেন চন্ডিগড় শহর তৈরির জন্য। পন্ডিত নেহরুর ব্যক্তিগত অনুরোধে তিনি ওই শহরের (চন্ডিগড়) নকশা তৈরি করেন। এদিকে জ্যাকলিনের কাছে আমি খুব তাড়াতাড়ি সহজ, স্বাভাবিক প্রিয়জন হয়ে উঠি। গোটা চারতলা বাড়ি জুড়ে চলে নানান সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড। ওরাই আমার প্রদর্শনীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন। কার্ড ছাপানো, পোস্টার করা, শহরের বহু গণ্যমান্য মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো, সঙ্গে প্রদর্শনীর অন্যান্য প্রচারের দায়িত্বও। ডঃ কার্টেল ঠিক মানুষের সন্ধান করেছিলেন। মনে আছে প্রথম দিন মোট তেত্রিশটি ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে গ্যালারি, পাঁচটায় সূচনা। ক্রমশ গ্যালারি ভরে যায় নানান মানুষের ভিড়ে। সেখানে আমি একমাত্র ভারতীয় বাঙালি, কলকাতাবাসী। সেবার কোনও ভারতীয় দেখিনি! বিচিত্র মানুষের আনাগোনা। ধনী জার্মানিরা, ফরাসিরা আর ইউরোপের অন্যান্য জায়গার মানুষেরা এসেছেন সেখানে। গ্যালারির মাঝে মাঝে একটি ছোট টেবিলের ওপরে রাখা আছে কাঠের পিপে। তাতে ছোট কল দেওয়া, মাটিতে রাখা একটি ট্রে, তাতে দশ-বারোটি করে কাচের সুরাপাত্র। দর্শকেরা স্বাধীনভাবে কল খুলে

ডঃ ডিট্রিচের ছবিটি তাঁর স্ত্রীর পছন্দ হয়নি। অথচ ডিট্রিচের পছন্দ। এই ডিনারের আয়োজন করেছিলেন এক অদ্ভুত অনুরোধ করে বন্ধুদের, যেন তাঁরা এরিকাকে (ডিট্রিচের স্ত্রী) বোঝান, ছবিটি কত সুন্দর। সবার সম্মিলিত প্রশংসা হয়তো এরিকাকে তাঁর মত বদলাতে সাহায্য করবে। এরিকা ছবিটির গুরুত্ব বুঝবেন এবং রাজি হয়ে যাবেন সেই ছবিটিকে গৃহের অন্যতম অলংকার হিসেবে স্থান দিতে। ডঃ ডিট্রিচ সফল হয়েছেন।

ভরিয়ে নিচ্ছেন গাঢ় লাল রঙের ওয়াইন। একটা টেবিলে রাখা নানা ধরণের চিজ। সকলের হাতে-হাতে ঘুরছে তা। সময়মতো জ্যাকলিন মধ্যমণি হয়ে ডাক দিলেন সবাইকে। ডঃ কার্টেল, ওঁর স্ত্রী জলি আর একপাশে আমি, আর আমাদের সামনে দর্শকেরা। কার্টেল জার্মান ভাষায় আমার পরিচয় দিলেন দর্শকদের। বিন্দুমাত্র সে ভাষা না বুঝলেও বুঝলাম তিনি আমায় কীভাবে আবিষ্কার করেছেন আর সেই আবিষ্কারের ফলস্বরূপ আমি যে আজ এখানে এসেছি এবং প্রদর্শনী করছি, এটাই ছিল আলোচ্য বিষয়। তারপর পরিচয় করালেন জ্যাকলিন জোনারের। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকলিন অনুমোদন করলেন সবকিছু। কার্টেলের পর উনি বলতে শুরু করলেন ফরাসি ভাষায়। কী বললেন বুঝলাম না। মাঝে মাঝে হাসিতে ফেটে পড়তে লাগলেন দর্শকরা।

তারপর পেয়ালাভর্তি টুকটুকে লাল সুরা তুলে ধরে আমাকে নিতে বললেন। জানালাম দুঃখিত। আমি এসবে অভ্যস্ত নই। উনি খুব বিচলিত হলেন। ফরাসি না বলে ইংরিজি তর্জমায় বললেন এ কী শুনছি তোমার মুখে! এ তো শুধু দ্রাক্ষারস নয়। এ ফরাসি রক্তসুধা। আজকের আয়োজন তো ভারতের সঙ্গে ফরাসি রক্তের মিলনের, এ সুধায় সেই বার্তা। কাজেই এ সুধা পানে আমাদের আয়োজন সার্থক হবে। তারপর আবার চলে গেলেন ফরাসি তর্জমায়।

হাসি হল, গুঞ্জন হল কিন্তু ওঁদের সভ্যতায় তো মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর স্বাভাবিক সম্মান দেওয়ার প্রচলন আছে, তাই অনাবিল রসিকতাই বহাল রইল। প্রায় দুঘণ্টা চলল সেই ভিড়। লোকের আনাগোনা আর অসংখ্য কৌতূহল আমায় নিয়ে। অধিকাংশ ছবিই বিক্রি হয়ে গেল। আমি বহু মানুষের আমন্ত্রণ পেলাম। ডঃ কার্টেল সেগুলির দায়িত্ব নিলেন। আমার স্বপ্নের দিনলিপির একটি পাতা যেন ভরে গেল। সেই সুদূর প্রবাসে বিস্তীর্ণ আঙুরখেতের পথ পেরিয়ে অসংখ্য সুখী মানুষের ভিড়, সৃষ্টিক্ষুধাতুর-অজানা-অচেনা এক তরুণ চিত্রকরের ছবি দেখার জন্য। আর তাকে ঘিরে সেই শীতল ভূস্বর্গে গড়ে-ওঠা প্রদর্শশালায় তাঁরা। শিল্প-সংস্কৃতি, কৌতূহল আর উষ্ণতার জন্য।

সেদিনের অভিজ্ঞতা আর বিস্ময়ের কাহিনি যদি উজাড় করি তাহলে ছবিজীবনের গতিপথ একদিকে থমকে যায়। কিন্তু জীবনের সরণিতে যদি বিস্ময়ের বাগিচা থাকে, তার কুসুমের ঝুলি ফেলি কী করে! ডঃ ডিট্রিচ ছিলেন ডব্লিউ এইচও'র সর্বময় কর্তা। বিজ্ঞানী, আপনভোলা, সৌম্যদর্শন মানুষ। তিনি আমার একটি তেলরঙের ছবি পছন্দ করেছেন। তিরিশ ইঞ্চি বাই চল্লিশ ইঞ্চি মাপ তার। গাঢ় নীল, আশমানি প্রেক্ষাপটে পিরামিড-সদৃশ ত্রিভুজাকৃতি একটি আকার। ওরফে ভাসমান কোনও গ্রহ। তলায় দুটি হাতের স্পর্শানুভূতি। ওঁর পছন্দ ছবিটি, সম্ভবত রুডিকে জানিয়েছেন তা। কিন্তু বিতণ্ডা দেখা দিল স্ত্রীর সঙ্গে। তাঁর ওই ছবিটি পছন্দ ছিল না। তাঁর পছন্দ একটি এচিং, ইন্টাগ্লিও, সেটি ছোট কিন্তু আকর্ষণীয়। সেই সন্ধ্যায় সেই ঘটনা ওই পর্যন্তই ছিল।

পরদিন সকালে টেলিফোন পেলাম ডঃ ডিট্রিচের। তিনি সামনের শনিবার তাঁর বাড়িতে ডিনারের আয়োজন করেছেন। তাতে কার্টেল দম্পতির সঙ্গে আমায় আমন্ত্রণ জানান। আমার তো সম্মতি ছিলই। কিন্তু আয়োজনের উদ্দেশ্য কিছু জানতাম না।

ভেবেছিলাম বন্ধুদের মাঝে একজন ভারতীয় তরুণ চিত্রকরকে ঘিরে হয়তো তাঁরা একটু সময় কাটাবার জন্যই এই আয়োজন করেছেন।

কিন্তু এটা শুধু তা ছিল না। রুডি-জলি কেউই আমাকে কিছু বলেননি। সেদিন সন্ধ্যায় পরিপাটি হয়ে কার্টেল দম্পতির সঙ্গে পৌঁছলাম ডঃ ডিট্রিচের বাড়ি। সাজানোগোছানো ছবির মতো গৃহসজ্জায় কিছু জ্যামিতিক গঠন ছাড়া গন্ধ, বর্ণ, আবহাওয়া একই। কোথাও কোনও পুরনো জীর্ণ, ভগ্ন কিংবা মলিন ধূসরতা চোখে পড়ে না। সবই মনে হয় স্বপ্নে-দেখা ছবির মতো। আমি যে আশ্রয়ে থাকি, তার চেয়ে এ গৃহ ছোট। কিন্তু সেই সাজানো বাগিচা। ফলন্ত আপেলের শোভা আর বিদেশি ফুলে ভরা সে আবাস। প্রায় কুড়ি-বাইশ জন জড়ো হয়েছেন। সকলেরই হাতে পানীয়। মার্সিডিজ আর বিএমডব্লিউ থেকে বেরিয়ে আসা দম্পতিরা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। আমি ঢুকতেই সবাই অভিবাদন করলেন। করমর্দন করলেন। অনেকেই চুম্বন করলেন। এমুহূর্তে আমি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অতিথি। সকলেই ঢুকলেন ডঃ ডিট্রিচের স্টাডিরুমে। টেবিলের সামনে টাঙানো আমার সেই তেলরঙের তিরিশ ইঞ্চি বাই চল্লিশ ইঞ্চি ছবিটি। মনে হল যেন কতকাল ধরে সে ঘরে সজ্জিত রয়েছে তা। চেয়ারে বসলেই চোখের সামনে সে ছবি। দুদিকে সাজানো বইয়ের তাক। মনেই হয় না সেই সুদূর কলকাতা থেকে বয়ে-আনা নতুন করে ফ্রেমবন্দি আমারই কাজ। কিছু সময় এদিকে কাটিয়ে উঁকি দিই কয়েকটি ঘর পেরিয়ে একটি বড় ঘরে। সেখানে খাবার-সাজানো বড় টেবিল। থরে থরে প্লেট পরিপাটি করে রাখা। একটু পরেই নিমন্ত্রিত মানুষেরা বসে পড়বেন। সেই ঘরের মাঝখানে ঝুলছে আমার অন্য সেই ছবি। মূলত নীল। তিনটি স্তরে ভাগ করা। নীলের মাঝখানে একটি মাছের ফসিল। তলায় শাপলার মতো ফুল। ওপরে দীর্ঘচঞ্চু, মুক্তডানা এক পাখি। বেশ মানিয়েছে। এই ছবিটি ওখানে যদিও আকারে ছোট কিন্তু প্রশস্ত ফাঁকা দেওয়ালের মাঝখানে চওড়া বোর্ডে সরু ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটি মানুষের আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট। আমি তো ভাষা বুঝি না, আমার সঙ্গে আলোচনার সময় তাঁরা ইংরিজিতে বাক্যবিনিময় করেছেন। নতুবা শুধুই জার্মান। মহিলারা আবার মাঝে মাঝে ফরাসিও বলছেন।

কিছুক্ষণ পরে একটু হুল্লোড় শোনা গেল। সবাই খুব খুশিতে পরস্পরকে আলিঙ্গনে মেতে উঠলেন। আমি কিছুই বুঝলাম না। সবাইকে খুশি দেখে আমি কিছুটা অপ্রস্তুতেই পড়ি। অঢেল খাওয়াদাওয়া হয়। সে দম্পতির আপ্যায়নে আপ্যায়িত আমি। খাওয়ার শেষে চকলেট ধরিয়ে দেন। প্রচুর রঙিন বোতল মুহূর্তে নিঃশেষ লুটিয়ে পড়া আত্মাহীন শরীরের মতো। এ বাড়িতে আমার অস্তিত্বের দুটি চিহ্নই সমাদরে প্রতিষ্ঠিত। মন গোপন খুশিতে ভরে ওঠে। বিদায় জানিয়ে কার্টেলের সঙ্গে বাড়িতে ফিরি। গাড়িতেই কথোপকথন চলে। রুডি-জলি মহাখুশি। খুশির কারণ আমাকে জানান ইংরিজি তর্জমায়। ডঃ ডিট্রিচের ছবিটি তাঁর স্ত্রীর পছন্দ হয়নি। অথচ ডিট্রিচের পছন্দ। এই ডিনারের আয়োজন করেছিলেন এক অদ্ভুত অনুরোধ করে বন্ধুদের, যেন তাঁরা এরিকাকে (ডিট্রিচের

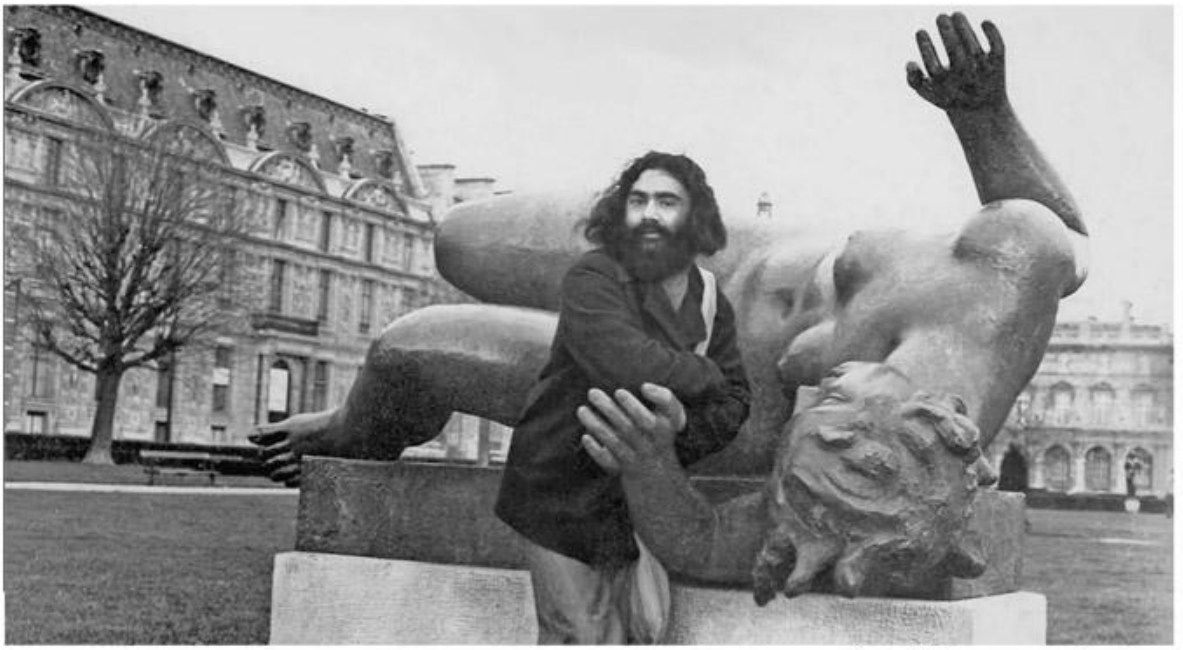

১৯৭৬ সালে লুভার প্যারিসে আরিস্টাইড মেললের ভাস্কর্যের সামনে লেখক

কিছু পয়সা সঞ্চয় করতে পারলাম, কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে শক্তিদা (কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়) পাকড়াও করলেন। আমার বিদেশ-পাড়ি নিয়ে দুয়েকটা কথাবার্তাও হল। বললেন, বল খাওয়াবি কবে? তার ঠিক ক'দিন পরেই আনন্দবাজার পত্রিকার কলকাতার কড়চায় কী মিষ্টি মজার কথা প্রকাশ পেল শক্তিদার লেখনীতে।

স্ত্রী) বোঝান, ছবিটি কত সুন্দর। সবার সম্মিলিত প্রশংসা হয়তো এরিকাকে তাঁর মত বদলাতে সাহায্য করবে। এরিকা ছবিটির গুরুত্ব বুঝবেন এবং রাজি হয়ে যাবেন সেই ছবিটিকে গৃহের অন্যতম অলংকার হিসেবে স্থান দিতে। ডঃ ডিট্রিচ সফল হয়েছেন। ডঃ কার্টেল আরও খুশি এই কারণে যে এর ফলে দুটি ছবিই তাঁরা সংগ্রহ করেছেন। একটি এরিকার ভালো লাগা আরেকটি তাঁর স্বামীর।

পেশাজীবন শুরুর সময় যখন মরীচিকা ছাড়া কিছুই দেখি না তখন সুইজারল্যান্ডের এই বিলাসী শহরে আমার ছবি নিয়ে দম্পতির পছন্দ, ভালোলাগা, আস্থা অর্জনের এ-এক অদ্ভুত কৌশল আমাকে বিস্মিত করেছিল।

সেই প্রদর্শনী সফল হয়। এর রেশ ধরে আমি আমন্ত্রণ পাই অন্য এক পেশাদার গ্যালারির। মালিক ছিলেন একজন ডাচ মহিলা। শহরের সবচেয়ে নামী রাস্তার এককোণে কাচে-ঘেরা সে গ্যালারির নাম ছিল গ্যালারি ডেনবার্গ। আমি ঠিক তার দেড়বছর পরে আবার পাড়ি দিয়েছিলাম জেনিভায়, ছবি নিয়ে। তখন শহর কলকাতার সমাজে বিদেশ-পাড়ির একটা মর্যাদা ছিল। আমি যে কিছু একটা করতে পেরেছি, সাধারণ মানুষের ইতিউতি আলোচনায় তা বোঝা যেত।

কিছু পয়সা সঞ্চয় করতে পারলাম, কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে শক্তিদা (কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়) পাকড়াও করলেন। আমার বিদেশ-পাড়ি নিয়ে দুয়েকটা কথাবার্তাও হল। বললেন, বল খাওয়াবি কবে? তার ঠিক ক'দিন পরেই আনন্দবাজার পত্রিকার কলকাতার কড়চায় কী মিষ্টি মজার কথা প্রকাশ পেল শক্তিদার লেখনীতে।

অবহেলা, অবজ্ঞা থাকলেও বাড়িতে থাকার যে অশান্তি ছিল সেটা কমতে লাগল। প্রশংসাবাক্য বাবার মুখ থেকে প্রকাশ না পেলেও একটা প্রশ্রয়ের চাপা সুর নিঃশব্দ ঝংকারের মতো উপলব্ধি করতাম, তখন পুরোদমে ক্যালকাটা পেইন্টার্স, বিকেলে সোডা ফাউন্টেন, আনন্দবাজার, দেশে লেখালেখি আর অলংকরণ দুই-ই চলত।

কলকাতা বা ভারতবর্ষের ছবির বাজার তখনও ভালোভাবে গড়ে ওঠেনি। বড়রা বেশিরভাগই কোথাও-না-কোথাও চাকরি করতেন। বিজ্ঞাপন শিল্পীরা রমরমিয়ে কাজ করতেন। তাঁদের চোখে ছবি আঁকিয়েরা একটু করুণার পাত্র ছিল। শ্যামল দত্ত রায় থেকে যোগেন চৌধুরি, রবীন মণ্ডল থেকে প্রকাশ কর্মকার, সুহাস রায়, লালুপ্রসাদ থেকে গনেশ হালুই সবাই হয় শিক্ষকতা অথবা কোনও বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে কাজ করতেন। একমাত্র নীরদ মজুমদার সেই প্যারিস থেকে ফিরে শুধুই ছবি আঁকতেন। তার দামও ছিল বেশ বড় রকমের। সেসময় সত্যিই নীরদ মজুমদারকে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে বিবেচনা করা হত। ওঁকে নিয়ে নানা গল্প চালু ছিল। কলকাতায় যে কয়েকটি পরিবার সৃষ্টিতে, মেধায় পরিচিত ছিল একাধিক সৃষ্টিশীল মানুষদের জন্য, এই মজুমদার পরিবার তাদের অন্যতম।

ক্রমশ

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

দাম ২০ টাকা

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজপাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

এই লেখকের আরও দুটি ছোটদের বই

কুমির হয়ে জলে গেল

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ ₹৩০

চড়ুইয়ের সঙ্গে

₹১৫

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ভ্রমণ কথা

রাজা তেইদের দ্বীপে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

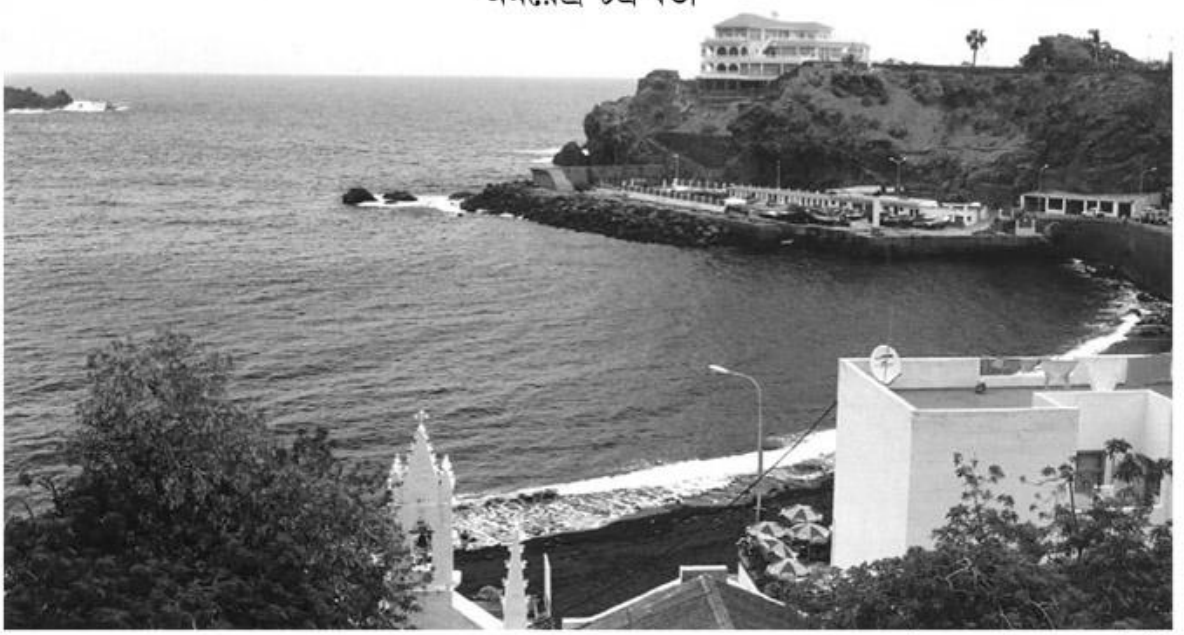

ইসাবেলার বাড়ির ডানপাশে আটলান্টিক

১

নিমন্ত্রণের নোবেল

কলকাতা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে প্রায় আফ্রিকার কোল ঘেঁসে সাতটি দ্বীপ নিয়ে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ, সেই সাত দ্বীপের এক দ্বীপ— টেনেরিফ। মাত্র একবেলার আলাপে সেখানে যাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি। নিমন্ত্রণকর্ত্রী টেনেরিফবাসী জার্মান শিল্পী ইসাবেলা সোলুনা।

আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল ১৯৯৮-এর আগস্টে, মিউনিখে। তাঁর মেয়ে চিনাতত্ত্ববিদ ক্রিস্টিনে ও মেয়ের বন্ধু প্রিকিতে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ক্রিস্টিনে-প্রিকিতের সঙ্গে তার আগের দিনই আমার প্রথম পরিচয়, মিউনিখের রাস্তায় বেহালা শুনতে শুনতে।

ইসাবেলার কাছেই আমি প্রথম টেনেরিফের কথা শুনি। নিজের বড় মাপের ভিজিটিং কার্ডের উল্টোপিঠে খচখচ করে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিলেন— এই হল গিয়ে স্পেন, এই হল আফ্রিকা, এটা ভূমধ্যসাগর আর এদিকটা হল আটলান্টিক মহাসাগর, আর এই হল টেনেরিফ।

শুনতে শুনতে পায়ের নিচে নদীর খরস্রোতের মতো অচেনা পৃথিবীর টান টের পাই। সেদিনই ঠিক হল, সামনের বছর টেনেরিফ যাব, জুন মাসের গোড়ায়।

বাড়ি খুঁজে পাব কীভাবে?

এই দ্বীপে প্রথম যারা আসে তাদের পক্ষে সেটা সম্ভবই নয়, ইসাবেলা তাই নিজেই এয়ারপোর্টে আসবেন গাড়ি নিয়ে।

সেই একবারই দেখা, তাও বিদেশে, মাত্রই কয়েক ঘণ্টার জন্য, এ অবস্থায় শুধু মুখের কথায় অজানা সাগরে অচেনা দ্বীপে পাড়ি দেওয়া আর অসীম সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া বোধহয় একই কথা।

মনের মধ্যে এই দ্বিধা আর সমুদ্রের গুমগুম ধ্বনি। এর যেন আর শেষ নেই।

ভাবি, এ কি সত্যি, না স্বপ্ন? কত দূরের কোন মহাসাগরে ফুটকির মতো একটা দ্বীপ, তার উত্তরে স্পেন, পুবে আফ্রিকা, সেই দ্বীপে সত্যিই আমার বেড়াবার নিমন্ত্রণ? ঠিক যেন ভরসা হয় না। এ নিছক মৌখিক ভদ্রতা নয় তো?

নিমন্ত্রণের পর মাস কয়েক কেটে গেছে, ভাবি এতদিন পরেও আমার কথা, আমার যাবার কথা, এয়ারপোর্টে তাঁর আসার কথা তাঁর মনে আছে তো? ডিসেম্বরে একদিন টেলিফোন করে পাল্টা প্রশ্ন শুনি— কবে আসছ?

ক'দিন পরই নববর্ষের শুভেচ্ছা সহ চিঠি:

প্রিয় অমরেন্দ্র,

তোমার টেলিফোনের জন্য ধন্যবাদ। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি তোমার জন্য ক্রিসমাস কার্ড আর মিউনিখের সেই গ্রীষ্মের সন্ধ্যার একটি ফটো পাঠাবার তোড়জোড় করছিলাম। সেই গ্রীষ্মের পর বহুদিন পার হয়ে গেছে। এখন আরেকটা নতুন বছর আসছে। আমি আশা করি এ বছরটা আমাদের পক্ষে, সারা পৃথিবীর পক্ষে একটা শুভ বর্ষ হবে— শান্তিপূর্ণ বছর হবে।

নতুন বছরে এখানে টেনেরিফে তোমার সঙ্গে দেখা হবার অপেক্ষায় রয়েছি। খুব সুন্দর

টেনেরিফের রাস্তায়

একটা জায়গায় আমি থাকি, তোমারও ভালো লাগবে, কেননা এই দ্বীপটা একটা প্যারাডাইস। আমি ভালো আছি, আমার নানান কাটুম-কুটুম আর ছবি আঁকার কাজ করে যাচ্ছি। তোমার ক্রিসমাস আনন্দে কাটুক। তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই।

—ইসাবেলা

যাত্রার মাস দুয়েক আগে টেনেরিফের একটা স্কেচ পেলাম ফ্যাক্সে, ওই স্বর্গরাজ্যের ঠিক কোন জায়গা দিয়ে সূর্য ওঠে, কোন দিকে সূর্য অস্ত যায়, তাও এঁকে পাঠিয়েছেন, সঙ্গে কয়েক লাইন চিঠি—

গোটা টেনেরিফ দ্বীপ তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে। এই ছোট্ট দ্বীপটি যাতে তুমি ঠিকমতো অনুভব করতে পারো আমি আনন্দের সঙ্গে তার চেষ্টা করব।

কলকাতা থেকে যাত্রার তারিখ ঠিক হয়েছে ৩১ মে, টেনেরিফে পৌঁছব পয়লা জুন।

৩১ মে অফিসে শেষ মুহূর্তের কাজ সারছি, তার মধ্যেই নেমন্তন্নের নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেলাম। ফ্যাক্সে চিঠি এল—

১ জুন মাদ্রিদ থেকে আইবেরিয়া এয়ারলাইন্সে তুমি টেনেরিফ পৌঁছবে বিকেল ৪টে ৫৫য়। আমি ঠিক সময়েই এয়ারপোর্টে আসছি। উড়ানে বিলম্ব ঘটলে আমাকে হাত-ফোনে জানিয়ো, ১ তারিখ সারাদিনই এটা চালু থাকবে। স্বর্গরাজ্যের কিছু ফুল, পাখি, প্রজাপতি, মানুষজন আর ভালোবাসা, তোমার জন্য। —ইসাবেলা

দূর বিদেশে, অজানা দ্বীপে একটা নিশ্চিত থাকার ব্যবস্থা, নিশ্চিন্তে বেড়ানোর বন্দোবস্ত এখন তাহলে আর কোনও স্বপ্ন নয়! তাছাড়া ওই ফুল, পাখি, প্রজাপতি, মানুষজন আর ভালোবাসা— এমন নিমন্ত্রণও ভাগ্যে ছিল!

২

স্প্যানিশ মেয়ের হাতের ফোন

বিকেল চারটেয় অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা দমদম হয়ে দিল্লি। দিল্লি থেকে সুইস এয়ারের প্লেন আকাশে উঠল রাত প্রায় দেড়টায়। জুরিখে বিমান বদলে মাদ্রিদ পৌঁছলাম ভারতীয় সময় সন্ধে ছ'টায়, মাদ্রিদে তখন বেলা দুটো। সওয়া তিনটেয় টেনেরিফের উড়ান।

আড়াইটার সময় ঘোষণা শোনা গেল, প্লেন দেরিতে যাত্রা করবে। কোথাকার যেন আবহাওয়া খারাপ থাকায় বিমানটি এখনও মাদ্রিদে এসে পৌঁছয়নি। অতএব ঠিক কখন ছাড়বে এখনই বলা যাচ্ছে না।

স্পেনদেশীয় এক কোলকুঁজো অস্থিচর্মসার বৃদ্ধ, বার্ধক্য ও ব্যাধিতেও অপূর্ব তাঁর মুখশ্রী, বসবার আসনে লম্বা হয়ে শুয়ে ছিলেন, তাঁর শিয়রে, ও পাশের খালি হুইলচেয়ারের সামনে বসে-দাঁড়িয়ে দুজোড়া পুত্র-পুত্রবধূ কিংবা কন্যা-জামাতা কিংবা পুত্র কন্যা বধূ ও জামাতা, এদের সকলেই চমৎকার সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান, অনেকক্ষণ ধরে এদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে আন্দাজ হল, এরা তাদের বাবা কিংবা শ্বশুরকে টেনেরিফে নিয়ে যাচ্ছে। উড়ানের দেরি শুনে মেয়ে বা পুত্রবধূ ফরাসিতে বলে উঠল, তার মানে আজও আগের বারের মতো তিন-চার ঘণ্টার ধাক্কা।

> এয়ারপোর্ট থেকে রাস্তার দুপাশে দেখতে দেখতে আসছি, বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার এসে বেশ দমে গেলাম। সবটাই খুব রুক্ষ, পাথুরে, সবুজের ছিটে ফোঁটাও নেই। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে রোদ্দুরের প্লাবন!

দেরির কথা ইসাবেলাকে জানানো দরকার, তাঁর হাত-ফোনের নম্বর বুকপকেটে নিয়েই বেরিয়েছি। সমস্যা হল, কয়েন দিয়েই ফোন করি আর ফোন কার্ড কিনেই করি, প্রথমে ডলার ভাঙিয়ে পেসেতা করতে হবে। এই এয়ারপোর্টের কোনদিকে কোথায় ব্যাঙ্ক বা মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্র কে জানে! তাছাড়া অনেক খুঁজেও কয়েন দিয়ে করা যায় এমন একটা টেলিফোনও চোখে পড়ল না। আজকাল ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই কয়েনের চেয়ে কার্ড দিয়ে টেলিফোন করার ব্যবস্থাই বেশি। তার মানে দুয়েক মিনিটের একটা ফোন করতেও আমাকে আগে একটা কার্ডের দোকান খুঁজতে হবে।

আমার পাশেই একলা একটি মেয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। সে হঠাৎ একা-একা কথা বলছে শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি তার কানে হাত-ফোন।

কথা শেষ করে ফোনটি হাতব্যাগে ঢোকাচ্ছে দেখে আমার সমস্যাটা মেয়েটিকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে, বললাম, আমি কি এক মিনিট তোমার ফোনে টেনেরিফে কথা বলতে পারি?

মেয়েটির চটপট উত্তর— আমারও একই সমস্যা। আমাকেও এয়ারপোর্ট থেকে নিতে আসবে। সঠিক ডিপারচার টাইম ঘোষণা করুক, তখন ফোন করব, তুমিও তখনই ফোন করো।

টেনেরিফের প্লেন সওয়া পাঁচটায় ছাড়বে। ঘোষণা শুনে ফোনের জন্য পাশে তাকিয়ে দেখি মেয়েটি কখন উঠে গেছে। এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে তাকে আর খুঁজে পাই না।

ইসাবেলাকে ফোন করা হল না, ফোন না পেয়ে চলে যাবেন না তো? ভাবলাম, এতদূর যখন এসেছি তখন দ্বীপটা না দেখে ফিরব না। ইসাবেলার সঙ্গে দেখা না হলেও টেনেরিফে

দুয়েক দিন মাথা গোঁজার মতো জায়গা কি আর মিলবে না!

টেনেরিফে পৌঁছে লাগেজের জন্য কনভেয়ার বেল্টের সামনে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ মাদ্রিদের সেই মেয়েটি এসে বলল, ফোন নম্বর দিন, কথা বলিয়ে দিচ্ছি। ফোনে ইসাবেলাকে পেয়ে বললাম, আমি এইমাত্র পৌঁছেছি, আপনি এখন কোথায়?

'তুমি এখন কোথায়?'

'কনভেয়ার বেল্টের সামনে, লাগেজের অপেক্ষায়।'

'ওখানেই থাকো, আমি আসছি। একটু বেনিয়ম হবে, তা হোক।'

পাঁচ মিনিটেই ইসাবেলাকে দেখতে পেলাম, চিনতে কোনও অসুবিধাই হল না, কেননা মিউনিখের গ্রুপ ফটোতে আমরা দুজনেই ছিলাম।

ইউরোপের রীতি অনুযায়ী গালে গাল লাগিয়ে অনেকটা যেন শূন্যে চুম্বন বিনিময় হল।

৩

বাড়ি আফ্রিকার মতো দূরে

টেনেরিফে দুটো বিমানবন্দর। একটা উত্তরে, একটা দক্ষিণে। আমি নেমেছি দক্ষিণে, ইসাবেলার আবাস দ্বীপের উত্তরে। টেনেরিফ থেকে আফ্রিকা যত দূরে, এই বিমানবন্দর থেকে ইসাবেলার বাড়িরও প্রায় ততটাই দূরে।

এয়ারপোর্ট থেকে রাস্তার দুপাশে দেখতে দেখতে আসছি, বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার এসে বেশ দমে গেলাম। সবটাই খুব রুক্ষ, পাথুরে, সবুজের ছিটে ফোঁটাও নেই। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে রোদ্দুরের প্লাবন!

উত্তর গোলার্ধে ২৮ ও ২৯ ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে আর পশ্চিম গোলার্ধে ১৬ ও ১৭ ডিগ্রি দ্রাঘিমার মধ্যে কোন একটা দ্বীপের কোন রাস্তা দিয়ে কার সঙ্গে কোথায় চলেছি কে জানে! আড়চোখে ইসাবেলার দিকে তাকালাম, রাস্তায় চোখ রেখে বেশ জোরে গাড়ি চালাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে উত্তর ও দক্ষিণ টেনেরিফের আবহাওয়া ও নিসর্গগত পার্থক্য সম্পর্কে আমাকে অবগত করাচ্ছেন।

আমার মনে তখন একটাই চিন্তা— ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাসাগরের বুকে এরকম একটা দ্বীপে দশ দিন কাটাব কী করে। কখনও ডানদিকে, কখনও সামনে কালচে-নীল আটলান্টিক, কোথায় তার তল, কোথায় তার অন্ত জানি না, এ যেন আকাশের মতোই পারহীন, শুধু আমাদের দিকে, সৈকতে বিশালাকার রাক্ষসসদৃশ প্রাগৈতিহাসিক পাথরের চাঁই।

এরকমই একটি জনহীন জায়গায় সমুদ্র ঘেঁসে একটা বাড়ি, সামনে বাঁধানো চত্বর, অনেক নিচে উন্মাদ সমুদ্রের উদ্দাম ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাবর্ত্য দেওয়ালে।

এটা একটা কাফে। ইসাবেলার বাড়ি

রেয়ালেখসে এসে কোথাও নাকছাবির মতো এক কুচি রোদ্দুরও দেখতে পেলাম না। ভিজে ভিজে মেঘলা দিন, সবুজ পাহাড় ওয়াড়হীন মেঘের লেপে গলা অব্দি ঢেকে ঘুমোচ্ছে বা কোনক্রমে জেগে আছে। সঙ্গে ঠান্ডা বাতাস, আমাদেরও গরম পোশাক চড়াতে হয়, আমি গলা অব্দি জিপার টেনে দিই।

ইসাবেলার বাড়ি

থেকে জায়গাটা অনেক দূরে, ফলে চট করে এখানে আর আসা হবে না, তাছাড়া প্রায় ৩০ ঘণ্টা আগে কলকাতা ছেড়ে আমি এখন নিশ্চয়ই ক্লান্ত, অতএব একটা ঠান্ডা বিয়ার বা কড়া কফি আমার নিতান্ত দরকার— এই দুটি কারণে এখানে আমাদের আধঘণ্টা যাত্রা বিরতি।

আমি কফি নিলাম, ইসাবেলা ছোট একটা বিয়ার। জলস্থল এমনই রৌদ্রোজ্জ্বল যে নতুন জায়গা হওয়া সত্ত্বেও চোখ মেলে তাকাতে পারছি না।

ইসাবেলার ধারাভাষ্য থেকে বুঝলাম, টেনেরিফের এই দক্ষিণাঞ্চলে যেমন দিনের বেশিরভাগ সময় ঝকঝকে রোদ, উত্তরাঞ্চলে তেমন নয়, সেখানে রৌদ্রের চেয়ে বেশি মেঘ, বেশি বৃষ্টি, বাতাসের আর্দ্রতাও অনেক বেশি, তবে প্রচুর গাছপালা লতাগুল্ম ও প্রাচীন বনস্পতি দেখে চোখ জুড়োবে। উনিশ শতকের ইউরোপের ডাক্তাররা, বিশেষ করে ব্রিটিশ ও ডাচ চিকিৎসকরা তাঁদের রোগীদের উত্তর টেনেরিফে হাওয়া বদলের পরামর্শ দিতেন। তখনকার দিনে বার্ধক্যজনিত বা রক্তচলাচল ঘটিত অসুখ-বিসুখে প্রাচীন এই দ্বীপের উত্তরাঞ্চল ছিল প্রাকৃতিক আরোগ্যনিকেতন।

আমরা যাব এল টসকাল লঙ্গুয়েরা (El Toscal Longuera) গ্রামে। কোথায় সেটা? টেনেরিফের উত্তরাংশে লস রেয়ালেখসে (Los Realejos)।

যতই উত্তরের দিকে এগোই ততই রোদ কম, মেঘ বেশি, কখনও বা এই মেঘ, এই রোদ, এই শীত, এই ঘাম। রেয়ালেখসে এসে কোথাও নাকছাবির মতো এক কুচি রোদ্দুরও দেখতে পেলাম না। ভিজে ভিজে মেঘলা দিন, সবুজ পাহাড় ওয়াড়হীন মেঘের লেপে গলা অব্দি ঢেকে ঘুমোচ্ছে বা কোনক্রমে জেগে আছে। সঙ্গে ঠান্ডা বাতাস, আমাদেরও গরম পোশাক চড়াতে হয়, আমি গলা অব্দি জিপার টেনে দিই। রাস্তার ধারে রক্তকরবী, শ্বেতকরবী, হলুদ করবীর সারির যেন আর শেষ নেই। এই হল টসকাল লঙ্গুয়েরা। এখানকার দুটি পাড়া রোমান্টিকা-এক ও রোমান্টিকা-দুই, ইসাবেলার বাড়ি রোমান্টিকা-এক বা রোমান্টিকা উনোয় (Romantica Uno)। সামনেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মহাসমুদ্র, কালো বালুকাবেলার পাশেই মাইলের পর মাইল বামনাকার কলাগাছের সারি। কলাকে এখানে বলে প্লাতানো (Platano), কলাই বোধহয় এই দ্বীপের প্রধান ফল।

বাড়ির নাম রোমান্টিকা

পাড়ার নামেই বাড়ির নাম— রোমান্টিকা। নীল সমুদ্রের ধারে ধপধপে সাদা দোতলা এই বাড়ির একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন ইসাবেলা। ঢুকেই মনোমুগ্ধকর মস্ত ঘর, দেওয়ালে যত্নে বাঁধানো তাঁর নানা পেইনটিং, দেওয়াল সংলগ্ন সেলফে নতুন পুরনো বইয়ের সারি, দুদিকে তাঁর দুটি আঁকার জায়গা, এক পাশে চমৎকার বসার ব্যবস্থা, আরেক পাশে খাওয়ার টেবিল, পুরো গৃহসজ্জাই যেন একটা শিল্পরচনা। এর মধ্যে ছোট একটা ঘরে রং তুলি ব্রাশ ইজেলের স্তূপ, সমাপ্ত-অসমাপ্ত ছবির পাহাড়, টেবিলে টেনেরিফের ওপর বই পত্রিকা মানচিত্র, দেওয়াল ঘেঁসা ছোট্ট বিছানা— এই ঘর অতিথির জন্য, শুধু ঘুমের সময়টুকুর জন্য। বাকি সময় তো পাহাড়ে সৈকতে অরণ্যে ঘুরে ঘুরেই কাটবে। তাছাড়া বাইরের ঘর ও ঘরের বাইরে সমুদ্রমুখী বসবার জায়গা তো রইলই।

রাত নটা নাগাদ মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে অস্তসূর্যের আলো ফুটল। অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে খোলা বারান্দায় একটা খাবার টেবিল পাতা আছে, সেইখানে রাতের খাওয়া হবে।

আজকের দিনটা আমার অদ্ভুত দর্শনের দিন। টেনেরিফে পৌঁছনোর পর থেকে যা দেখছি সবই যেন আমার চোখে নতুন। বোধহয় দশ দিন ধরে শুধু নতুন আর অচেনা আর অদ্ভুত দেখে দেখেই কাটবে।

স্যুপে লাভার গন্ধ

রাতের আহারও দেখছি অন্য ধরনের। গাঢ় সবুজাভ নিরামিষ স্যুপ, অতি সুস্বাদু, ব্রেড স্টিক আর স্যুপ বেশ তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছি, ইসাবেলা হঠাৎ উঠে গিয়ে বাগান থেকে একটা পাথরের সিংহমূর্তির তলা থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে এনে স্যুপের বাটিতে দিয়ে বললেন, এই হার্বটা খুব ভালো, বোধহয় প্রাচ্যের, গন্ধটা তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

গন্ধ শুঁকে মনে হল তুলসী পাতা। ইসাবেলা সিংহটা দেখিয়ে বললেন, ওটা একটা জ্যান্ত প্রাণী তা জানো?

দ্বীপটাও অচেনা, গৃহকর্ত্রীও প্রায় তাই, ফলে প্রথম দিনের ভার-ভার বোধটা এরকম ঠাট্টা তামাসায় কিছুটা হালকা হয়। ঠাট্টার জবাবে আমার মৃদু হাসি দেখে ইসাবেলা গুরুত্ব দিয়ে বললেন, তুমি বিশ্বাস করছ না। চেয়ে থাকো। হয়তো এখুনি দেখতে পাবে। আমি ওকে ব্রেকফাস্টের সময় রোজ নিজের হাতে খাবার দিই।

গরম স্যুপ ধীরে ধীরে খাচ্ছি আর সিংহের মুখের দিকে তাকাচ্ছি, হঠাৎ দেখি পশুরাজের মুখ থেকে সরু একটা জিভ বেরিয়ে এসে ডাইনে-বাঁয়ে সামান্য নড়াচড়া করে আবার ভেতরে ঢুকে গেল।

একটু পরেই আরেকবার জিভ বের করতে ভালো করে নজর করে দেখি ওটা একটা টিকটিকি বা গিরগিটি!

আমি সেকথা বলতে ইসাবেলা বললেন, তুমি কি ভেবেছিলে সিংহটাই জ্যান্ত! আমি বলেছিলাম সিংহটার মধ্যে একটা জ্যান্ত প্রাণী আছে।

স্যুপ খুব ভালো লেগেছে শুনে ইসাবেলা আরও দুহাতা স্যুপ ঢেলে দিলেন। আমি মন দিয়ে খাচ্ছি, ইসাবেলা বললেন— তুমি স্যুপে লাভার গন্ধ পাচ্ছ না তো? যারা প্রথম আসে

এখানকার দ্রাগো গাছ (Drago) তাদের দীর্ঘ আয়ুর জন্য প্রসিদ্ধ, হাজার বছরের প্রাচীন দ্রাগো গাছ আজও বহাল তবিয়তে আছে। এই গাছ টেনেরিফের প্রাণবৃক্ষ বললেই ঠিক হয়।

তারা অনেকেই পায়। ১৭৯৮ সালে টেনেরিফের টিয়েডে পাহাড়ে আগ্নেয়গিরির ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল। এখনও মাইলের পর মাইল সেই লাভা দেখতে লোক আসে। তোমাকেও দেখতে নিয়ে যাব।

পরদিন সকাল থেকে শুরু হবে দেখে বেড়ানো। দেখার জায়গা কি একটা? পুয়ের্তো দে লা ক্রুজ, লা লাগুনা, টাগানানা, সান্তা ক্রুজ, ওরোতাভা, আলমাসিগা— ইসাবেলা যেন তার অতি প্রিয় সব জিনিসের নাম বলে যাচ্ছেন, শুনতে ভারি মিষ্টি কিন্তু মনে রাখা সহজ নয়।

এক ফাঁকে রান্নাঘরে ঢুকে জল খাবার গ্লাস খুঁজতে গিয়ে জানলা দিয়ে অনন্ত আটলান্টিক দেখে মন ভরে যায়।

রাত বারোটায় স্তূপাকার রং তুলি ছবির মধ্যে নরম বিছানায় পালকের মতো হালকা লেপের তলায় শুয়ে টেনেরিফে প্রথম দিনের নানা দৃশ্যের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই যেন ঘুমের সমুদ্রে তলিয়ে গেলাম।

তখন কি আর জানতাম এই দ্বীপঘুমের ঘোর দশ দিনে ভাঙবার নয়!

৪

ওলা কেতাল

একবার এক প্রবল বর্ষার দিনে আন্দামানের মায়াবন্দর থেকে দিশি নৌকোয় এভিস দ্বীপে যাবার পথে উথালপাতাল সমুদ্রে প্রাণান্তকর নাগরদোলায় চড়তে হয়েছিল, অনেকদিন পর সেই দুঃস্বপ্নের সমুদ্রযাত্রার স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে গেল। আমার হাতঘড়িতে দেখি বেলা এগারোটা।

দরজা খুলে বাইরে এসে ইসাবেলাকে কোথাও দেখতে পেলাম না, তাঁর শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ, হয়তো বেরিয়েছেন।

বসার ঘরের দেওয়ালজোড়া কাচের জানলা দিয়ে আটলান্টিক দেখতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, এখনও সকাল হয়নি। বাঁদিকের পাহাড়, ডানদিকের সমুদ্র, ওপরের আকাশ সবই ছাই রঙের মিহি অন্ধকারে ঢাকা। দেওয়ালঘড়িতে পাখির ডাক শুনে তাকাই— ভোর সাড়ে ছটা। তার মানে আমার ঘড়িতে ভারতীয় সময় দেখেছিলাম! ইসাবেলা তাহলে এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি।

বাইরে যাবার দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ি, গ্রামের পথে ঘুরে বেড়াই। আসামের ডিফুর মতো উঁচুনিচু ঢেউ খেলানো রাস্তা। কোথাও সিকিমের মতো চড়াই-উতরাই। তখন তো আর জানি না টেনেরিফে আমাদের কেদার-বদ্রী বা কখনও অমরনাথের রাস্তার মতো চড়াই-উতরাইও পেরতে হবে। কখনও গাড়িতে, কখনও পায়ে হেঁটে।

একটু পর পর চমৎকার সব বাড়ি, রাস্তার ধারে দেওয়াল ঘেঁসে সারি সারি গাড়ি পার্ক করা, প্রচুর ফুলগাছ। এত রকম রং, এমন আশ্চর্য সব রং যে দেখে দেখে আর আশ মেটে না। আমার অজানা গাছ ও লতাগুল্মও অনেক দেখলাম। কাল রাতে একটা বইয়ে দেখেছি বাইরের পৃথিবীর অজানা সাড়ে তিনশো প্রজাতির উদ্ভিদ আছে টেনেরিফে। এখানকার দ্রাগো গাছ (Drago) তাদের দীর্ঘ আয়ুর জন্য প্রসিদ্ধ, হাজার বছরের প্রাচীন দ্রাগো গাছ আজও বহাল তবিয়তে আছে। এই গাছ টেনেরিফের প্রাণবৃক্ষ বললেই ঠিক হয়।

ফেরার পথে সকালের আলো ফুটতে, দেখলাম পাহাড়ের কোলে-বুকে কালকের মতোই মেঘ জমে আছে।

রোমান্টিকার ঘর থেকে, ঘরের বাইরের খাবার টেবিল বা খোলা চত্বর থেকে কিছুটা সামনে ও বাঁদিকে তাকালে এই মেঘমাখা পাহাড়, আর ডানদিকে চোখ মেললেই সুনীল জলরাশি।

ইসাবেলা সারা দিনের মতো তৈরি হয়ে কফি খাচ্ছিলেন, এক টুকরো খাবার সিংহের মুখের মধ্যে রেখে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কফি, না চা? সকালে তোমার কী পছন্দ?

কোথায় গিয়েছিলাম, কেন গিয়েছিলাম, কেন না-বলে গিয়েছিলাম— এসব নিয়ে কোনও প্রশ্নই করলেন না।

চা খেতে খেতে চারপাশ দেখছি আর নিজের ভ্রমণভাগ্য ভেবে অবাক হচ্ছি, হঠাৎ শুনি ওপর থেকে একটা পাখি ডেকে উঠল— ওলা কেতাল? বনদিয়া আমিগো! ওলা কেতাল? বনদিয়া আমিগো! (Hola, que tal, Bondia, amigo)।

ইসাবেলা দোতলার বারান্দায় খাঁচার মধ্যে একটা ময়না পাখি দেখিয়ে বললেন— ওলা কেতাল মানে হ্যালো, হাউ আর ইউ? বনদিয়া আমিগো— গুড ডে, ফ্রেন্ড। তোমাকে বলছে।

এই ময়না রোমান্টিকার বাড়িউলি এক স্পেনদেশীয় বৃদ্ধার। পাখিটা খাঁচার মধ্যে নাচতে নাচতে কথা বলছে। আমাদের দেশে যেমন, এই দূর দ্বীপেও ঠিক তেমনই কালো

পুয়ের্তো দে লা ক্রুজ-এর সৈকতে

কুচকুচে গা, গাঢ় হলুদ রঙের জোড়া বেণী, কমলা ঠোঁট।

সমুদ্র আর পাহাড় দেখতে দেখতে ব্রেকফাস্ট শেষ হল। ইসাবেলা গেলেন গাড়ি বের করতে, আমি ক্যামেরা-ট্যামেরা নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দশ-বারো ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে বাড়ির ঠিক নিচেই রাস্তায় নেমে এলাম।

এবার পুরো ন'দিন ধরে টেনেরিফ দর্শনের পালা।

ইসাবেলার তারবার্তা

প্রথমদিন প্রথমেই আমরা টসকালের ছোট একটা সুপার মার্কেটে গেলাম। এখানে অতিথির জন্য কিছু ফল, সবজি, শুকনো খাবার ও বোতলের জল কেনা হল। আমি ভাবলাম আমারও কিছু কেনা উচিত! একটা ওয়াইন নাকি ব্র্যান্ডির বোতল নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, ইসাবেলা দেখতে পেয়ে হাতব্যাগ থেকে একটা সরু তার বের করলেন, তার হাতলটা কাঠের, আর ডগায় খুব ছোট এক টুকরো লোহা বা অন্য কোনও ধাতু আটকানো। বাঁহাতে আমার নাড়ি ধরে ডানহাতে সেই সরু তারটা বোতলের এক-আধ ইঞ্চি ওপরে ধরতেই সেটা ডাইনে-বাঁয়ে জোরে জোরে দুলতে আরম্ভ করল। পাঁচ-সাত সেকেন্ডের মধ্যে দুলুনি আরও দ্রুত হল। ইসাবেলা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, এই ড্রিঙ্ক তোমার পক্ষে ভালো নয়।

এভাবে যা-ই কিনতে যাই, সেটা আমার পক্ষে ভালো কি মন্দ সেবিষয়ে ইসাবেলার সেই তারবার্তাই শেষ কথা। কোনওটাই আমার পক্ষে ভালো নয়। শেষ পর্যন্ত, যতদূর মনে পড়ছে, একটা পাকা পেঁপে আর এক বোতল এভিয়াঁর জল আমার পক্ষে খুব ভালো বলে জানা গেল। এই দুটির ক্ষেত্রে তারের ডগাটি খুব জোরে জোরে ওপরে-নিচে দুলছিল। টোপ গেলা মাছের ছিপের মতো নিচের দিকে ও ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো ওপরের দিকে তার প্রবল ওঠানামা। ওপর-নিচে দুলুনির গতিবেগ একই।

রোমান্টিকা উনো থেকে তিন কিলোমিটার গেলেই একটা সরকারি বেড়াবার জায়গা— পুয়ের্তো দে লা ক্রুজ (Puerto De La Cruz), কালো বালির সুদীর্ঘ সৈকত। সৈকত বরাবর দীর্ঘ উদ্যান— প্লায়া খারদিন (Playa Jardin)। সৈকত ছেড়ে শহর এলাকাও ঘুরে বেড়ালাম, রাস্তার ধারে একটা বারে বসে কফি খেলাম, যতটা কফির নেশায় তার চেয়ে বেশি নানা দেশের শিল্পীদের দেখার আশায়। এখানে নাকি টেনেরিফবাসী বিদেশি শিল্পীরা আসেন। ইসাবেলা দুয়েকজনের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। তবে আজ ভিড় প্রায় নেই বললেই হয়। আসলে বছরের এই সময়টা এখানকার বিদেশিরা ইউরোপের নানা দেশে বেড়াতে যান। স্পেনের লোকেরা আসেন টেনেরিফে বা ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের অন্য কোনও দ্বীপে।

মনে মনে গোমেরা

টেনেরিফ, লা গোমেরা, লা পালমা, এল হিয়েররো, গ্রান কানারিয়া, ফুয়ের্তেভেনতুরা, লান সারোতে— এই সাতটি দ্বীপ নিয়ে আটলান্টিকের বুকে এই ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ। এর মধ্যে টেনেরিফ সবচেয়ে বড়।

গোমেরা আর গ্রান কানারিয়া আকাশ পরিষ্কার থাকলে টেনেরিফ থেকে দেখা যায়। অনেক দূরে নীল জলরাশির ওপর ঝাপসা টিলার মতো। আমিও দেখেছি কয়েকদিন। তবে বেশি দেখেছি গোমেরা। দূর থেকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেবলই মনে হয়, ওই দ্বীপের ফুল-ফল পাখি-প্রজাপতি অরণ্য পাহাড় মানুষজন ইতিহাস ভূগোল আচার অনুষ্ঠান দেখে আসতে পারলে না জানি কত আনন্দ হত!

একদিন এইরকম সান্তিয়াগো দেল টিয়েডে থেকে টেনেরিফের প্রসিদ্ধ গ্রাম

টেনেরিফের গির্জা

মাসকা যাবার পথে গোমেরা দেখতে পেয়ে ইসাবেলাকে আমার গোমেরা দর্শনের বাসনার কথা জানালাম। বেড়াবার ব্যাপারে ইসাবেলার বোধহয় অদেয় কিছুই নেই। তখনই ঠিক হয়ে গেল, যেদিন গোমেরা যেতে চাই, তার আগের দিন ইসাবেলা ওই দ্বীপের আবহাওয়ার আগাম খবর নিয়ে রাখবেন, উজ্জ্বল, পরিষ্কার আবহাওয়া না থাকলে দ্বীপটার কিছুই দেখা হবে না। আবহাওয়ার ছাড়পত্র পেলে জাহাজের খবর নিয়ে আমাদের পছন্দ ও সুবিধামতো জাহাজে চড়তে হবে। জাহাজ ধরতেও হবে সকাল-সকাল। কেননা হঠাৎ গিয়ে পড়ে গোমেরায় থাকার অসুবিধা বলে সেদিনই টেনেরিফে ফিরে আসা দরকার। তার মধ্যেই একদিনে গোমেরা ঘুরে দেখার জন্য নিজেদের গাড়ি নিয়ে যাওয়াই সুবিধের। তাছাড়া জাহাজ ছাড়বে আমি যেখানে প্লেন থেকে নেমেছিলাম দক্ষিণের সেই বিমানবন্দর ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণ-পশ্চিমে লস ক্রিস্টিয়ানোস থেকে। অতএব সকালের জাহাজ ধরতে রোমান্টিকা উনো থেকে রওনা হতে হবে ভোর বা রাত পাঁচটায়। তার মানে শয্যাত্যাগ অন্তত রাত সাড়ে চারটেয়। যদিও শয্যাগ্রহণ প্রতিদিনই মধ্যরাতের সামান্য এধারে বা ওধারে, ন'টা সাড়ে-ন'টার আগে স্বয়ং সূর্যই তো নিদ্রা যান না।

যেদিন যাবার কথা সেদিন আমি ঘুম থেকে উঠলাম সকাল সাতটায়।

ইসাবেলা ব্রেকফাস্ট সেরে তৈরি হয়ে ছিলেন, আমাকে দেখে বুয়েনস দিয়াস (সুপ্রভাত) বলে আমাকে ও সিংহমূর্তিধারী গিরগিটিকে যথারীতি ব্রেকফাস্ট দিলেন, গোমেরা প্রসঙ্গে কোনও প্রশ্নই করলেন না।

আমরা বহুদূর থেকেই পাহাড়টি দেখতে দেখতে চলেছি। যত এগোই, ততই রুক্ষ, পাথুরে হয়ে উঠছে পরিবেশ, টিয়েডেও ততই বড় দেখাচ্ছে।... বিশাল এই পাহাড়রাজ্যের কেন্দ্রে শোভা পাচ্ছেন রাজা স্বয়ং— কিং টিয়েডে। অনেকক্ষণ ধরে বসে দাঁড়িয়ে ঘুরে আমার টেনেরিফের রাজদর্শন হল।

সেদিন আমার ঘুম ভাঙেনি বললে কথাটা ঠিক হয় না, ঘুম যাতে ঠিক সময়েই ভাঙে সেইমতো আমি ঘড়িতে অ্যালার্মও দিয়েছিলাম। তারপর টেনেরিফের এমাথা থেকে ওমাথা, গোমেরার এমাথা থেকে ওমাথা ইসাবেলাকে গাড়ি চালাতে হবে, একবার নয়, দুবার করে, গাড়ি বয়ে নিয়ে যেতে হবে জাহাজে, একথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে অ্যালার্ম বন্ধ করে দিই।

তিন মাস পরেও গোমেরা যাবার জাহাজের ছবি, জাহাজ ছাড়ার সময়, লস ক্রিস্টিয়ানোস থেকে সান সেবাসটিয়ান দে লা গোমেরা পর্যন্ত সমুদ্রপথের রেখাচিত্র দেখতে দেখতে মন আমার উড়ু-উড়ু হয়। গোমেরাই টেনেরিফের সবচেয়ে কাছের দ্বীপ।

এত কাছে এসেও আমার গোমেরা যাওয়া হল না। অথচ পাঁচশো বছর আগে ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের পথে এই গোমেরায় নেমেছিলেন খাবার ও পানীয় জল নিতে।

রাজদর্শন

স্পেনের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টি টেনেরিফের প্রায় মধ্যস্থলে। নাম টিয়েডে বা তেইদে। টেনেরিফের অধিবাসীরা বলে, রাজা টিয়েডে বা রেই তেইদে। দীর্ঘ পাহাড়ি পথ পেরিয়ে পৌঁছতে হয়। রুক্ষ পাহাড়ি পথ কোথাও আদিম অরণ্যের মধ্য দিয়ে, কোথাও রাস্তা আটকে চরে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘের দল।

টিয়েডের পথে

টিয়েডের কাছে পাহাড়ি প্রান্তর

টিয়েডে পর্বতের উচ্চতা আমাদের দক্ষিণ সিকিমের মৈনাম পাহাড়ের মতোই, ১২,০০০ ফুটের সামান্য বেশি। রাজা টিয়েডে টেনেরিফের সর্বাধিনায়ক বললেই বোধহয় ঠিক হয়। টেনেরিফের সর্বজনমান্য প্রতীকচিহ্ন।

আমরা বহুদূর থেকেই পাহাড়টি দেখতে দেখতে চলেছি। যত এগোই, ততই রুক্ষ, পাথুরে হয়ে উঠছে পরিবেশ, টিয়েডেও ততই বড় দেখাচ্ছে।

এক সময় যেন পুরোপুরি পাহাড়ের রাজ্যে এসে পৌঁছলাম। কাছে দূরে সর্বত্র ছোট বড় মাঝারি পাহাড়ের অগোছাল প্রদর্শনী। তার মধ্যেই অদ্ভুতদর্শন কতগুলো ক্যাকটাস।

বিশাল এই পাহাড়রাজ্যের কেন্দ্রে শোভা পাচ্ছেন রাজা স্বয়ং— কিং টিয়েডে। অনেকক্ষণ ধরে বসে দাঁড়িয়ে ঘুরে আমার টেনেরিফের রাজদর্শন হল।

মঙ্গলগ্রহে পাগল

ঘুরতে ঘুরতে একটা পাহাড়ের কিনারে চার-পাঁচটি সেই অদ্ভুত দর্শন গাছের একটি সমাবেশ দেখিয়ে ইসাবেলা বললেন, এখানে আমি মাঝে মাঝে রাতে এসে শুয়ে থাকি। এই গাছ, পাহাড় আর তারা ভরা আকাশের সঙ্গে।

রাতে মানে, শুনলাম, সারা রাত।

আরও পরে আরেকটা পাহাড়ের কাছে গাড়ি থামিয়ে পাহাড় বেয়ে বেশ খানিকটা ওপরে উঠে গিয়ে বললেন, এটা একটা অ্যাম্ফি থিয়েটার, ভগবানের তৈরি, এখানে আমি বন্ধুদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার কনসার্ট করেছি। বাখ, বেঠোফেন, মোৎসার্ট, স্ট্রাউসের বেশ কিছু সংগীত এখানে যদি শুনতে তো বুঝতে এইরকম পাহাড়িয়া মুক্তমঞ্চে বাজানোর জন্যই সেগুলো রচনা করা হয়েছে।

কনসার্টও সারা রাত্রিব্যাপী কি না সাহস করে সেটা আর জিজ্ঞেস করিনি। একে তো এই জায়গাটাকেই আমার অজ্ঞান অনভিজ্ঞ চোখে মঙ্গলগ্রহের মতো মনে হচ্ছে, তার ওপর সম্পূর্ণ জনবসতিহীন এলাকায় পাহাড়ের খাঁজে কনসার্টের কথা শুনে ক্ষীণ সন্দেহ হয়— পাগল নয় তো? তখনও বুঝিনি টেনেরিফ তাঁর ঘুমে-জাগরণে স্বপ্নে স্মৃতিতে মিশে গেছে। একটা দ্বীপ বা বাসভূমি কারও ওপর এভাবে ভর করতে পারে, ইসাবেলাকে টেনেরিফে না দেখলে আমার বিশ্বাস হত না।

লাভা লাভ

বিকেলে ফেরার পথে দীর্ঘ লাভাক্ষেত্র পেরতে

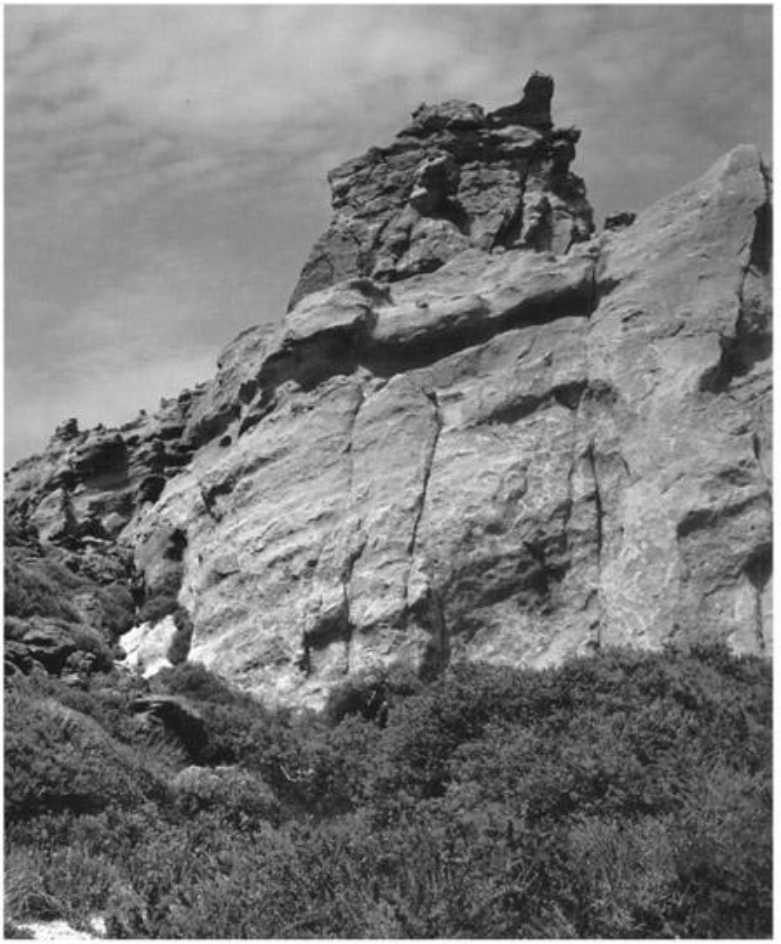

রাজা তেইদের পাহাড়ি রাজ্য

হল। বাঁদিকে বহু দূর পর্যন্ত শুকনো ধূসর লাভা, ডানদিকে টিয়েডে পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত লাভার স্তূপ, মাঝখান দিয়ে আমাদের আদিগন্ত ধানখেত চিরে চলে যাওয়া পথের মতো লাভাক্ষেত্র চিরে চলে গেছে পিচ বাঁধানো, মসৃণ, লাভার মতোই কালো রাস্তা। দুশো বছর আগে রাজা টিয়েডে ভয়ানক ক্রোধে আমাদের শিবঠাকুরের চোখ দিয়ে আগুন নিক্ষেপ করার মতো শিরোদেশ দিয়ে জ্বলন্ত গলানো লাভার প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন।

মাইলের পর মাইল এক দৃশ্য। তার মধ্যেই এক সময় দেখা গেল লাভার মরুভূমির বুকেই কোথাও কোথাও বনসৃজনের চেষ্টা। গাড়ি থেকে নেমে বিস্তীর্ণ এবড়োখেবড়ো লাভাক্ষেত্রের ওপর হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, পৃথিবীর হৃদয় থেকে উঠে আসা এই লাভাস্তূপের কোথাও হয়তো আজও পৃথিবীর হৃদস্পন্দন রয়ে গেছে। তা না হলে, যত অল্পই হোক আর যত আয়াসেই হোক, বন সৃষ্টি হচ্ছে কী করে!

এক টুকরো লাভা যত্নে কুড়িয়ে নিই।

৫

ক্যানারিকন্যার উৎসব বর্ণনা

ক্যানারিয়ান মানুষ খুবই অতিথিবৎসল। খোলা মনের সহৃদয় মানুষ, নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ প্রবল।

আমাদের পাশের অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন ইসাবেলার বন্ধু এক স্কটিশ ভদ্রলোক, বয়েস ৬৫ বা ৬৮, খুবই নিষ্ঠাবান স্কটিশ, স্কচ ছাড়া কিছু ছোঁন না, রোজ সন্ধেবেলা একটি পুরো বোতল আনন্দে ও অনায়াসে গলাধঃকরণ করেন। তিনি মাস কয়েকের জন্য দেশে যাবেন। তাঁর সদ্য বিবাহিতা ৬৫ বা ৬৮ বছর বয়সী দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী অথবা ভাবী পত্নীকে নিয়ে ফিরতে মাস ছয়েক তো হবেই, সেইজন্য তাঁর ফ্ল্যাটটা একবার করে, অথবা হয়তো দুবেলাই, এসে দেখে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন এই গ্রামেরই একটি মেয়েকে। ঠিক বুঝিনি, হয়তো রাতে মেয়েটিকে এসে থাকতেও হয়। হয়তো কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। মেয়েটি ইসাবেলার অনেক দিনের চেনা। এই গ্রামের নিচের দিকে কোথাও থাকে। নাম মনসেরাত মারেরো পেরেস। সকালে বাইরে বসে আমরা যখন ব্রেকফাস্ট করি সেই সময় মেয়েটি হয় আসার পথে বা যাওয়ার পথে ইসাবেলাকে ও আমাকে বুয়েনস দিয়াস বলে যায়। প্রথমদিন ইসাবেলা আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন লেখক বলে। মনসেরাত সামান্য দাঁতে চেপে ইংরিজি বলে কিন্তু খুব স্পষ্ট উচ্চারণ। টেনেরিফে কলেজের পড়া শেষ করে স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডন থেকে ইংরিজি শিখে এসেছে।

সেদিন আমরা যাব টেনেরিফের প্রাচীন শহর ওরোতাভা দেখতে। হাতে সময় ছিল না। মনসেরাতের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপেই আমি তার আন্তরিকতা ও সংস্কৃতির গর্ব টের পেয়ে তাকে অনুরোধ করি ক্যানারিয়ানদের সারা বছরের প্রধান প্রধান উৎসবের বিষয়ে সে আমাকে লিখে দিতে পারে কি না। তাহলে আমি টেনেরিফ নিয়ে লেখার সময় ক্যানারিয়ান উৎসবের কথা যোগ করতে পারি।

মনসেরাত প্রায় আনন্দে লাফিয়ে উঠে রাজি। আমিও ধন্যবাদ জানিয়ে, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আমার সবে ধন নীলমণি 'শাদা ঘোড়া'র ইংরিজি সংস্করণটি তাকে উপহার দিলাম।

এরপর বেশ কয়েকদিনই মনসেরাত নাকি টেনেরিফের উৎসব নিয়ে তার লেখা সহ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, আমরা তখনও ফিরিনি দেখে ফিরে গেছে। লেখাটা বাইরের লেটার বক্সে দিয়ে যায়নি, তার কারণ আমাকে ও নিজে একবার পড়ে শোনাতে চায়, আমি যদি ক্যানারিয়ান রীতিনীতির সব কথার মানে বা হাতের লেখা সব জায়গায় বুঝতে না পারি! তাছাড়া আমার সঙ্গে দেখা হওয়া আরও একটা কারণেও দরকার। ওর ভাইবোনদের শোনাবার শাদা ঘোড়া ও কি ক্যানারি ভাষায় অনুবাদ করতে পারে? আমার কি তাতে আপত্তি আছে? বইটা ওর খুব ভালো লেগেছে।

আমি মজা করে বললাম, সামনের জন্মে ক্যানারি পরিবারে জন্ম নিয়ে ক্যানারি ভাষায় গল্প লিখব, তাহলে আর অনুবাদের দরকার হবে না।

ইসাবেলা পঞ্চমুখে মেয়েটির প্রশংসা করলেন, ক্যানারিয়ানরা তাঁর অতি প্রিয়, পথে পাহাড়ে সৈকতে রেস্তোরাঁয় ক্যানারিয়ান

দেখলেই তাদের সহৃদয়তা আর সারল্যের গুণ তিনি গাইবেনই। মনসেরাত অবশ্য ইসাবেলার ব্রেকফাস্টের নিমন্ত্রণ ধন্যবাদের সঙ্গে ফিরিয়ে দিল, আজ তার একটু তাড়া আছে।

সেদিন আমাদেরও তাড়া ছিল, সেদিন যাবার কথা আলমাসিগা। টেনেরিফে প্রথম এসে ইসাবেলা সেখানেই থাকতেন, তিনি যদি এ-জীবনে যথার্থ কিছু শিখে থাকেন, আলমাসিগাতেই শিখেছেন, যাঁর কাছে শিখেছেন তাঁর সেই শিক্ষকের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দেবেন আলমাসিগায়। আলমাসিগাতেই প্রথম বার টেনেরিফবাসের সময় একদিন সারাদিন পাহাড়ের কিনারে বসে ধ্যান করার পর উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে অনেক নিচে পড়ে গিয়েছিলেন। মাসের পর মাস জ্ঞানহীন, প্রায় প্রাণহীন, প্রাণ ফিরে পাবার আশাহীন অবস্থায় ছিলেন হাসপাতালে। আলমাসিগা দেখেই তিনি টেনেরিফের প্রেমে পড়েন, বলা যায় আলমাসিগাই যাদু করে বার্লিন থেকে তাঁকে টেনেরিফে টেনে আনে।

আলমাসিগা থেকে ফিরে গিয়ে বার্লিনের বাস উঠিয়ে পাকাপাকি চলে আসেন টেনেরিফে। একা গাড়ি চালিয়ে স্পেন থেকে গাড়িসুদ্ধ তিন দিন জাহাজে কাটিয়ে পৌঁছন তাঁর প্রাণের প্রিয় টেনেরিফে, তাঁর প্যারাডাইসে।

মনসেরাত শুধু রেয়ালেখসের উৎসবগুলোর বিবরণ লিখে এনেছিল, সে রেয়ালেখসের মেয়ে, ছোটবেলা থেকে সেখানকার উৎসবই দেখেছে। মনসেরাতের মতে শুধু টেনেরিফেই না, সমগ্র স্পেনে সবচেয়ে বেশি পালাপার্বণ হয় এই রেয়ালেখসে। লেখাটি আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়ে উৎসবের তিনটি ছবি দিয়ে যাবার সময় বলে গেল, আমাদের এই দ্বীপের কথা যেখানে লিখবে সেটা ছাপা হলে আমাকে এক কপি পাঠালে খুব খুশি হব।

লাভা-পাহাড়ের ফুল

অনেক দিন আগে ওরোতাভায় বারোটি ধনী ক্যানারিয়ান পরিবার বাস করতেন, তাঁরাই ছিলেন ওরোতাভা উপত্যকার মালিক। শহরটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে এখনকার পুয়ের্তো দে লা ক্রুজ তখন এই শহরেরই বন্দর ছিল। সে যুগে অকূল সমুদ্রের দূরগামী পালতোলা জাহাজ এপথে যাবার সময় ওরোতাভা থেকে খাদ্য পানীয় জল ইত্যাদি সংগ্রহ করত।

পুরনো শহর, পুরনো সভ্যতা আমাকে

ওরোতাভার বিশাল পুরসভা-প্রাঙ্গণে লাভাগুঁড়ো আর পাহাড়গুঁড়ো দিয়ে কয়েকজন ক্যানারিয়ান যুবক মস্ত মস্ত কার্পেট আঁকছেন। শুনলাম এবছরের কার্পেট একই সঙ্গে আধুনিক ও চিরায়ত রূপ পাবে। কার্পেটের মধ্যে মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো অমর শিল্পীদের সৃষ্টির পুনঃসৃষ্টি দেখা যাবে। এ সবই বিখ্যাত করপাস ক্রিস্টি উৎসবের জন্য।

সব সময়ই টানে। মনে হয় চলে যাওয়া সময়ের চলন্ত যাদুঘর দেখছি। কত কাল আগের কত মানুষের সাধ-আহ্লাদ স্বপ্ন-সংগ্রাম আশা-নিরাশা নির্মাণ নিষ্ঠা প্রাচীন রাস্তাঘাটে, পুরনো প্রাসাদ-অট্টালিকার স্থাপত্যে, ইট কাঠ পাথরে গাঁথা হয়ে আছে, ঘুরে ঘুরে দেখি, কখনও মন ভার হয়, কখনও কৌতূহল তীব্র হয়। ওরোতাভার কাঠের জালি ও নকশাদার বহুতল বারান্দাবহুল পুরনো অট্টালিকাগুলি দেখে নেপালের কাঠের বৃহদাকার জানলার কথা মনে আসে।

ওরোতাভার বিশাল পুরসভা-প্রাঙ্গণে লাভাগুঁড়ো আর পাহাড়গুঁড়ো দিয়ে কয়েকজন ক্যানারিয়ান যুবক মস্ত মস্ত কার্পেট আঁকছেন। শুনলাম এবছরের কার্পেট একই সঙ্গে আধুনিক ও চিরায়ত রূপ পাবে। কার্পেটের মধ্যে মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো অমর শিল্পীদের সৃষ্টির পুনঃসৃষ্টি দেখা যাবে। এ সবই বিখ্যাত করপাস ক্রিস্টি উৎসবের জন্য। একদিনের উৎসব, পরদিনই ক্যানারিদের এই বিশাল সমবেত শিল্পকর্ম মুছে ফেলা হবে।

ওরোতাভায় সেদিন সন্ধেবেলা পুরনো দিনের মোহময় কিন্তু নতুনের মতো ঝকঝকে এক বিশাল অট্টালিকায় একজন বিখ্যাত ক্যানারিয়ান শিল্পীর চিত্রপ্রদর্শনী দেখলাম অনেকক্ষণ ধরে। বাড়িটি ৬, প্লাজা দে লা কন্সতিতিউসিওন-এ। শিল্পীর নাম ওসমান। ছবিতে টেনেরিফের নিসর্গ ঘর বাড়ি মানুষ আর নিকটস্থ সাহারা অঞ্চলের রূপ রং আমাদের দুজনেরই ভালো লাগল, যদিও, ইসাবেলা বললেন, তিনি নিজে ওসমানের মতো বাস্তবধর্মী কাজ বিশেষ করেন না। ওসমান তাঁর একটা ছবির প্রিন্টে আমার নাম লিখে ইংরিজিতে তাঁর শুভেচ্ছা জানালেন।

শিল্পীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিশাল সেই অট্টালিকা ছেড়ে আরও বহুগুণ বড় একটা বিস্ময়কর রেস্তোরাঁরাজ্যে ঢুকে আমি তো হতবাক। বিশাল বাগান, প্রাচীন সব বৃক্ষের নিচে বসবার আসন, রাতেও রাজহাঁসের দল চড়ে বেড়াচ্ছে, মস্ত মস্ত দালান, ঘরের পর ঘর, সব জায়গায় এলাহি ব্যাপার। দৃষ্টিনন্দন ও মনমাতানো তো বটেই। মনে হয় যেন নন্দনকাননের ভোজসভায় ঢুকে পড়েছি। নামটিও সুন্দর— মোনোসটেরিয়ো।

৬

রাস্তায় রাস্তায় রঙিন কার্পেট

ওরোতাভায় করপাস ক্রিস্টি উৎসবের কার্পেট তৈরি হতে দেখে এসেছি, শেষ দেখা হয়নি, উৎসবও দেখা হবে না, কেননা উৎসবের দিন পড়েছে আমার টেনেরিফ ছেড়ে যাওয়ার সাত দিন পরে। সে দুঃখ ভুলে গেলাম টেনেরিফের বিশ্ববিদ্যালয়-শহর লা লাগুনায় গিয়ে। যে রাস্তায়ই যাই, শুধু কার্পেট আর কার্পেট। পশমের কার্পেটের মতো বিস্ময়কর বহুবর্ণ নকশা। সেইসব নকশায় বোনা কথা ও কাহিনী বোঝবার মতো ক্যানারিয়ান ধর্মজ্ঞান পুরাণজ্ঞান জীবনবোধ আমার কোথায়? শুধু চোখের দেখাতেই মন টইটম্বুর, হৃদয় পূর্ণ। যত দেখি, কার্পেটও ফুরোয় না, দেখাও যেন শেষ হয় না। শুনলাম ছোটবড় সকলেই আজ ভোর পর্যন্ত এইসব কার্পেট এঁকেছে। ফুলের পাপড়ি দিয়ে, পাথরগুঁড়ো দিয়ে। একুশে ফেব্রুয়ারির আগের দিন ঢাকার রাস্তায় ছাত্র-ছাত্রীদের আলপনা দেওয়া দেখেছি, সেও কিছুটা এইরকম, তবে এরা আঁকে বিশাল বিশাল কার্পেট, তরল রং দিয়ে নয়, ফুলের পাপড়ি, পাথরগুঁড়ো, লাভার ধুলো দিয়ে। সমস্ত রাস্তা জুড়ে। এরই মধ্যে একসময় শুরু হল বর্ণাঢ্য ধর্মীয় শোভাযাত্রা এইসব বিস্ময়কর কার্পেট মাড়িয়ে।

ভাগ্যগুণে আমি লাগুনায় করপাস ক্রিস্টি উৎসবে সামিল হতে পারলাম।

রাস্তায় রঙিন কার্পেট

ক্যানারিয়ানদের এটা একটা মস্ত বড় পরব।

ফেরার পথে কোথাও কোনও কাফে বার রেস্তোরাঁর দেখা নেই, এদিকে বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, প্রায় ঘণ্টাখানেক গাড়ি চালিয়ে একটা ভিড়ের রাস্তার ধারে এল মোলিনো নামে একটা ছোট রেস্তোরাঁ পেয়ে ইসাবেলা গাড়ি পার্ক করলেন। আমি পিৎসার ভক্ত নই এবং সাজসজ্জাহীন ছোট রেস্তোরাঁয় খেতে আমার কোনও অসুবিধা নেই— এই দুটো তথ্য কেন পথে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া হয়েছে, এখানকার পিৎসা এক টুকরো মুখে দিয়েই আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। এরকম পিৎসা আমি রোম ফ্লোরেন্স ভেনিস কোথাও খাইনি। ইসাবেলার মতে, এখানকার পিৎসা বিশ্বের সেরা পিৎসা। পিৎসার সঙ্গে পানীয় ছিল এক গ্লাস ক্যানারিয়ান ভিনো তিনতো অর্থাৎ এই দ্বীপের লাল মদ।

এখান থেকে গেলাম কফি খেতে। উদ্দেশ্য, আমাকে প্রাচীন ক্যানারিয়ান ফিংকা দেখানো। ফিংকা মানে ধনবান লোকের খামারবাড়ি। এখন সেখানে মস্ত রেস্তোরাঁ। চমৎকার সাজানো গোছানো ঘর বারান্দা হলঘর উদ্যান ছাপিয়ে চোখে পড়ে এঘরে ওঘরে, দালানের কোণে, সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে, ধাপের পাশে দেওয়াল ঘেঁসে দৈত্যাকার ফল স্তূপাকারে রাখা আছে।

একেকটা ঘরে, হলঘরে, বারান্দায় একেকরকম বসার ব্যবস্থা। কোথাও শুধু দুজনের মতো সোফা সেট, সামনে পিয়ানো, কোথাও চার-ছজনের টেবিল, কোথাও আরও বেশি অতিথি একসঙ্গে বসে খেতে পারেন। সব ঘর থেকেই ঘণ্টা বাজিয়ে সুদর্শন সুসজ্জিত পরিচারক পরিচারিকা ডাকতে হয়। এখানে এক গ্লাস ওয়াইন বা বিয়ার বা মিনারেল ওয়াটারও কিছুটা মহার্ঘ। অতিথিদের জন্য কনসার্টের ব্যবস্থা আছে।

এ যেমন একটা দুর্মূল্য কফিপানের অভিজ্ঞতা, তেমনই আমাদের পাড়ার একটা ছোট কাফে-বারের অভিজ্ঞতাও মনে রাখার মতো। বারটির নাম 'বার এল পারায়িসো', বাংলায় প্যারাডাইস বার। সারাদিন দূরে দূরে ঘুরে রাতে ফেরার পথে এখানে আমরা বার দুয়েক এক গ্লাস বিয়ার বা ওয়াইন সহযোগে তাপাস দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছি। তাপাস পুরো ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জেই অতি প্রিয় খাবার। একটু মাছভাজা বা আলু সেদ্ধ ডিম আর পেঁয়াজ বা কড়াইশুঁটি বা পাপরিকা বা দুয়েক টুকরো মুরগির ঝোল— অর্থাৎ অল্প পরিমাণ টুকটাক খাবার। সঙ্গে এক গ্লাস বিয়ার বা ওয়াইন। মাদ্রিদেও তাপাসের খুব চল দেখেছি। ক্যানারিয়ান দ্বীপপুঞ্জ যেহেতু স্পেনের অধীন, ফলে তাপাস মাদ্রিদ থেকে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে এসেছে, না দ্বীপ থেকে স্পেনে গেছে জানি না।

৭

আনাগা টাগানানা

একদিন লা লাগুনা ছাড়িয়ে চলে গেলাম আনাগা পাহাড়ে। লাউরেস সিলভা নামে একটা আদিম অরণ্যে ঢুকে দ্বীপটার প্রাচীনতার আঁচ পাওয়া যায়।

অরণ্যের এত ভেতরে চলে গিয়েছিলাম যে ফেরার পথ আর কিছুতেই খুঁজে পাই না। এতদিন ধরে টেনেরিফের এত অরণ্যে পাহাড়ে ঘুরছি, ইসাবেলা এই প্রথম দেখলাম সামান্য দিশাহারা। আসলে এই অরণ্যের গভীরে খুব একটা আসা হয় না, তাছাড়া এখানে কোনও দিন সারা রাত শুয়ে থাকা হয়নি বলেও হয়তো অরণ্যপথ তাঁর পক্ষে কিছুটা বিদেশি ও বন্ধুর হয়ে উঠেছিল।

এখান থেকে মাউন্ট মার্সেডেস আর ক্রুজ দে কারমেন হয়ে চলে গেলাম টাগানানা। আনাগা, টাগানানা ভূগোলের এইসব সা রে গা মা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি টিয়েডে মহারাজার গামলার মতো মাথা। বা হয়তো আমাদের অনতি অতীতের

নেমন্তন্নবাড়ির মাটির উনুনের মতো।

টাগানানা থেকে বাঁদিকে আদিম সমুদ্রসৈকত আর ডানদিকে পুরাকালের পাহাড় প্রান্তর ছুঁয়ে রাস্তা চলে গেছে আলমাসিগা।

আলমাসিগার কাছাকাছি পৌঁছে ইসাবেলা বললেন, একটু পরেই পাহাড়ের কোলে ডানদিকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখতে পাবে, আমার আলমাসিগার বন্ধু, তার সঙ্গে দেখা হলে আমাকে গাড়ি থামাতেই হবে, অনেকদিন পরে দেখা হবে তো, ফলে বেশ কিছুক্ষণ কথা হবে। আমাদের এখন অত সময় নেই। আমি তাই একটু জোরে গাড়ি চালিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যাব।

একটু পরেই নিমেষের জন্য ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম, মনে হল গাড়িটা সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাবার ঠিক পরের মুহূর্তে ইসাবেলাকে এক ঝলক দেখতে পেয়েছেন। আরও অনেকটা এগিয়ে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। আমাদের বাঁয়ে সন্ধ্যার সমুদ্র, ডাইনে রোদজ্বলা পাহাড়।

শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ

ইসাবেলা সমুদ্রের মধ্যে অনেকটা দূরে একটা পাথরের ওপর বসে থাকা একজনকে দেখিয়ে বললেন, ওই দ্যাখো আমার শিক্ষক, সব সময় সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে আছেন। কখন ঘুমোন জানি না! জীবনে যা কিছু শিখেছি সব এই আলমাসিগায়, ওই শিক্ষকের কাছেই।

মানুষটিও যে আসলে একটা প্রস্তরখণ্ড সেটা বুঝতে আমার কিছুক্ষণ সময় লাগল।

বুঝতে পেরেছি বুঝে ওই মহান শিক্ষকের ছাত্রীটি বললেন, চারদিকে উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে ওইরকম স্থির হয়ে বসে থাকাই তো জীবনের আসল শিক্ষা। যতদিন আলমাসিগায় ছিলাম, দিনের পর দিন ওই পাঠ নেবার চেষ্টা করেছি। আসলে আলমাসিগা জায়গাটাই এইরকম। সমুদ্র, পাহাড়, আকাশ আর তাদের অপরূপ রংবদল আর এই নিষ্কলুষ নির্জনতায় তুমি নিজেকে খুঁজে পাবে। সেটাই তোমার প্রতিদিনের শিক্ষা, আলমাসিগা তারই মহাগ্রন্থ। তবে, জানো তো, আমার এক ভাই একবার এখানে আমার কাছে বেড়াতে এসেছিল, থাকতে পারল না, বলল, এখানে সাত দিন থাকলে আমি পাগল হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেব।

ইসাবেলা যে জীবন সম্পর্কে অনেক ভেবেছেন, পড়েছেন, সেটা নানা বিষয়ে তাঁর কথা থেকে বোঝা যায়। লক্ষ করলাম, তাঁর শিক্ষক যত অদ্ভুতই হোক, তাঁর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা বিষয়ে ইসাবেলা যখন বলছিলেন, তাঁর কথার মধ্যে সামান্য পরিহাস বা কৌতুকের ছোঁয়া ছিল না।

সমুদ্রের ওপর আকাশে মনে হল মহাযুদ্ধ চলছে। ডাইনে-বাঁয়ে কয়েক মাইল আকাশটা আড়াআড়িভাবে দু-টুকরো হয়ে গেছে। ওপরের অর্ধেক আকাশ থেকে ভয়াবহ তীব্র আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নিচে মহাসমুদ্র তখন রং বদলাচ্ছে, গাঢ় থেকে আরও গাঢ়।

সেদিন আমরা সান আন্দ্রে ছুঁয়ে আমাদের টসকাল লঙ্গুয়েরা গ্রামে যখন ফিরে এলাম, তখন টেনেরিফের ঘড়িতে রাত বারোটা।

৮

বারান্দায় সুরাপান

একদিন আটলান্টিকের ধারে প্রাচীন একটা ফিংকায় এল মুজিয়ো দে ভিনো বা মদ্য মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। টেরাকোটা রঙের যাদুঘরটির নাম বারান্দা। এখানে ক্যানারিয়ান ওয়াইনের স্বাদ গন্ধ ইতিহাস বংশকৌলীন্য সবই সযত্নে ধরা আছে। অনেকগুলো ঘরে চমৎকারভাবে সাজানো সারি সারি সুরা। কোনও কোনও সুরা সম্পর্কে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক ব্যক্তির মূল্যবান মন্তব্য, প্রশংসাপত্র ইত্যাদিও সাজানো আছে।

মদের যাদুঘরে এসে মদ না চাখা বিশ্রী বেরসিকতা। একেকটা সুরার ইতিহাস শুনে চাখতে চাওয়া মাত্র একটি মেয়ে ছোট পাত্রে একটুখানি ওয়াইন এগিয়ে দেবে। আমরা বোধহয় তিন-চার রকম ক্যানারিয়ান ওয়াইন চাখলাম। শুধু একটু চাখার জন্য বলে এক্ষেত্রে ইসাবেলার তারের সম্মতি নিতে হল না। তবে লাভার গন্ধ আছে কি না সেটা তিনি দু-তিনবার শুঁকে নিশ্চিন্ত হয়ে নিলেন। এমনিতে ক্যানারিয়ান যে কোনও জিনিসের মতো ইসাবেলা ক্যানারিয়ান ওয়াইনেরও প্রশংসা করেন, এখানকার দ্রাগো গাছের নামের বিয়ারটি তাঁর অতি প্রিয়, তবে দুয়েকটা ওয়াইনে নাকি লাভার গন্ধ পাওয়া যায়।

যাইহোক দু-চার ঝিনুক সুরা পানের জন্য যে পরিমাণ পেসেতা দিতে হল, প্রাচীন ওই ফিংকাটি ঘুরে ঘুরে দেখার দক্ষিণা হিসাবে সেটা কিছুই না। শুধু সুরার স্বাদ নয়, সাজাবার রুচি ও বাড়ির অবস্থান ও স্থাপত্যের তারিফ না করে উপায় নেই।

সান্তা ক্রুজে এক বেলা

টেনেরিফের রাজধানী হল সান্তা ক্রুজ। এখান থেকে জাহাজে গ্রান কানারিয়া যাওয়ার সুবিধা।

সান্তা ক্রুজের রাস্তায় দেখলাম দুজন প্রৌঢ়া সিন্ধি মহিলা চলেছেন মাতৃভাষায় গল্প করতে করতে। আমাকে ভারতীয় দেখে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। বললেন, টেনেরিফ খুব সুন্দর জায়গা, রাত দশটা এগারোটাতেও একা একা নিশ্চিন্তে রাস্তায় ঘোরা যায়। এঁদের স্বামীপুত্ররা অনেক বছর ধরে এখানে ব্যবসা করছেন, নানারকম জিনিসের দোকান আছে এঁদের। এখানকার আবহাওয়াও চমৎকার, গরমের কষ্ট নেই, সারা বছরই না খুব শীত, না খুব গরম, ইত্যাদি।

ইসাবেলাকে সংক্ষেপে ওঁদের টেনেরিফস্তুতি জানাতে, বললেন— এখানে ভারতীয় দোকান অনেক আছে, শহরের কেন্দ্রে ও যে কোনও বাণিজ্য এলাকায় কয়েকটি ভারতীয় দোকান তুমি পাবেই। আর মানুষ হিসেবেও এরা ভালো।

ভারতের বাইরে ভারতীয়দের প্রশংসা শুনে ভারি ভালো লাগল।

সান্তা ক্রুজে নতুন ফিলামোনিক, পুরনো শহর, পুরনো ও নতুন স্থাপত্য ও সৈকত ও সৈকত সংলগ্ন কৃত্রিম সৌন্দর্য সৃষ্টি দেখে চলে আসি এসপানিয়া বন্দরে।

সামনেই সমুদ্র। জাহাজ যাচ্ছে দূর দিয়ে, তীরেও নোঙর করে আছে কয়েকটা।

বন্দরের কাছে সান্তা ক্রুজের সবচেয়ে পুরনো বার-এ একজন এক গ্লাস দ্রাগো নিয়ে আরেকজন এক গ্লাস মিনারেল ওয়াটার নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম। এমনিতে কোনও নতুন জায়গা দেখতে এসে ইসাবেলার অনর্গল ভাষ্য শুনতেই আমি অভ্যস্ত, কিন্তু এখানে তিনিও বাক্যহারা। হয়তো সন্ধ্যার সমুদ্র, কিংবা জাহাজের চলে যাওয়া বা হয়তো এই দ্বীপলগ্ন তাঁরই কোনও জীবনস্মৃতি তাঁকে নীরব করে রেখেছিল।

আটলান্টিসের সন্ধানে

টেনেরিফের সমুদ্র উপকূলে, পাহাড়ের পাদমূলে, পর্বতগাত্রে, প্রাচীন অট্টালিকায় সর্বত্র পরিবেশের সঙ্গে মানানসই কাফে-বার।

যেদিন টিয়েডে দর্শনে গিয়েছিলাম সেদিন 'পারাদর দেল টিয়েডে' অর্থাৎ টিয়েডে পাহাড়ের প্যারাডাইসে সামান্য কফি আর আলুভাজা অসামান্য আনন্দের হয়ে উঠেছিল। ঘণ্টায় এক-দেড়শো কিলোমিটার গতিতে ওরোতাভা উপত্যকা হয়ে কানারা

প্লায়া আরেনায় মাছের রেস্তোরাঁ

ন্যাশনাল পার্কের মধ্য দিয়ে পর্বতরাজের লাভাক্ষেত্র পার হয়ে টিয়েডের প্যারাডাইসকে সেদিন স্বর্গরাজ্যই মনে হয়েছিল। ফেরার সময় মূল রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে বিপজ্জনক উতরাই বেয়ে অনেক দূর চলে যাই মাসকা গ্রামটি দেখব বলে। মাসকা থেকে ফিরতি পথে এরখস, এল তাংখে, ইকোদ দে লোস ভিনোস দেখে নিই। ইকোদ দে লোস ভিনোসে একটা মস্ত ঝাড়ওলা দ্রাগো গাছ আছে, নানাজনের কাছে শুনেছি এটা হাজার বছরের প্রাচীন। একদিন হঠাৎ একটা বইয়ে দেখলাম, ওই গাছটির বয়স নাকি তিন হাজার বছর।

দুপুরে পর্বতরাজের প্যারাডাইসে লাঞ্চ হয়েছিল, সন্ধ্যায় সান মার্কো বন্দরে সৈকত সংলগ্ন রেস্তোরাঁয় প্রসিদ্ধ একটি ক্যানারিয়ান পদ টর্টিয়া দিয়ে ডিনার সারা হল। টর্টিয়াও আদতে ক্যানারিদের, না স্পেনীয়দের জানি না। মশলাহীন আলুসেদ্ধ ডিমসেদ্ধ ও পেঁয়াজ একসঙ্গে মিশিয়ে অনেকটা ছোট কেক বা সাবানের আকারে পরিবেশন করা হয়।

পরদিন যে কাফেতে গেলাম সেটা আসলে মাছভক্তদের মহাফেজখানা। জায়গাটার নাম প্লায়া আরেনা। রেস্তোরাঁর মধ্যেই পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামছে, ঝরনা থেকে এঁকেবেঁকে জলের শাখা প্রশাখা বয়ে চলেছে, জলাধারে জ্যান্ত সব মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাদ্যতালিকায় রকমারি মাছের পদ। মাছ ধরার বিরাট জাল দিয়ে রেস্তোরাঁর ছাদ হয়েছে।

আমরা মাছের মচ্ছবে যোগ না দিয়ে কফি নিয়ে বসলাম।

সমুদ্র দেখতে দেখতে, সমুদ্রের হাওয়ায় ভেসে যেতে যেতে কফি শেষ করে আমরা সমুদ্র ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। রেস্তোরাঁ পর্যন্ত গাড়ির রাস্তা ছিল না। ফলে বেশ দূরে রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করতে হয়েছিল। গাড়ি সেখানেই রইল। আমরা ক্রমশ ঝোপঝাড়, উঁচু টিলা নিচু গর্ত, হঠাৎ হঠাৎ ক্যাকটাস পেরিয়ে পুরোপুরি ক্যাকটাসের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছি। সমুদ্র কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনও চোখের আড়ালে। আমি ভাবছি হয়তো আরও কোনও বিচিত্র কাফে-বারে যাচ্ছি, কিন্তু চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত দেখে স্পষ্ট বুঝলাম যে এখানে কোনও কাফে-বার কেন মানুষের জন্য মানুষের তৈরি কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। যত দূরেই তাকাই, মানুষের ছায়াও কোথাও দেখা গেল না।

টিলা গর্ত ক্যাকটাসে সামান্য জখম ও কিছুটা ক্লান্তও হয়েছিলাম। ইসাবেলা অনেকটা এগিয়ে, হনহন করে হেঁটেই চলেছেন, হঠাৎ পিছন ফিরে আমাকে

পরদিন যে কাফেতে গেলাম সেটা আসলে মাছভক্তদের মহাফেজখানা। জায়গাটার নাম প্লায়া আরেনা। রেস্তোরাঁর মধ্যেই পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামছে, ঝরনা থেকে এঁকেবেঁকে জলের শাখা প্রশাখা বয়ে চলেছে, জলাধারে জ্যান্ত সব মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাদ্যতালিকায় রকমারি মাছের পদ। মাছ ধরার বিরাট জাল দিয়ে রেস্তোরাঁর ছাদ হয়েছে।

ক্যাকটাসের জঙ্গল

আমরা ক্রমশ ঝোপঝাড়, উঁচু টিলা নিচু গর্ত, হঠাৎ হঠাৎ ক্যাকটাস পেরিয়ে পুরোপুরি ক্যাকটাসের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছি। সমুদ্র কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনও চোখের আড়ালে।

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চেঁচিয়ে বললেন, আরেকটু এগোলেই আমরা পৌঁছে যাব, চলে এসো, আর একটু মাত্র পথ!

যতটা সম্ভব দূরত্ব কমিয়ে এনে জানতে চাইলাম, আমরা কোথায় চলেছি, পৌঁছব কোথায়?

আটলান্টিসে!

আমি তো অবাক। টেনেরিফ আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে বলে আটলান্টিস সভ্যতার ধ্বংসাবশেষও কি এখানে না কি?

ক্যাকটাসের জঙ্গল থেকে সাবধানে আত্মরক্ষা করে আরও অনেকটা এগিয়ে ইসাবেলার নির্দেশে বাঁয়ে সমুদ্রের দিকে হাঁটতে থাকি। হঠাৎ এক জায়গায় সমুদ্রের গায়ে পাথরে তৈরি বেশ প্রাচীন, পরিত্যক্ত ও ভাঙা দেওয়াল, জলাধার বা সুইমিং পুল চোখে পড়ে।

ইসাবেলা প্রায় কাঠবেড়ালির মতো এক চক্কর ঘুরে এসে, আমাকে ঘুরে দেখতে উৎসাহ দিয়ে বললেন, তা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরনো তো বটেই, এরকম একটা জায়গায় এমন একটা ধ্বংসাবশেষ— আটলান্টিস না হল তো কী হল, এও বা কম কী?

সমুদ্র, ক্যাকটাস, ধ্বংসস্তূপ মিলিয়ে এরকম একটা অদ্ভুত জায়গায় যে কোনও কল্পনাই মনে হয় বাস্তব।

সাহারার মেঘদূত

মাদ্রিদ এয়ারপোর্টের মেয়েটি আমি উত্তরে যাব শুনে বলেছিল, ইউরোপ-আমেরিকার পর্যটকরা আসে দক্ষিণ টেনেরিফে, দক্ষিণেই সাদা ও সোনালি সী-বিচ, বড় বড় হোটেল, ক্যাসিনো, নাইট ক্লাব, শপিং সেন্টার।

এসব উত্তরেও আছে, তবে মেয়েটি ঠিকই বলেছে, দক্ষিণেই বেশি। আমার ভাগ্য ভালো যে মার্কিন পর্যটকদের জন্য বানানো ট্র্যাভেল এজেন্টদের ভ্রমণসূচি পকেটে নিয়ে আমি টেনেরিফে আসিনি। তাহলে আর এই জনমনুষ্যহীন টিলা-গর্তময় ক্যাকটাসের জঙ্গল টুঁড়ে 'আটলান্টিস' অভিযানে আসা হত না। দেখা হত না টেনেরিফের উত্তর-পশ্চিমের সর্বোচ্চ বিন্দু বুয়েনাভিস্তা। দেখা হত না টেনেরিফের শেষ সীমা— ফারো দে টেনো। এতই সুন্দর, সমুদ্রও এখানে এমনই শান্তিজল, মনে হয় সারা বেলা সাঁতার দিয়ে বেড়াই।

আসার পথে যেমন, ফেরার পথেও তেমনই পাহাড়ের বুকসমান উঁচু বুয়েনাভিস্তায় গাড়ি থেকে নেমে অনেকক্ষণ বিস্ময় জলরাশি দেখি। বুয়েনাভিস্তা থেকে সরলরেখার মতো সোজা নিচের সমুদ্রে তাকালে মাথা ঘোরে। এত উঁচু থেকে অতটা নিচে গাড়ি নামবে কী করে ভেবে অকারণ চিন্তাও হয়। অকারণ, কারণ রাস্তা ভালো, তাছাড়া সারথি যখন ইসাবেলা তখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

ইসাবেলা গাড়ি চালাতে চালাতেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঝড় আসবে মনে হয়। টেবিল চেয়ারগুলো বাইরে আছে, সাহারার বালিতে ভরে যাবে।

প্রথমে ভাবলাম, ভুল শুনেছি। সাহারার বালি এখানে আসবে কী করে?

শুনে আশ্চর্য হলাম যে পাউডারের মতো মিহি বালি সাহারা থেকে হাওয়ায় উড়ে আসে টেনেরিফে। মেঘে-মেঘেও বালি আসে।

যাবার বেলা

পরদিন সকালে আমাকে ফেরার বিমান ধরতে হবে। এবার উত্তরের বিমানবন্দর

পরিত্যক্ত সুইমিং পুল

ইসাবেলা প্রায় কাঠবেড়ালির মতো এক চক্কর ঘুরে এসে, আমাকে ঘুরে দেখতে উৎসাহ দিয়ে বললেন, তা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরনো তো বটেই, এরকম একটা জায়গায় এমন একটা ধ্বংসাবশেষ— আটলান্টিস না হল তো কী হল, এও বা কম কী? সমুদ্র, ক্যাকটাস, ধ্বংসস্তূপ মিলিয়ে এরকম একটা অদ্ভুত জায়গায় যে কোনও কল্পনাই মনে হয় বাস্তব।

থেকে। চেক-ইন ইত্যাদি শেষ করে লিফটে দোতলায় যাব, বিমানের দিকে যাবার গেট সেখানেই।

ইসাবেলা লিফটের দরজা খুলে দিলেন, নিমেষে গালে বিদায়চুম্বন হল, আমি ভেবেছি তিনিও লিফটে আসবেন, এলেন না, দরজা বন্ধ হবার আগের মুহূর্তে আমার হাতে একটা খাম গুঁজে দিয়ে চলে গেলেন।

প্লেনে উঠে খাম খুলে দেখি একটা লাল চৌকো শক্ত কাগজে লেখা—

Sitting silently
doing nothing
spring comes
and the grass
grows by itself.

টেনেরিফ ছেড়ে, আটলান্টিকের নীল জল ছেড়ে বিমান যত ওপরে ওঠে ততই টের পাই, টেনেরিফ ছেড়ে যাচ্ছি।

পরদিন সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জুরিখে পত্রিকা-সম্পাদকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নিশ্ছিদ্র ব্যস্ততার মধ্যেও কতবার যে সেই বিস্ময়দ্বীপ মনে ভেসে উঠল কে জানে!

সম্মেলনের শেষ দিনে জুরিখের অপেরা হাউসে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা বিখ্যাত অপেরা 'লেলিজির দামোর' দেখলাম, সেদিন সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী রুথ ড্রাইফুস আমাদের স্বাগত জানালেন, বিদায়ভোজ সেরে মধ্যরাতে হোটেলে ফিরে ইসাবেলার ফ্যাক্স পেলাম— 'টেনেরিফের ফুল পাখি প্রজাপতি মানুষজন তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।'

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায়, মনে হয় এতদিন পরে আমার অন্তরের বাসভূমি খুঁজে পেয়েছি।

ছবি: লেখক

প্রথম প্রকাশ 'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৯

কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

ল ঘু ভা ষ - গু রু ভা ব

মৃত্যু: জীবনের প্রথম পাঠ

পবিত্র সরকার

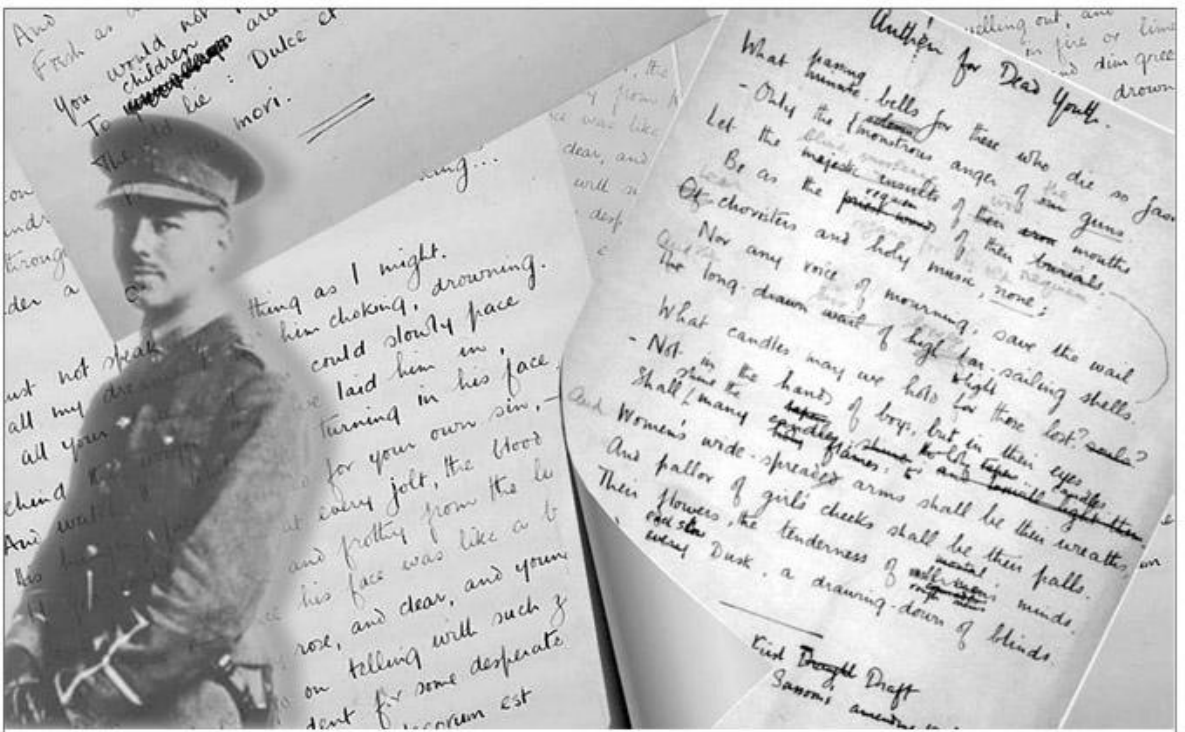

ইংরেজি কবি উইলফ্রেড আওয়েনের পাণ্ডুলিপি, বাঁদিকে সামরিক পোশাকে আওয়েন

নানা ধর্মের নানা গ্রন্থ থেকে সান্ত্বনা খুঁজেছেন বা পেয়েছেন সেই সেই ধর্মের মানুষেরা। আমাদের তাতে সংশয় নেই। আমাদের শুধু দেখবার, ধর্মের বাইরে থেকেও মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যায় কিনা।

পর্ব: ৫

রূপকের কাছে আত্মসমর্পণ: লইনু শরণ, লইনু শরণ

তবু আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ভাবে, এই এক জায়গায় জীবনের পরাভব ঘটে, তা মৃত্যুর কাছে। আমাদের উত্তরহীন প্রশ্ন, শুধু অকালমৃত্যু বা অসংগত অকারণ মৃত্যু নয়, জীবনের পূর্ণতার শেষেই বা মৃত্যু কেন আসবে? রবীন্দ্রনাথও এই অমোঘ সত্যের সঙ্গে নিজের মতো করে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছেন।

আমরা তো জানি যে, সব ধর্মই মৃত্যুর জন্য নানা স্তোক ও সান্ত্বনা তৈরি করে রেখেছে, যেমন আমরা দেখেছি। মৃত্যু হল ধর্মের এক বড় ব্যবসার মূলধন। হিন্দুধর্মে গীতার 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নানি নরঽপরাণি' থেকে অজস্র ভক্ত হিন্দু সান্ত্বনা পেয়েছেন বা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন, তেমনই নানা ধর্মের নানা গ্রন্থ থেকে সান্ত্বনা খুঁজেছেন বা পেয়েছেন সেই সেই ধর্মের মানুষেরা। আমাদের তাতে সংশয় নেই। আমাদের শুধু দেখবার, ধর্মের বাইরে থেকেও মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যায় কিনা। অর্জন করা যায় কিনা এক ধর্মমুক্ত মৃত্যুবোধ ওরফে

প্রায় দু-বছর আগে, যখন আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শেষবারের মতো যুদ্ধে যায়— যেদিন সে আমার কাছে বিদায় নেয়— আমরা দুজনেই একসঙ্গে তাকিয়ে ছিলাম (সমুদ্রের ওপারে) ফ্রান্সের দিকে; সেই সময়, আমার কবি ছেলে, এই অসাধারণ ছত্রগুলি বলে উঠেছিল, 'যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই...'

সঙ্গের ছবিতে সুসান এইচ আওয়েন

জীবনবোধ। আমাদের কাছে মৃত্যুবোধ আর জীবনবোধ আলাদা নয়, একই সত্যের দু-পিঠ। পরে আমরা এ-সম্বন্ধে হয়তো আরও একটু বুঝব। ঈশ্বর, দেবদেবী, পরলোক, আত্মা, প্রেতযোনি, জন্মান্তর ইত্যাদি যাবতীয় ধারণা বর্জন করে মৃত্যুকে মুখোমুখি বুঝে নেওয়ার একটা চেষ্টা রবীন্দ্রনাথে আছে। হয়তো তার সঙ্গে সঙ্গে একটু ছলনাও আছে, কিন্তু আমার মতে তা মৃত্যুর এক ধর্মমুক্ত বা 'Secular' ধারণা।

রবীন্দ্রনাথে আছে অন্য একধরণের সান্ত্বনা, আর এক ধরণের আশ্বাস। হয়তো (হয়তো কেন, অবশ্যই) এও এক অলীক আশ্বাস, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা-ই পৃথিবীর বেশ কিছু মানুষকে, আমাদের সংস্কৃতি থেকে বহু দূরবর্তী মানুষকে, সান্ত্বনা জুগিয়েছে, সাহস জুগিয়েছে। আমরা তার কিছু দৃষ্টান্ত লক্ষ করব।

ধরা যাক যুদ্ধক্ষেত্রে তরুণ বয়সে নিহত ইংরেজ কবি উইলফ্রেড আওয়েন (১৮৯৩-১৯১৮), প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) যাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মা সুজান এইচ আওয়েন ১ আগস্ট, ১৯২০ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের লন্ডনে আসার কথা তিনি জানতেন, কিন্তু তাঁর ঠিকানা তিনি পুরোপুরি জানতেন না। ইংরিজি চিঠিটি কিছুটা তুলে দিই, তারপর তার বাংলা করার অপটু চেষ্টা করা যাবে।

Dear Sir Rabindranath,

I have been trying to find courage to write to you ever since I heard that you were in London– but the desire to tell you something is finding its way into this letter today. The letter may never reach you, for I do not know how to address it, tho' I feel sure your name upon the envelope will be sufficient. It is nearly two years ago, that my dear eldest son went out to the War for the last time and the day he said goodbye to me– we were looking together– looking towards France, with breaking hearts– when he, my poet son, said those wonderful words of yours,– beginning at 'When I go from hence, let this be my parting word'– and when his pocket book came back to me– I found these words written in his dear writing– with your name beneath. Would be asking too much of you, to tell me what book I should find the whole poem in?

চিঠির পুরোটা পড়লে বুক ভেঙে যেতে থাকে। আওয়েন মারা গিয়েছিলেন মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে (১৮৯৩-১৯১৮), যুদ্ধশেষের মাত্র এক সপ্তাহ আগে। তাঁর সমস্ত কবিতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে, তার মধ্যে 'Futility' কবিতাটি আমরা অনেকে ছেলেবেলায় পড়েছি। মা বলছেন ছেলের সুন্দর জিনিসের প্রতি ভালোবাসার কথা, জীবনকে সুন্দর করে রাখার চেষ্টার কথা। ছেলের কবিতার বই বেরোবে শিগগিরই...

Forgive me this longer letter than I intended to write when I began– I should like you to read my son's little book, if you will do us, the honour?– (Chatto and Windus are bringing it out in the autumn)– if I may, I should be proud to send you a copy. চিঠি শেষ করছেন এইভাবে, –With great respect and admiration/from the mother of Wilfred Owen–/Susan H Owen.

'যখন থেকে জানলাম যে আপনি লন্ডনে আছেন তখন থেকে আমি আপনাকে এই চিঠি লেখার সাহস জোগাড় করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু আপনাকে যা বলতে চাই তা আজ এই চিঠির মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। আমি যেহেতু আপনার ঠিকানা জানি না, তাই এ চিঠি আপনার কাছে নাও পৌঁছতে পারে, কিন্তু খামের ওপর হয়তো আপনার নামটাই যথেষ্ট। প্রায় দু-বছর আগে, যখন আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শেষবারের মতো যুদ্ধে যায়— যেদিন সে আমার কাছে বিদায় নেয়— আমরা দুজনেই একসঙ্গে তাকিয়ে ছিলাম (সমুদ্রের ওপারে) ফ্রান্সের দিকে; সেই সময়, আমার কবি ছেলে, এই অসাধারণ ছত্রগুলি বলে উঠেছিল, 'যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই...'— আর যখন (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) তার পকেট বুক আমার কাছে ফিরে এল, তখন আমি দেখলাম তাতেও এই ছত্র দুটি লেখা রয়েছে, তার নীচে আপনার নাম লেখা। আপনার ওপর খুব বেশি কি দাবি করব, যদি বলতে বলি কোন বইয়ে ওই পুরো কবিতাটি আমি পাব?'

বলা বাহুল্য যে ইংরিজিতে ছত্রদুটি ছিল, 'When I go from hence let this be my parting word,/ that what I have seen is unsurpassable'. *গীতাঞ্জলি*-র ১৪২ নম্বর কবিতা, যার বাংলা দু-লাইন, 'যাবার দিনে এই কথাটি/বলে যেন যাই-/যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।'

রবীন্দ্রনাথ যখন একথা লিখছেন তখনও মৃত্যু তাঁর জীবন থেকে একত্রিশ বছর দূরে। তখন পরপর অনেকগুলি মৃত্যু তিনি পার হয়ে এসেছেন, গভীর ব্যক্তিগত শোকের নানা উপলক্ষ, যার তালিকা আমরা ওপরে করেছি। তবু জীবন সম্বন্ধে একটি চরিতার্থতার বোধ তাঁর জীবনের এক স্থায়ী উচ্চারণ— গানের ধ্রুবপদের মতো যা বারবার তাঁর মুখে ফিরে ফিরে এসেছে। আমরা সবাই হয়তো এমন জোর দিয়ে সবসময় একথা বলতে পারব না, এমন সুন্দর করে তো নয়ই। তবু যদি একবার ভাবি যে, এই মানবজীবন নাও পেতে পারতাম, পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে জন্ম নাও হতে পারত। তাতে অবশ্য জড়কণা আমার কিছু যেত-আসত না, কারণ মানবজীবন আর তার অভাবের মধ্যে তুলনা করার কোনও চেতনাই আমার আয়ত্তে থাকত না। শুধু মানুষ হিসেবেই পারি এই জীবনের অনুপস্থিতির বিকল্পটার একটা মূল্যায়ন করতে। তা যদি করি, তাহলে কি বলতে পারব যে, মানুষ হয়ে না জন্মানোই ভালো ছিল? কী সে ভালো, কেমন সে ভালো— তার কোনও ধারণাই আমরা কেউ দিতে পারব

মৃত্যুর জন্য চিহ্নিত দুশো নিষ্পাপ শিশু, কেউ চোখের জল ফেলল না। কেউ লুকোবার চেষ্টা করল না। আহত সোয়ালো পাখির মতো তারা আঁকড়ে ধরে রইল একই সঙ্গে তাদের শিক্ষক আর গুরু, পিতা ও ভ্রাতা, ইয়ানুস কোর্কজাককে, যেন তিনিই তাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা।

সঙ্গের ছবি: ইজরায়েলের য়াড ভাসেম মেমোরিয়ালে সেই দৃশ্যের প্রতিমূর্তি। ভাস্কর: বরিস সাক্তসিয়ের

না কাউকে।

দ্বিতীয় একটা আখ্যান বলি। এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার। পোলান্ডের রাজধানী ওয়ারশ-তে অনাথ ইহুদি ছেলেদের একটি আশ্রম চালান ডাঃ ইয়ানুস কোর্কজাক (Korczak, ১৮৭৯-১৯৪২), যাঁকে সবাই হয় ডাক্তারবাবু বা বুড়ো ডাক্তারবাবু বলে জানে, তিনি সেটা চালান। এটা তাঁর ছদ্মনাম, আসল নাম ছিল হেনরিক গোল্ডস্মিট, কিন্তু শেষপর্যন্ত ছদ্মনামেই তাঁর গৌরব চিহ্নিত থাকে। তিনি ছিলেন শিশুচিকিৎসক, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের লেখক হিসেবেও তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

আশ্রমে থাকে একেবারে কোলের বাচ্চা থেকে তেরো-চোদ্দো বছরের ছেলেমেয়েরা, প্রায় দুশোর মতো। আশ্রমটির নাম ছিল দোম সিয়েরোত। এখানে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করত, গানবাজনা শিখত, এমনকি একসময় নিজেদের পত্রিকাও ছাপিয়ে প্রকাশ করত। একটি রেডিও-স্টেশনও ছিল তাদের একসময়, কিন্তু ইহুদি-বিদ্বেষী জার্মানরা সেটি বেশিদিন চালাতে দেয়নি।

জার্মান সৈন্যরা পোলান্ড দখল করল, ১৯৪০ নাগাদ তারা অন্য পাড়া থেকে ইহুদিদের তাড়িয়ে এনে ওয়ারশ-এ একটি ইহুদি-বস্তি বা গেটো তৈরি করল, তারপর ওই দোম সিয়েরোত আশ্রম থেকেও ডাঃ কোর্কজাক আর তাঁর ছেলেমেয়েদের তাড়িয়ে নিয়ে গেটোতে ঠেলে দিল।

নিশ্চয় ডাঃ কোর্কজাক বুঝতে পেরেছিলেন কী ঘটতে যাচ্ছে। ১৯৪২-এর জুলাই মাসে ওই গেটোর আশ্রমেই তিনি ছেলেমেয়েদের বললেন, 'চলো, আমরা একটা নাটক করি'। ছেলেমেয়েরা মহা-উৎসাহে নাটকের রিহার্সাল শুরু করে দিল। নাটকটা আর কোনও নাটক নয়, পোলিশ অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'। কেন এই নাটকটা বেছেছিলেন কোর্কজাক? শুধু কি নাটক করার আনন্দে ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে রাখার জন্য, নাকি নাটক পড়তে পড়তে, রিহার্সাল দিতে দিতে তারা নাটকটার গভীরে একটু ঢুকে পড়তে পারে, বুঝতে পারে যে, মৃত্যু অনেকটা রাজার সঙ্গে দেখা হওয়ার মতো, মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নিশ্চয় এইরকম একটা কিছু ছিল তাঁর পরিকল্পনায়, নইলে এত নাটক থাকতে এটিকে বাছবেন কেন? শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নাকি তাঁর চিঠিপত্রও লেখালেখি হয়েছে।

নাটক নিশ্চয় হতে পারেনি। কারণ ৫ বা ৬ আগস্ট এসে পড়ল জার্মানবাহিনী, তারা ওই দুশোর মতো ছেলেমেয়েকে নিয়ে যাবে ত্রেব্‌লিংকা মারণ শিবিরে, সেখানে তাদের মেরে ফেলা হবে। ওই যুদ্ধে তখনই ওয়ারশতে দেখা গিয়েছে পথেঘাটে নগ্নদেহ বাচ্চাদের শব, যুদ্ধের সবচেয়ে সহজ বলি।

কী বুঝিয়েছিলেন কোর্কজাক বাচ্চাদের? হয়তো তিনি বলেছিলেন, চলো গ্রামে মুক্ত হাওয়ায় বেড়িয়ে আসি, নদীর ধারে, ফুলের রাজ্যে, খোলা আকাশের নীচে? সব শিশু বিশ্বাস করেছিল তাঁর কথা? তারা তো দেখছে সামনে পিছনে রাইফেলধারী জার্মান সৈন্য। কিন্তু তাদের সবচেয়ে ভালো জামাকাপড় পরতে বলেছিলেন কোর্কজাক, সঙ্গে নিতে বলেছিলেন তাদের নীল ব্যাগে তাদের প্রিয় জিনিসপত্র বা খেলনা, যে বাজাতে জানে সে যেন বাজনাটাকেও না ছাড়ে। বলেছিলেন, কোনও ভয় নেই, ঠিক যেন 'ডাকঘর'-এর ঠাকুরদার মতো। জার্মান সৈন্যদের তরফে তাঁকে বলা হয়েছিল, আপনি চলে যান, আপনাকে আমরা মুক্তি দিচ্ছি। তিনি যাননি, ওই দুশো ছেলেমেয়ের সঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

কেমনভাবে ছেলেমেয়েদের মৃত্যুযাত্রার মিছিল চলেছিল রাস্তায়? একজন প্রত্যক্ষদর্শী, ইয়োশুয়া পার্লে, লিখেছেন সেই মিছিলটির কথা। যখন সেটি উমশ্লাকপ্লাটস-এ এসে মৃত্যুশিবিরের দিকে যাবে তখনই, তাঁর বর্ণনায়—

এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। দুশো শিশুর মধ্যে একটিও কেঁদে উঠল না। মৃত্যুর জন্য চিহ্নিত দুশো নিষ্পাপ শিশু, কেউ চোখের জল ফেলল না। কেউ লুকোবার চেষ্টা করল না।

গবেষণার বিষয়টি বড় অদ্ভুত, অন্তত তখনও পর্যন্ত ছিল। যে মানুষেরা খুব শিগগিরই অবধারিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, তিনি তাঁদের খোঁজ করতেন। নানা হাসপাতাল, 'ইনফার্মারি' ইত্যাদিতে তাদের কাছে পৌঁছে যেতেন তিনি। তারপর প্রশ্ন করতেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে নিজেদের জীবন, আসন্ন মৃত্যু নিয়ে কথা বলতে চান কিনা...

ওপরের ছবিতে ডঃ এলিজাবেথ কুবলার রস। পাশে তাঁর লেখা বইটির প্রচ্ছদ

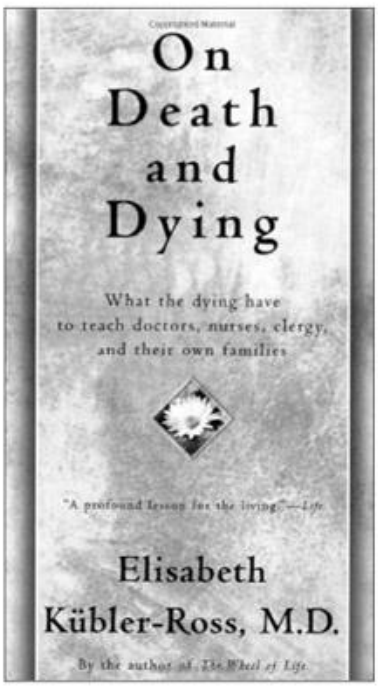

আহত সোয়ালো পাখির মতো তারা আঁকড়ে ধরে রইল একই সঙ্গে তাদের শিক্ষক আর গুরু, পিতা ও ভ্রাতা, ইয়ানুস কোর্কজাককে, যেন তিনিই তাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা। তিনি মাথা নিচু করে হেঁটে চলেছেন, মাথায় টুপি নেই, কোমরে চামড়ার বেল্ট, পায়ে উঁচু চামড়ার জুতো। তিনি হাত ধরে চলেছেন একটি শিশুর। ... রাস্তার দুদিকে সারি সারি জার্মান, ইয়ুক্রেনিয়ান, এমনকি ইহুদি পুলিশরাও দাঁড়িয়ে দেখছে এই মৃত্যু-শোভাযাত্রা, কেউ ফুর্তিতে আকাশে চাবুক হাঁকড়াচ্ছে, কেউ পিস্তল থেকে গুলি ছুড়ছে। হায়, এ শোভাযাত্রা দেখে রাস্তার পাথরগুলিও যেন চোখের জল ফেলছিল।

ভ্লাদিস্লাভ স্পিলমানের বই 'দ পিয়ানিস্ট'-এ এই একই শোভাযাত্রার বর্ণনায় আরও পাই—

একটি জার্মান সৈন্য বেহালা-বগলে একটি ছেলেকে এনে মিছিলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল, তার ভালো লাগছিল ছেলেটিকে, বাজনা শুরু করতে বলল।... আমি যখন গেশিয়া স্ট্রিটে তাদের দেখি, বাচ্চারা হাসছে, সকলে গলা মিলিয়ে গান গাইছে, আর বেহালা বাজিয়ে ছেলেটি তাদের গানের সঙ্গে প্রাণপণে বাজনা বাজিয়ে চলেছে। কোর্কজাক দুটি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চলেছেন, তারাও হাসছে, নিশ্চয় তিনি তাদের কোনও মজার গল্প বলছেন। আমি নিশ্চিত যে, যখন গ্যাস-চেম্বারে জাইক্লন বি গ্যাস বাচ্চাদের দম বন্ধ করে ফেলছে, আশা নয়, মৃত্যুর আতঙ্ক তাদের বুকে, তখনও নিশ্চয় ওই ডাক্তারটি তাদের বলে চলেছে, 'ভয় নেই বাছারা, ভয় নেই; সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হয়তো *ডাকঘর*-এর ঠাকুরদার ভূমিকাই বেছে নিয়েছিলেন ডাঃ কোর্কজাক। তবে ওই শিশুদের সঙ্গে তিনিও মৃত্যুকে গ্রহণ করেছিলেন, তাদের ত্যাগ করে কোথাও যাননি।

ডাঃ কোর্কজাকের কাহিনি পোলান্ডে বহুবিদিত। এ আখ্যান নিয়ে নাটক হয়েছে, উপন্যাস হয়েছে, অপেরা হয়েছে, এমনকি বিখ্যাত পোলিশ পরিচালক আন্দ্রেই ভাইদা (যাঁর *কানাল* ছবিটি আমরা অনেকেই দেখেছি), *কোর্কজাক* নামে একটি অসাধারণ চলচ্চিত্রও তৈরি করেছেন। এই মানুষটি পোলান্ডের এক অমর কিংবদন্তি।

তৃতীয় আখ্যানটি ছোট, মাত্র একটি মানুষের মৃত্যুর কথা। মৃত্যু নয়, হত্যা। ১৯৬৬ সালের *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় ১৬ মার্চ তারিখে বেরিয়েছিল খবরটি। চিন্মোহন সেহানবিশ তাঁর *রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ* বইয়ে তা উল্লেখ করেছেন।

এ বিপ্লবী বাংলার বা ভারতের নন, ইন্দোনেশিয়ার। গত শতাব্দীর ষাটের বছরগুলির মাঝামাঝি কমিউনিস্ট নিধন চলছে সেদেশে, প্রায় পাঁচ লক্ষ কমিউনিস্টকে মেরে ফেলেছে সুহার্তোর সামরিক বাহিনী। এইরকমই একজন কমিউনিস্ট নেতা নজটো (njoto, সম্ভবত 'নিয়ত' জাতীয় কিছু হবে নামটা) সামরিক আদালতে দাঁড়িয়ে, আদালত তাঁর দণ্ড ঘোষণা করবে।

ঘোষিত হল দণ্ড, মৃত্যুদণ্ড। নিয়ত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তাঁর ভাষায়, রবীন্দ্রনাথের দুটি কলি, 'আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে, ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।'

ভারতের বিপ্লবীরাও কি পিছিয়ে থাকেন? তা কেন হবে? বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত যখন আদালতে শুনলেন তাঁর ফাঁসির আদেশ, তখনই গেয়ে উঠেছিলেন, 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মা গো, তোমায় ভালোবেসে'।

মৃত্যুর সময় কত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান রবীন্দ্রনাথ।

এবার আসি একটি বইয়ের কথায়। বইটির ইংরিজিতে নাম On Death and Dying, ইংরিজিতে লেখা, মৃত্যু ও মরণ সম্বন্ধে। সাক্ষাৎভাবে বইটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনও

যোগ থাকার কথা আমাদের ভাবনায় আসে না। লিখেছেন এক বিদেশিনি মনোবিকলনের ডাক্তার। ১৯২৬-এ জন্মেছিলেন সুইটজারল্যান্ডের ইহুদি পরিবারে, পরে আমেরিকায় এসে ডাক্তার হন, ডাক্তারির সঙ্গে সঙ্গে মনঃসমীক্ষণে ডিগ্রি করেন। ডেরেক গিল-এর লেখা তাঁর জীবনী Quest: The Life of Elisabeth Kubler-Ross পড়ে জেনেছিলাম মৃত্যু ও মৃত্যুপথযাত্রী রোগীদের সেবাশুশ্রূষা নিয়ে তাঁর কাজ ও বক্তৃতা তাঁকে আমেরিকায় ব্যাপক পরিচিতি দেয়, এবং তারই পরিণামে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলিংস হাসপাতাল তাঁকে আমন্ত্রণ করে। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে, নিউইয়র্কের ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে। তখনই মার্কিনদেশে প্রি-মেডিক্যাল পাঠ্যসূচিতে স্থান পেয়েছে বইটি, দশ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে বিক্রি। এটি ডাঃ রসের ডক্টরেটের গবেষণা।

গবেষণার বিষয়টি বড় অদ্ভুত, অন্তত তখনও পর্যন্ত ছিল। যে মানুষেরা খুব শিগগিরই অবধারিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, তিনি তাঁদের খোঁজ করতেন। নানা হাসপাতাল, 'ইনফার্মারি' ইত্যাদিতে তাদের কাছে পৌঁছে যেতেন তিনি। তারপর প্রশ্ন করতেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে নিজেদের জীবন, আসন্ন মৃত্যু নিয়ে কথা বলতে চান কিনা; অবশ্যই এমনও কেউ কেউ ছিল যারা জানত না মৃত্যু তাদের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। যেদিন তাদের তা জানানো হল, সেই মুহূর্তে ডাঃ রস সামনে উপস্থিত থাকতেন ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে, লক্ষ করতেন রোগী কীভাবে সংবাদটাকে নেয়। এভাবে প্রায় চারশো আসন্নমৃত্যু রোগীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তিনি, যাদের মধ্যে ছিলেন একুশ বছরের মেয়ে থেকে অশীতিপর বৃদ্ধবৃদ্ধা পর্যন্ত। পরে তিনি মৃত্যুপথযাত্রী শিশুদের নিয়েও কাজ করেন এবং বই লেখেন।

দিনের পর দিন এইসব রোগীদের সঙ্গে থেকে তিনি লক্ষ করেছিলেন, তারা পর্যায়ক্রমে পাঁচরকমের প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। ডাক্তারের মুখে নিষ্ঠুর সম্ভাবনার কথাটা শোনবার পর প্রথমে তারা অস্বীকার করে মৃত্যুর ভবিতব্য। 'এ কিছুতেই হতে পারে না।' হঠাৎ যেন খুব একাকী হয়ে যায় সে, কারণ কাউকে সে এ কথাটা বোঝাতে পারে না যে, তার মৃত্যু এখনই হওয়ার কথা নয়। এই 'ডিনায়াল অ্যান্ড আইসোলেশন' (অস্বীকার আর একাকিত্ব) হল তার প্রথম প্রতিক্রিয়া। তারপর সে রেগে যায়। 'এত লোক থাকতে আমি কেন? কেন আমাকেই যেতে হবে?' বলা বাহুল্য, তার জীবন এসব প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয় না। ডাক্তার নিশ্চয় নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনও ব্যাখ্যাই তার

শিয়ানের সমাধিক্ষেত্রে টেরাকোটা সৈনিক □ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

পছন্দ হওয়ার কথা নয়। তার মনে অজস্র অভিযোগ জমে ওঠে, সারা পৃথিবীর ওপর তার অভিমান স্তূপীকৃত হয়, কিন্তু কোনও সান্ত্বনা তার কাছে আসে না।

তারপরে মরণান্তিক রোগী যে পর্যায়ে এসে পৌঁছয় তার নাম দর-কষাকষি বা 'বারগেনিং'। কার সঙ্গে দর-কষাকষি? হয়তো জীবনের সঙ্গে, কিংবা জীবিতদের সঙ্গে। 'আচ্ছা, আমি যদি এখন ডাক্তারের কথা শুনে চলি, আর বেয়াড়াপনা না করি, তাহলে কি আর দুটো দিন সময় পাব না?' তারপরে হয়তো সে বুঝতে পারে কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়, যা অনিবার্য তা ঘটবেই, তাকে আটকানো সম্ভব নয়। তখন আসে একটা হতাশা বা 'ডিপ্রেশন'-এর সময়। কারও সঙ্গে তার কথা বলার ইচ্ছে হয় না, লোকজন এলে অন্যদিকে মুখ করে শুয়ে থাকে, খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছে চলে যায়।

সব শেষে আসে নিরুপায় স্বীকৃতি: 'আসুক সে, আমি তার জন্যে প্রস্তুত। আর অভিযোগ জানাব না, উতলা হব না, শান্তভাবে তার প্রতীক্ষা করব'।

এই হল ডাঃ কুবলার-রস-এর বিখ্যাত 'গ্রিফ সাইক্‌ল' বা শোকবৃত্ত। নামান্তরে 'দ কুবলার-রস মডেল'। পর্যায়ের এই বিন্যাস বা তার ক্রম সম্বন্ধে সকলে একমত নাও হতে পারেন। কারও মতে এই বিন্যাস বড় বেশি ছকে বাঁধা। কিন্তু এর চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প কেউ এখনও পর্যন্ত তৈরি করতে পারেননি।

ডাঃ রসের মরণান্তিক রোগীদের এই মনোপরিক্রমা আমার মূল বিচার্য নয়। আমি বইটাতে আরেকটি বিষয় আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়েছিলাম। তা হল, ডাঃ রস এই বইয়ের শুরুতে, শেষে, এবং আর এগারোটি অধ্যায়ের শুরুতে পৃথিবীর যাবতীয় সাহিত্য মন্থন করে শুধু একটিমাত্র কবির কবিতা থেকে, আর সেই কবির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেশিরভাগই আমাদের চেনা কবিতা, চেনা কথা। যেমন On the Fear of Death নামক প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভে ব্যবহার করেছেন 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়'-এর ইংরিজি অনুবাদ, ইংরিজি 'গীতাঞ্জলি' থেকে,

> Let me not pray to be sheltered from
> Dangers, but to be fearless in facing them.

দ্বিতীয় অধ্যায়ের (Attitudes Towards Death and Dying) শুরুতে আছে, Stray Birds-এর CCXIX সংখ্যক কবিতার পঙক্তি Men are cruel, but Man is kind. তৃতীয় অধ্যায় হল অমোঘ জানবার পর মৃত্যুরোগস্পৃষ্ট মানুষটির প্রতিক্রিয়ার প্রথম পর্যায়: Denial and Isolation। তার শুরুতে আছে ওই Stray Birds-এরই LXXIX কবিতার পঙক্তি, 'Man barricades himself'. চতুর্থে (Anger) 'We read the world wrong and say that it deceives us'।

পঞ্চমের (Bargaining) আরম্ভ 'The woodcutter's axe begged for its handle from the tree, the tree gave it. মূলে ছিল *কণিকা*-র 'রাষ্ট্রনীতি' কবিতাটি— যার প্রথম দুটি ছত্র হল, 'কুড়াল কহিল, ভিক্ষা মাগি ওগো শাল,/হাতল নাহিকো, দাও একখানি ডাল।' ষষ্ঠের (Depression) শুরু এই ছত্রদুটি দিয়ে,

The world rushes on over the strings of the lingering

heart making the music of sadness. (Stray Birds, XLIV)

সপ্তম অধ্যায় হল 'গ্রহণ' বা Acceptance। এর শুরুতে ডাঃ রস ব্যবহার করেন *গীতাঞ্জলি*-র 'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই, সবারে আমি প্রণাম করে যাই'-এর অনুবাদ— I have got my leave. Bid me farewell, my brothers.

অষ্টম অধ্যায়টিতে মৃত্যুগৃহীত মানুষটি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন লেখক। তা শুরু হয়েছে ইংরিজি 'গীতাঞ্জলি'র LXXXVII সংখ্যক কবিতা দিয়ে, যা মূল বাংলায় আসলে *স্মরণ*-এর কবিতা— 'আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই, যাই আর ফিরে আসি খুঁজিয়া না পাই'। বিস্ময়ের কথা এই যে, ডাঃ রস এ অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন 'আশা' (Hope)। হয়তো *স্মরণ*-এর ওই কবিতার শেষ দু-ছত্রে সেই আশার কথা আছে বলেই— 'ঘরে মোর নাই আর সে অমৃতরস, বিশ্ব-মাঝে পাই সেই হারানো পরশ'। নবম অধ্যায়ে লক্ষ পড়েছে The Patient's Family-র ওপর। তার শুরু *লিপিকা*-র 'শ্মশান ঠেকে বাপ ফিরে এল' কথিকাটি দিয়ে, যার অনুবাদ আছে The Fugitive-এ। দশম অধ্যায়ের বিষয় আরও কিছু সাক্ষাৎকার, কয়েকটি আসন্নমৃত্যু রোগীর সঙ্গে। তার শুরুতে উৎকীর্ণ ইংরিজি 'গীতাঞ্জলি'-র ৮৬ সংখ্যক কবিতা। আসলে *নৈবেদ্য*-র কবিতা, মূল পঙক্তিগুলি এইরকম— 'পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত আমার ঘরের দ্বারে,/ তব আহ্বান করি সে বহন পার হয়ে এল পারে'। একাদশের শুরুতে উদ্ধৃতি, The storm of the last night has crowned this morning with golden peace. দ্বাদশে আছে এই রোগীদের নিয়ে থেরাপির কথা, তার শুরুতে তোলা হয়েছে, Death belongs to life as birth does/ The walk is in the raising of the foot as in laying it down. আর এ অধ্যায়ের শেষেও, বইয়ের একেবারে শেষে আছে উদ্ধৃতি—

The water in a vessel is sparkling.

Water in the sea is dark.

The small truth has words that are clear,

The great truth has great silence.

'গীতাঞ্জলি' (ইংরিজি) ছাড়া বাকি সব উদ্ধৃতি Stray Birds থেকে। আরেকটি দেখেছি The Fugitive থেকে। আমরা সবগুলির অনুবাদ দেওয়ার চেষ্টা করিনি, কারণ আমরা মনে করি ইংরিজি রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা, অনুবাদ নয়।

ডাঃ কুবলার-রস রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন ১৯৪২ নাগাদ, যখন তিনি ডাক্তারির ছাত্রী সুইজারল্যান্ডে। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মেডিক্যাল ভলান্টিয়ার হয়ে তাঁর ভারতে আসার কথা ছিল। আসা হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে থেকে গিয়েছেন। তাই সাতাশ বছর পরে তাঁর গবেষণায় রবীন্দ্রনাথকেই একমাত্র শরণ করেছেন তিনি। একথা তিনি এই লেখককে বলেছিলেন ১৯৭৪ সালে, মার্কিনদেশে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা করতে এসে। সে বক্তৃতার বিষয় ছিল মৃত্যুস্পৃষ্ট শিশুরা। বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছিল, *ডাকঘর*-এর অমলের কথা তাঁর মনে গেঁথে আছে।

মৃত্যু আর মৃত্যু, রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ। ভাবতে অহংকার হয় যে একজন বাঙালি কবির মৃত্যুদর্শন সারা পৃথিবীকে মুগ্ধ করেছে, সান্ত্বনা দিয়েছে। আমরা তাঁরই ভাষায় জন্মলাভ করেছি, এও খুব আকস্মিক ঘটনা। নাও জন্মাতে পারতাম। কিন্তু একবার জন্মেছি যখন, সে সৌভাগ্য ষোলো আনা উশুল করে নেব না কেন? মৃত্যুর সঙ্গে যখন বোঝাপড়া করতেই হবে, তখন রবীন্দ্রনাথের মতো করেই করি। জীবনকে, মানুষকে ভালোবাসে।

উল্লেখপঞ্জি

বলা বাহুল্য, সারা জীবনে নানারকম পড়া ছাইপাঁশ এবং চমকপ্রদ অনেক বইয়ের ও লেখার ভাবনা এ লেখার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, সে অর্থে এ বই কোনওক্রমেই মৌলিক রচনা নয়, সে অর্থে কোনও লেখাই নয়। সারা পৃথিবীর মানুষের চিন্তাস্রোত থেকে আমি আমার নিজের পাত্রে অল্প কিছুটা চিন্তাজল কুড়িয়ে নিয়েছি মাত্র। তবু এ লেখাটি লেখবার সময়ে যে বইগুলির পুরনো পাঠ স্মরণ করেছি, বা জোগাড় করে এনে হাতড়েছি, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেওয়া হল:

আলম, ফজলুল (সম্পা.), ২০০৪, *মৃত্যু*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী। বইটি Professor A B M Karim et al. (ed.), 1998, Death: Medical, Spiritual and Social Care of the Dying, (Amsterdam, Brije University Press) বইয়ের অনুবাদ

গুপ্ত, নলিনীকান্ত, 'রবীন্দ্রনাথ ও মৃত্যু-অভিসার', দ্র. রায়, গোপালচন্দ্র (সম্পা.), ১৩৬৮, পৃ. ২৬-৩২

ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ, ১৯৬৬, পিতৃস্মৃতি, কলকাতা, জিজ্ঞাসা

দত্ত, বিজয়কুমার, ২০০৯, *মৃত্যু ও মৃত্যুচেতনা*, কলকাতা, পুনশ্চ

মহলানবিশ, নির্মলকুমারী, ১৩৯৩ (চতুর্থ মুদ্রণ), *বাইশে শ্রাবণ*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ

রায়, গোপালচন্দ্র, (সম্পা), ১৩৬৮, *রবি-পরিক্রমা*, শ্রীরামপুর-রিষড়া রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সমিতি

সেহানবিশ, চিন্মোহন, ১৩৯১, *রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ*, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ

হোম, অমল, ১৯৫৫, *পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স

Bronowski, J., 1971, The Ascent of Man, Boston/Toronto, Little, Brown and Company

Burckhardt, Jacob, 1998 (Tr. By Sheila Stern), The Greeks and Greek Civilization, London, Harper Collins, Publishers.

Chattopadhyay, Debi Prasad (see Morgan, L.H.),

Clark, Kenneth, 1969, Civilisation, New York & Evanston, Harper & Row, Publishers.

Cooper, J.C., 1990, Dictionary of Festivals, Hammersmith, London, Thorsons (imprint of Harper Collins, Publishers.

Dewey, John, 1958, Art as Experience, New York, Capricorn Books.

Gill, Derek, Quest: The Life of Elisabeth Kubler-Ross, Ballantine Books.

Hansen, Harry (ed.), 1953, The Complete Works of O.Henry, Vol.2, Garden City, New York, Doubleday & Company.

Hauser, Arnold, 1951, The Social History of Art, London, Routledge & Kegan Paul Limited.

Morgan, Lewis, Henry, 1877/1982 (ed. by Debiprasad Chattopadhyay), Kolkata, K.P. Bagchi & Co.

New Larousse Encyclopedia of Mythology, 1968, New York etc., The Hamlyn Publishing Group Limited (Prometheus Press).

Ross, Elisabeth-Kubler, 1969/1997, On Death and Dying, New York, Scribner Classics.

The Modern Library, John Keats and Percy Bysshe Shelley, A Modern Library Giant, New York.

Tagore, Rabindranath, 1931, The Religion of Man, London, George Allen and Unwin Limited.

Website offered by Wikipedia.

শেষ

কবিকন্যা মিত্রা চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি কবিতা ও চিঠি

অন্য মহাশ্বেতা

তোমার কলস ভর্তি জল ছিল; কিন্তু আমি সেই জল স্পর্শও করিনি,
কেননা তোমার মুখে মানবীর লাবণ্য ছিল না।
আমার মহাশ্বেতা দেবী নয়, তার মুখের অমলতা স্পর্ধায় জ্বলে না!
বরং সে করুণায় ম্লান!

তুমি সোনার কলস কাঁখে চলে যাও...
আমি মাটির কলস ছাড়া পিপাসা জানি না।

বই: দিবস রজনীর কবিতা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৯

মানুষ

তার ঘর পুড়ে গেছে
অকাল অনলে;
তার মন ভেসে গেছে
প্রলয়ের জলে।
তবু সে এখনো মুখ
দেখে চমকায়,
এখনো সে মাটি পেলে
প্রতিমা বানায়।

বই: ভিসা অফিসের সামনে। রচনাকাল : ১৩৭৪

ভুবনেশ্বরী যখন

ভুবনেশ্বরী যখন শরীর থেকে
একে একে তার রূপের অলংকার
খুলে ফেলে, আর গভীর রাত্রি নামে
তিন ভুবনকে ঢেকে;

সে-সময়ে আমি একলা দাঁড়িয়ে জলে
দেখি ভেসে যায় সৌরজগৎ, যায়
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল নিরুদ্দেশে
দেখি আর ঘুম পায়!

বই: ভিসা অফিসের সামনে।
প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৭

ব্রত ভাসাও

ব্রত ভাসাও জলে, কন্যা
ব্রত ভাসাও জলে;
তোমার মুখ আগুন, কন্যা
পাড়ার লোক বলে।

বই: আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা।
প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৪

অন্ন দেবতা

'অন্নমিতি হোবাচ সর্বাণি হবা ইমানি ভূতান্নমেব
প্রতিহরমাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা...'
ছান্দোগ্যোপনিষৎ

অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা;
অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা।
অন্ন চিন্তা অন্ন গান অন্নই কবিতা,
অন্ন অগ্নি বায়ু জল নক্ষত্র সবিতা।

অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার
অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওংকার।
সে-অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।

বই: মুখে যদি রক্ত ওঠে।
প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৪

রাত্রি, কালরাত্রি

ভুবন ভরে গিয়েছে আজ
চোখের জলের সমারোহে;
যেদিকে চাই ক্ষুধার সভা
নরক যেন যায় বিবাহে।

অথচ দশদিক বিধবা
বোবার মতো দাঁড়িয়ে দূরে;
বধির যারা দেয় বাহবা
একটি দুটি পয়সা ছুঁড়ে।

বিবসনা বসুন্ধরা
সপ্তঋষির অন্ন জুড়ায়;
গন্ধে বাতাস শিউরে ওঠে
আলোর দেশে ঝড় বয়ে যায়।

অনেক দূরে অরুন্ধতীর
ওষ্ঠ জ্বলে চোরের চুমায়
আর সমস্ত আকাশ জুড়ে
যুধিষ্ঠিরের কুকুর ঘুমায়।

বই: মহাদেবের দুয়ার।
প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৭

কালকেতু-ফুল্লরার গল্প

(মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' মনে রেখে)

ফুরায় না
ফুল্লরার বারমাস্যা
আর
শূন্য হাতে কালকেতুর
ফিরে আসা

ঘরে
মুখোমুখি
দারুণ উপবাসে;

ফুরায় না
দুটি অসহায় মানুষের
সারাদিন
ক্ষুধায় জ্বলতে থাকা

সারা রাত...

তবু
তারা স্বপ্ন দেখে
মাঠ-ভর্তি ধানের
আর
বুক-ভর্তি ভালবাসার
আর
স্বপ্ন দেখতে দেখতে
কালকেতু রাজা হয়, ফুল্লরার মুখে
আবির লাগে।

বই: নির্বাচিত কবিতা।
২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

তুই

তোর কি কোনো তুলনা হয়?
তুই
চোখ বুজলে হিমসাগর, চোখ মেললে অনন্ত নীল আকাশ!

বুকের মধ্যে সমস্ত রাত তুষারে ঢাকা পাহাড়
সমস্ত দিন সূর্য ওঠার নদী...

তোর কি কোনো তুলনা হয়?
তুই
ঘুমের মধ্যে জলভরা মেঘ, জাগরণে জন্মভূমির মাটি!

বই : আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা। প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৪

নদী

প্রবাহিত মনুষ্যত্ব, কে কাকে পাথর ছুঁড়ে মারতে চায়?
পাথর নদীর জলে ভেসে যায়, খুনির শরীরে রক্ত
ধুয়ে দিয়ে বলে মহেশ্বর; 'ঘরে যাও।'

যে-খুনি যায় না ঘরে, তার থেকে নদী বহু দূর!

বই: হাওয়া দেয়। প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৫

গোধূলির সাঁওতাল

এক

সাঁওতাল মেয়েদের গান—

পাহাড়িয়া মধুপুর, মেঠো ধূলিপথ
দিনশেষে বৈকালী মিষ্টি শপথ:
'মোহনিয়া বন্ধু রে, আমি বালিকা
তোরই লাগি গান গাই, গাঁথি মালিকা।'

আজও সন্ধ্যার শেষে খালি বিছানা;
আমি শোব, পাশে মোর কেউ শোবে না—
তুই ছাড়া এই দেহ কেউ ছোঁবে না।...

সুরে সুরে হাওয়া তার মিষ্টি বুলায়
সাঁওতাল মেয়ে-কটি দৃষ্টি ভুলায়।

দিন শেষ— ধুধু মাঠ, ধুধু মেঠো পথ
সাঁওতাল মেয়ে-কটি ছড়াল শপথ—
হাওয়ায় হাওয়ার মতো তাদের শপথ।

দুই

(ধীরে মাদল)

আয় মিতেনি, আজ রাতে
চাঁদ-কুড়ানো মাঝরাতে
আবছা আলোর কান্নাতে
মুখ রেখে তুই ঝর্নাধারে আয়!
আয়, জোয়ানের মন-জ্বালা
নাচ দিয়ে সই, গাঁথ মালা—
চুমুর গেলাস মদ ঢালা
দে ছুঁড়ে দে তিনপাহাড়ের গায়।

(জোরে মাদল)
আহা মাদল, মাতাল মাদল বাজছে তোরই
জন্যে লো!
খুশির হাওয়া, পাগলা হাওয়া গান দিল
রাজকন্যে লো!
আয়, কাছে আয়, মন দে লো!

তিন

চোখ কেন তোর কাঁপছে মেয়ে
বুক কেন তোর দুলছে?
গাল দুখানি লালচে, শরীর
সাপের মতোই ফুলছে?
কাকে মারবি ছোবল লো,
কোন্ ছেলে তোর কী করল?
মাদল ভেবে কেউ কি তোকে
আজকে বাজাল?
ফুল দিয়ে নয়, ফাগ ছড়িয়ে
বিকেল সাজাল?
কেমন দিবি সাজা রে,
আর যাবিনে পাহাড়ে?

চার

এত গান আকাশে
এত গান বাতাসে!
সাঁওতাল মেয়েটির টিপ কপালে
ছেলেটি পিছন তবু নিল কী বলে?
রাঙাফুল মেয়েটির খোঁপায় জ্বলে
ছেলেটি বাজাল বাঁশি তবু কী বলে?
এত মদ আকাশে
এত মদ বাতাসে!

নেশা যেন ধরে যায় ছেলেটির বাঁশিতে
মনে হয় দোষ নেই ভালোবাসা-বাসিতে;
তবে চাঁদ সরে যাও, যাও তাহলে...
'ও ছেলে, পিছন তুই নিলি কী বলে?'

'পথ ভুলে গেছি মেয়ে, খিলখিল হাসিতে;
'শোন, কোনো দোষ নেই
ভালোবাসা-বাসিতে।'

এত আলো আকাশে
এত আলো বাতাসে!

বই: লখীন্দর। প্রথম প্রকাশ: ১৩৬৩

'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে'

একটি পুরনো রূপকথা

একটি মেয়ে উপুড় হয়ে কাঁদছে যন্ত্রণায়
বিবর্ণ তার নয়ন দুটি, কিন্তু বড় মিঠে।
একটি ছেলে জানে না, তাই অঘোরে নিদ্রা যায়
জানলে পরে থাকতো এখন পঙ্খীরাজের পিঠে।

বই: মুখে যদি রক্ত ওঠে। প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৪

কালো মানুষের গান

(পল রবসন-কে মনে রেখে)

তুমি
পৃথিবীর কালোমানুষের গান,
অপমানিতের চোখের জলকে লাবণ্য করো
তোমার প্রেমে

আর প্রতিবাদ করো
অপ্রেমের অশুচি স্পর্ধার;

তুমি
পৃথিবীর বিষণ্ণ মানুষের গান...

বই: শীত বসন্তের গল্প। প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৭

ছত্রিশ হাজার লাইন

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি সমস্ত জীবন ধরে
একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম
একটি গাছ জন্মাতে পারতাম
যে-গাছ ফুল ফল ছায়া দেয়
যার ফুলে প্রজাপতি আসে, যার ফলে
পাখিদের ক্ষুধা মেটে;

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি মাটিকে জানতাম!

বই: মহাদেবের দুয়ার। প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৭

উলঙ্গের স্বদেশ

'The proletariat has nothing to lose,
but his chain'. – Communist

এক অদ্ভুত মাটির উপর
আমরা দাঁড়িয়ে আছি;
অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থাকার জন্য
প্রাণপণ চেষ্টা করছি।

এ মাটির গর্ভে কী আছে
আজও আমাদের জানা নেই;
যদিও কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায়
এক লক্ষ সাপের গর্জনের চেয়েও
কোনো ভয়ংকর পরিণাম, যা ক্রমেই আসন্ন হচ্ছে।

কিন্তু আমরা একপাও এদিক-ওদিক
নড়ছি না; যেন স্থির দাঁড়িয়ে থাকাই
আমাদের নিরাপত্তা, এবং তা সম্ভব। আমরা গির্জার গম্বুজগুলির
এবং স্টক এক্সচেঞ্জের চারদিকের বিরাট স্তম্ভগুলির দিকে
বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকে
এক সময় ঈশ্বরের মহিমাকে জানতে পারছি
আর এই কথা ভেবে নিশ্চিন্ত হচ্ছি,
আমাদের স্বদেশ স্বাধীন এবং তার সীমান্তে
বন্দুকধারী প্রহরীরা প্রত্যহ টহল দিচ্ছে।

যদিও পায়ের নীচে মাটি এখন অগ্নিগর্ভ;
যদিও আমাদের মাথার উপর আকাশ বলতে কিছুই নেই।

বই: মানুষের মুখ। প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৮

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি চিঠি

সংকলন: মিত্রা চট্টোপাধ্যায়

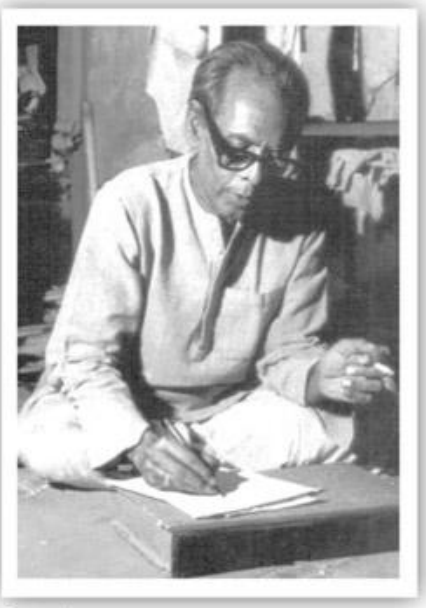

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অরুণ মিত্রকে লেখা কবির চিঠি /১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার পুরস্কার আপনাদের স্নেহ, সহিষ্ণুতারই পুরস্কার। কবি হিসেবে আপনি চিরকাল শ্রদ্ধেয়, কিন্তু আপনাদের দুজনের কাছে আমি যে প্রীতি ও প্রশ্রয় আমার যৌবনকালে পেয়েছি, তার মূল্য আমার কাছে অনেক। পুরস্কার গুণের। কিন্তু আমি এ-ও জানি আমার চেয়ে ভাল কবি কয়েকজন আছেন, যাঁরা এখনও পর্যন্ত কোনো পুরস্কারই পান নি। অবশ্য তাঁরা আমার মতো হৈ-চৈ করেন না। আজকে আমি যে আনুষ্ঠানিক পুরস্কার পেলাম তার চেয়ে আমার কাছে কম গুণের সংবাদ ছিল না। যেদিন আমাকে এই সামান্য স্বীকৃতিটুকু দেওয়া হয়েছিল, আমার ভিতরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ছিল। আপনার প্রতি (কবিদের ছাড়া) তথাকথিত গুণীজনদের অবহেলায়। আমার কপাল ভাল যে আমার আগে আপনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। নইলে পুরস্কার পেয়েও আমি বেদনাবোধ করতাম। এসব কথা আপনাদের লিখে জানানো উচিত বলেই এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে।

আমার স্বভাব কিছুটা উদ্ধত, এজন্য মাঝে মধ্যে আপনাদের বেদনা দিয়েছি। আপনারা নিজগুণে তা ক্ষমা করেছেন। এই ক্ষমা ও প্রীতি কি জিনিস, যারা পেয়েছে, তারাই জানে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ছোটদের প্রীতি জানাই।

প্রণত

বীরেন চট্টোপাধ্যায়

(চিঠিতে তারিখ নেই)

যেদিন আমাকে এই সামান্য স্বীকৃতিটুকু দেওয়া হয়েছিল, আমার ভিতরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ছিল। আপনার প্রতি (কবিদের ছাড়া) তথাকথিত গুণীজনদের অবহেলায়। আমার কপাল ভাল যে আমার আগে আপনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। নইলে পুরস্কার পেয়েও আমি বেদনাবোধ করতাম।

অরুণ মিত্রকে লেখা কবির চিঠি /২

১৩ জুন, ১৯৬৭

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগলো। যখন প্রায় কবিতা লিখতে শুরু করি, সে সময় আপনার এবং বিমলদার স্নেহ পেয়েছিলাম। সে জন্য আপনাদের কাছ থেকে এখনও কোনো মিষ্টি কথা শুনতে পেলে, আমার কাছে তা অনেকখানি। এখন আমাদের চারদিকে কবিতার কোন আবহাওয়াই নেই; বোধহয় সমস্ত পৃথিবীতেই নেই। সেজন্য মাঝেমধ্যেই মনে হয়, আমরা হয়তো হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলছি, যেখানে পরাজয় অনিবার্য।

কিন্তু তবু, এ সময়ে পিছনে হাঁটতেও আমার আপত্তি আছে। এবং নিশ্চয় এটা আমাদের সকলের কথা। পৃথিবী থেকে একদিন কবিতা যদি মুছেই যায়, চারদিকে কবিতার নামে যদি অশ্লীল ইতরামো আর মাতালের অট্টহাসিই ভেসে আসতে থাকে, আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের কর্তব্য পালন করে যাবো। এমন কি তা যদি Don Quixote-এর পাগলামোও হয়; ক্ষতি কি?

প্রণত

পুন: আপনাদের কুশল কামনা করি।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

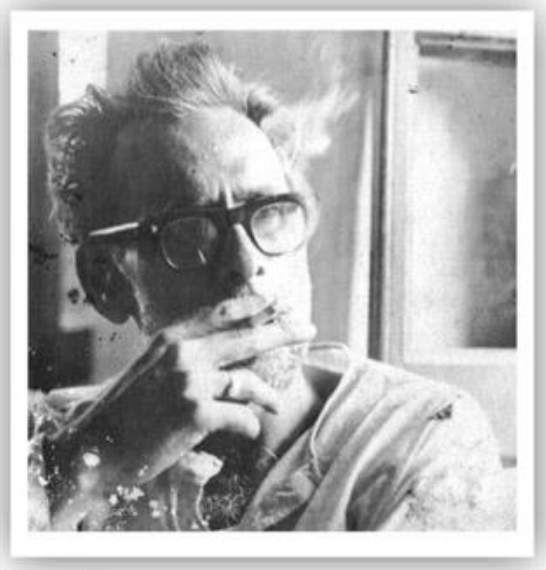

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কালীকৃষ্ণ গুহকে লেখা কবির চিঠি /১

৭ মার্চ, ১৯৭৮
সুচরিতেষু,

অল্পের জন্য দেখা হল না। কফি হাউস পর্যন্ত গিয়েছিলাম আপনাকে খুঁজতে। কুড়ি টাকা পেয়েছি। চিঠি পেয়েছি, দেখা হলে একটি ভাল খবর দিতে পারতাম, তবে ওজনে খুব ভারি নয়; ভাল এই পর্যন্ত। পত্রপাঠ আমাকে একটি, দুটি, তিনটি কবিতা পাঠাতে পারেন কি? কাজে লাগাই। ফেরত ডাকে পেলে, তবেই। আপনি ঠিকই লিখেছেন, যেখানে উভয়ের লেখা আছে। ঐ পত্রিকাই সম্বল। অন্য পত্র-পত্রিকা আমার হিসেবের বাইরে।

বয়স বাড়ছে। না'হলে অলোকের সঙ্গে একদিন দেখা করতাম। কোন কিছুই পাথরের মতো স্থাবর নয়। দিন বদলায়। তবে সময় লাগে বই কি? মাঝেমধ্যে আমরা যে ভয়ানক বিপন্ন হই, তার অনেক কারণ আছে। আমি আবার চেষ্টা করছি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে। আপনারা সহায়। তবে, আমার বয়স সত্যিই এখন চোখ রাঙায়। আর কতকাল কাঁধে ঝুলি ব'য়ে পরের পকেটে হাত গলিয়ে বই বিক্রি করবো, বই বের করবো? বয়স এখন প্রচণ্ড বাধা!

তবে থামছি না, যদি আপনারা জোর দেন। আর, আমার কাছ থেকে আপনারাও সক্রিয় শুভেচ্ছা পাবেন, যাঁরা প্রকৃত কবি আর যাঁরা পৃথিবীটাকে ভালর দিকে বদলাতে চান, সেই সব কবি (তাঁদের লেখা কবিতা অথবা ইস্তেহার ঐ বিচার আমি করবো না। তাদের জোর আছে কিনা ঐটি অবশ্য বিচার্য)। অবশ্য কবিও জাত কবি হতে পারেন। সে তো আরও সুখের।

আজ এই পর্যন্ত। আশা করি সবাই, বাড়ির সবাই এবং নিকট বন্ধুরা ভালো আছেন।

৭-৩-৭৮
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কালীকৃষ্ণ গুহকে লেখা কবির চিঠি /২

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫
সুচরিতেষু,

২ সেপ্টেম্বরের চিঠি পেলাম। আমারও মনে ছিল, আপনাকে চিঠি দিতে হবে। বিশেষ করে পুত্রকে আশীর্বাদ জানিয়ে। শরীর খুব খারাপ, মন নানা কারণে বিষণ্ণ। এই বিচ্ছিন্নতা চিঠিতেও লাগতে পারে, হয়তো তাই; কিংবা ক্লান্তিই হয়তো প্রধান, শেষপর্যন্ত কিছুই করিনি।

ডান হাতের ওপর দিকটা অচল। ব্যথার জন্য ঘুমুতে পারি না। বাঁ হাতটাও আক্রান্ত হ'চ্ছে। আরও নানা অস্বস্তি রয়েছে শরীরের ভিতর। কিন্তু যা অধিক ভয়ঙ্কর, কবিতার বই একেবারেই বিক্রি হ'চ্ছে না। প্রায় ছ'বছর আগে retire করেছি, পেনশন নেই। চা-সিগারেট অপরে খাওয়ালে তবে জুটবে, ঐ দিন আবার ফিরে আসছে। যৌবনে এই অবস্থায় একটানা কয়েক বছর কেটেছে— কবিতা তখন আমাকে বাঁচিয়েছে। এখন আর তা হয় না। ভীতিটা এবার আরও বেশী বাস্তব। কিছুদিন ধরে শরীরে চাপা জ্বর বুঝতে পারছি। কিন্তু ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি না। এখন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চ'লে যেতে চাই। পুত্র-কন্যারা খুবই কাছের, তারা যে আমাকে দুর্দিনে দেখবে না, তা ঠিক নয়। তবু মানুষ শেষজীবনে কপর্দকহীন বেঁচে থাকতে চায় না, থাকা উচিত নয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু হলে অন্য কথা ছিল, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী নই।

কিন্তু যা অধিক ভয়ঙ্কর, কবিতার বই একেবারেই বিক্রি হ'চ্ছে না। প্রায় ছ'বছর আগে retire করেছি, পেনশন নেই।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ শুভেচ্ছা থেকেই যায়। কাছের মানুষদের জন্য। আপনারা আমার কাছের।

শোভন সোমকে লেখা কবির চিঠি /১

১৪ মে, ১৯৬৮
প্রীতিভাজনেষু,

কবিতা পেয়েছি এবং ভাল লাগলো। আশা করি এখন শরীর অনেক সুস্থ। আমি enlarged liver ও ভয়ানক Low Pressure-এ ভুগছি। শরীর খুবই ক্লান্ত লাগে। তার ওপর বর্তমানে কলকাতায় কবিতার ওপর যেভাবে নানাভাবে বলাৎকার চলছে, তাতে মানসিক দিক থেকেও পীড়িত বোধ করছি। সর্বত্রই অসুস্থ আবহাওয়া।

আপনাকে বিশেষ অনুরোধ জানাই, আরও কবিতা এবং অনেক কবিতা লিখুন।

শুভেচ্ছাসহ
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১)
প্রীতিভাজনেষু,
গোর্কিকে নিবেদিত কবিতার সংকলন 'অমল মানুষ' প্রকাশিত হয়েছে।

আপনাকে বইটি Regd. Book Post-এ পাঠাতে সামান্য দেরী হ'তে পারে। আপনার কবিতার শিরোনামায় সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। তেতো মানুষের জায়গায় 'অমল মানুষ', কবিতাটি খুবই ভালো লেগেছে হয়তো আগে জানানো হয়নি।

(২)

'কার্ল মার্কস' এবং 'লেনিন'-এর নাম মনে রেখে অথবা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোকে সামনে রেখে একটি/দুটি কবিতা আমাকে লিখে পাঠাতে পারেন কি? শারদীয় গণবার্তায় মার্কস-কে নিবেদিত কিছু কবিতা থাকবে। আপনার একটি কবিতা পেলে খুবই ভালো হয়।

আমি বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম। আর্থিক দুরবস্থাও চরম। ফলে বাইরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হতে চলেছে। আপনাদের কয়েকজনকে Regd. করে বই পাঠাবো, সে পয়সাও এখন হাতে নেই। আপনাকে আমি এত বেশী স্নেহ করি যে আপনি আমার সমস্ত রকম গাফিলাতি মার্জনা করবেন, এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। তবু খারাপ লাগে।

১১-৭-১৯৬৮

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শোভন সোমকে লেখা কবির চিঠি /২

২২ জানুয়ারি, ১৯৬৮

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। আমি সম্পূর্ণ ভাল আছি, অর্থাৎ আইন অমান্যের ব্যাপারে শরীরে কোনও দাগ লাগে নি। এমনিতে শারীরিক সুস্থ থাকার বয়েস আর নেই। কিন্তু আপনি জানতে চাইছেন অন্য কথা।

মাত্র পনেরোদিন জেলে ছিলাম। এখনও বিচার হয়নি, হয়তো আবার যেতে হবে। কিন্তু তাতে চিন্তা করার কিছু নেই। আইন ভাঙার সময় যদি শরীর অক্ষত থাকে, তবে ওদিককার ফাঁড়া কেটে যায়। চাকুরিস্থলের সমস্যা বেশীদিন আটকে থাকলে আসতে পারে, অল্পকাল হলে ভয়ের কিছু নেই।

এখানে গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে যে অমানুষিকতা ঘ'টে গেল তাতে মানুষ হিসেবে স্থির থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এর মধ্যেই কবি-সাহিত্যিকেরা ভালই আছেন। তাঁরা এভাবে দানবীয় কার্যকলাপগুলি অবলীলাক্রমে মেনে নিলেন (অবশ্য তাঁদের পিঠে সত্যি লাঠি বা বন্দুকের কুঁদে পড়েনি) তা দেখবার মতো।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আপনি জানেন, কলকাতার অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার বনে না। আজ পার্থক্য আরও বেশি মনে হচ্ছে। এর কারণ এই নয় যে আমি রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখি। এর কারণ আমি এখনও মনুষ্যত্বকে কিছু মূল্য দিই।

এঁদের সঙ্গে অনেক Humanist কবি-সাহিত্যিক আছেন। আপনি জানেন, কলকাতার অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার বনে না। আজ পার্থক্য আরও বেশি মনে হচ্ছে। এর কারণ এই নয় যে আমি রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখি। এর কারণ আমি এখনও মনুষ্যত্বকে কিছু মূল্য দিই।

আপনার কুশলতা সকল সময় কামনা করি। মাকে আমার প্রণাম এবং ভগিনীকে প্রীতি দেবেন। কন্যার প্রতি শুভেচ্ছা রইল।

২২-১-৬৮

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অতীন্দ্র মজুমদারকে লেখা কবির চিঠি

২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯

অতীন, তোমার চিঠি কয়েকদিন আগে পেয়েছি। বোধহয় ইতিমধ্যে শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছ থেকে তুমিও চিঠি পেয়েছ। নবদ্বীপ সম্পূর্ণ matter compose ক'রে তারপর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে আবার ভেঙে ফেলেছে। বুদ্ধদেব যখন তাঁকে জানান, তিনি proof দেখে দেবেন, তখন দেরী হয়ে গেছে। তুমি আমাকেও কিছু বলে যাও নি। পরে তো দেখাই হয়নি। মণীর কাছ থেকে cover-এর কাগজ (ছাপা) নবদ্বীপে পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু বই কবে পর্যন্ত বের হবে, এখনই বলা যাচ্ছে না।

আশা করি Sea mail-এ, 'Burning Decade' ২ কপি পেয়েছ। তোমার পক্ষে সম্ভব হলে আমাকে কিছু টাকা পাঠাও। কাজে লাগাব।

আজ এই পর্যন্ত। তোমার বই বেরুলে Review ইত্যাদি ব্যাপারে যা করবার করবো। আগের বইটিও Review করানো যেতো, কিন্তু বই কোথায়? যেখানেই সমালোচনা বেরুবে, সেখানেই ২ কপি করে দরকার।

দুটি কবিতা পাঠাচ্ছি, অবশ্যই Printed তোমার কেমন লাগলো, জানতে পারলে খুশি হব।

চতুর্দিকে স্বদেশ

আলো জললে স্বদেশ
অন্ধকারও স্বদেশ।
মন্ত্রী যখন ন্যাংটো ছেলের কান ম'লে দেন
বুঝতে পারি,
চতুর্দিকে সভা করেছে স্বদেশ।

ফুটপাথের কবিতা

ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়।
যদিও তার নিজের পুড়ছে গা
ফুটপাথে আজ জেগেছে জোছ্ নাঃ
চাঁদ হেসে তার কপালে চুমু খায়।
লুকিয়ে মোছেন চোখের জল মা।

আমরা একরকম। তবে বিষণ্ণতা আছে, ক্লান্তিও বাড়ছে। রাস্তা হাঁটতে পর্যন্ত মাঝেমধ্যে শ্বাসকষ্ট ভয় দেখায়। তবে ঐসব বিরুদ্ধতাই সব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি, সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিনি। যদিও মাঝেমধ্যেই ভয়ংকর একা, তবু মানুষে বিশ্বাস এখনও ত্যাগ করিনি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নাও

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবিতা-পরিচয়

একটি উজ্জ্বল মাছ : বিনয় মজুমদার

জ্যোতির্ময় দত্ত

একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেলো— এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে
বেদনার গাঢ় রসে আপক্ক রক্তিম হলো ফল।

বিপন্ন মরাল ওড়ে, অবিরাম পলায়ন করে,
যেহেতু সকলে জানে তার সাদা পালকের নীচে
রয়েছে উদগ্রউষ্ণ মাংস আর মেদ;
স্বল্পায়ু বিশ্রাম নেয় পরিশ্রান্ত পাহাড়ে পাহাড়ে;
সমস্ত জলীয় গান বাষ্পীভূত হয়ে যায়, তবু
এমন সময়ে তুমি, হে সমুদ্রমৎস্য, তুমি... তুমি...

কিম্বা, দ্যাখ, ইতস্তত অসুস্থ বৃক্ষেরা
পৃথিবীর পল্লবিত ব্যাপ্ত বনস্থলী
দীর্ঘ দীর্ঘ ক্লান্তশ্বাসে আলোড়িত করে;
তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে দূরে
চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।

এই কবিতাটির সবই এত রহস্যময় যে প্রথমে পাঠকের সন্দেহ হতে পারে সত্যই কি কবিতাটি রহস্যময়, না নিতান্তই উদ্ভট, নাকি অত্যন্তই সরল। কবিতায় যা সত্যই নতুন, তাকে হামেশাই নতুন বলে চেনা শক্ত। কবিতাটির প্রথম বিস্ময় যে এটা 'ফিরে এসো চাকা'-র প্রথম কবিতা। এটা কথা নিয়ে খেলা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আক্ষরিক অর্থে সত্য। 'ফিরে এসো চাকা'-র মধ্যে ভাব ও চিন্তার বিবর্তন আছে কিন্তু প্রকরণের নেই; এই চক্রের প্রথম থেকেই বিনয় মজুমদার এক পরিণত কবি। তিনি ধীরে-ধীরে এখানে পৌঁছননি, যেন মুহূর্তেই আবির্ভূত হলেন। এক নতুন চেতনার জন্মের তারিখ সচরাচর উল্লেখ করা যায় না; এমনকী নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের আগে ও পরে রবীন্দ্রনাথ বদলেছেন। কিন্তু 'ফিরে এসো চাকা'-র কবি পূর্বাপরহীন। ১৯৬০-এর ৩ মার্চ বিনয় মজুমদার একটি নতুন চেতনার জন্ম দিলেন, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পলোক, যেন সম্পূর্ণ ইতিহাসমুক্ত, যার গর্ভ ও শৈশবের মলিনতা নেই।

কিন্তু ইতিহাস আছে, আছে বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ। আমি অন্যত্রও সবিস্তারে সে-আলোচনা করেছি; এখানে আমি শুধু এই কবিতাটির সঙ্গে 'ফিরে এসো চাকা'-র পুরো চক্রের যোগ নির্দেশ করতে চাই। এই প্রথম কবিতাটি লেখার সঙ্গে সঙ্গে বিনয় মজুমদার এমন একটি রহস্যের জন্ম দিলেন যার পরিপূরক হিসেবে 'ফিরে এসো চাকা'-র বাকি পঁচাত্তরটি কবিতা অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। অবশ্যপ্রয়োজনীয়, কিন্তু অবশ্যাম্ভাবী নয়। তাহলে তো বাকি কয়টি কবিতা না-লিখলেও চলত; পাঠকেরা নিজেদের কল্পনায় তা পরিপূরণ করে নিতে পারতেন। প্রভেদটা হয়তো পরিষ্কার হল না এই সন্দেহে আমি একটি উপমার আশ্রয় নিচ্ছি। কোনও কোনও জ্যামিতিক আকার, এমনকী বাস্তবে কোনও কোনও গড়ন আছে যার অংশমাত্র দর্শনেই আমরা সম্পূর্ণটা অনুমান করে নিতে পারি। একটি বৃত্তাংশ থেকে পুরো বৃত্তের ব্যাস ও কেন্দ্র জানা সম্ভব; এক তিন পাঁচের সংখ্যানুক্রম থেকে সাত কি নয় কি একশো উনতিরিশে উপনীত হতে পারি; কমলালেবুর একটি কোয়া দেখলেই পুরো লেবুটার রহস্য পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু অক্টোপাসের শুণ্ডের শীর্ষটুকু দেখে বাকি প্রাণীটাকে অনুমান করা যায় না; অথচ পুরো অক্টোপাস দেখে কে না মানবেন যে তার পরিবেশ ও জীবনযাত্রার পক্ষে তার শরীর পরম পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও তর্কাতীত, মোটেই বিদঘুটে নয়?

'ফিরে এসো চাকা'-র প্রথম কবিতা প্রথম পংক্তি থেকেই এমন এক অভাবনীয় চিন্তা— অভাবনীয় এই অর্থে যে আমরা তা ভাবতে চাই না— কবি উপস্থিত করলেন, যার পর সেটা না-ভেবে থাকা আর আমাদের সম্ভব নয়। একটি মাছ জল ছেড়ে বাতাসের জগতে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল,— পারেনি। কোনও অন্যলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা আর কেউ দেখেনি, দেখেছিল এক ফল।

পংক্তিগুলি আরেকবার পড়ুন; এই কবি 'আপাতদৃষ্টিতে স্বচ্ছ কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বড়োই চতুর'; পাঠককে তিনি সারল্যের ভান করে ঠকাতে ভালোবাসেন। মাছটি যে-জল ছেড়ে আসতে চেয়েছিল তা নাকি আপাতদৃষ্টিতে সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ, এটার অর্থটা কী? কিংবা এটা এত কাড়ানাকাড়া পিটিয়ে বলার দরকারটা কী? এত জোর করে, যেন এটা সর্বসম্মত নয়, যেন এটা একটা নতুন আবিষ্কার? আমরা ওই কথাগুলি লক্ষ করি না এই কারণে যে কথাটা তো আমাদের জানা, এবং এই সুযোগে, আমাদের অলক্ষ্যে, একটি সন্দেহের বীজ কবি ঢুকিয়ে দিলেন। বিনয় যেন বলছেন, হ্যাঁ, আমিও জানি জল স্বচ্ছ, আমি যে জলের নীলত্বের উল্লেখ করেছি তা কেবল দৃষ্টিভ্রমজনিত, কিন্তু এই ঘোষণা থেকেই বোঝা যায় যে জল নীল কি নীল নয় তা তাঁর এক মহাভাবনার ব্যাপার।

কেন ভাবনার ব্যাপার তা বিনয়ের কবিতার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের বিস্তারিত করে বলার প্রয়োজন নেই। 'ফিরে এসো চাকা'য় কবি যাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছেন সেই জননী/প্রেমিকা/ঈশ্বর আছেন কিনা, কিংবা কোনওকালেই ছিলেন কি না সে সম্পর্কে কবিও নিশ্চিত নন। কখনও তাঁর মনে হয় যে এই তুমি-কে তিনি যে দেখতে পাচ্ছেন না তার কারণ সে নেই বলে নয়, কিংবা দূরে বলেও নয়, বরং খুব কাছে বলে:

নিজের চুলের মৃদু ঘ্রাণের মতন তোমাকেও
হয়তো পাইনা আমি... (ফিরে এসো চাকা, ২০)

কখনও তার অনুপস্থিতি স্নেহহীন জননীর উপেক্ষার সঙ্গে তুলনা করেন। মৎস্যমাতা যেমন মোহনায় অণ্ডপ্রসব করে চলে যায় সুদূর সাগরে, সেও

তেমনি চলে গিয়েছে অন্য কোনও লোকে, কিন্তু তার অনুপস্থিতি প্রমাণ করে না যে সে কাল্পনিক:

শৈশবে হৃদয় দিয়ে পালন করায় অপারগ
শাশ্বত মাছের মতো বিস্মরণশীলা যেন তুমি। (ফিরে এসো চাকা, ২৪)

আবার কখনও তিনি যেন মেনে নেন যে এই 'তুমি' কাল্পনিক:

অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতার
সংবাদের মতো জেনেছি তোমাকে; বাতাসের
নীলাভতাহেতু দিনে আকাশকে নীল মনে হয়। (ফিরে এসো চাকা, ২১)

কিন্তু মেনে নিয়েও নেন না। পুরো কবিতাটি পড়া যাক:

অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতার
সংবাদের মতো জেনেছি তোমাকে; বাতাসের
নীলাভতাহেতু দিনে আকাশকে নীল মনে হয়।
বালুময় বেলাভূমি চিত্রিত করার পরেকার
তরঙ্গের মতো লুপ্ত, অবলুপ্ত তুমি, মনোলীনা।
এতোকাল মনে হতো, তুমিও এসেছ অভিসারে—
চাঁদের উপর দিয়ে স্বচ্ছ মেঘ ভেসে ভেসে গেলে
যেমন প্রতীতি হয়, মেঘ নয়, চাঁদ চলমান।

এখন জেনেছি সব, তবুও প্রয়াস প'ড়ে আছে।
শিশুদের আহার্যের মতন সরল হও তুমি,
সরল তরল হও; বিকাশের রীতিনীতি এই।
বৃক্ষের প্রত্যঙ্গ নড়ে— এই দৃশ্য দেখেই কখনো
সে নিজে দোলনক্ষম— এই কথা পাখিদের মতো
ভুল ক'রে ভেবেছ কি, তোমার বাতাসে সে তো দোলে।

চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তিতে বিনয় যেন প্রথম তিন পংক্তিরই পুনরুক্তি করেছেন। কিন্তু বালির ওপর ঢেউয়ের লেখা— যদিও তার আয়ু ক্ষণিক, বাতাস ও স্রোতের পরিবর্তনেই তা মুছে যাবে— ঠিক আকাশের বর্ণহীনতার মতো অলীক নয়। আর বালির রেখা যতই অচির হোক, তা কোনও এক ঢেউ সৃষ্টি করেছিল, যদিও অন্য এক ঢেউ এসে তা মুছে ফেলেছে। সুতরাং যদিও বিনয় প্রকাশ্যে তাকে মনোলীনা বলছেন, সে সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। পরের তিন লাইনেও তিনি স্পষ্টত যা বলছেন গুহ্যত তার উল্টোটা ইঙ্গিত করছেন। আগে মনে হত 'তুমি' আসছ, মেঘের সচলতা হেতু চাঁদকে যেমন চলমান মনে হয়। কিন্তু আসলে তুমি অনিকটবর্তী। কিন্তু এটা বলার মানেই হল তুমি কাল্পনিক নও, যেমন চাঁদ নয়, যদিও এমন হতে পারে যে তুমি সুদূর। সুতরাং নবম পংক্তিতে তিনি যখন বলছেন তিনি সব জেনেছেন, এই ভ্রান্তি তাঁর আর নেই যে 'তুমি' বাস্তবিকই আছ, তিনিও অন্য সবার মতোই এখন মানেন আকাশ নীল নয়, তখন তিনি কিন্তু আসলে প্রতিষ্ঠা করছেন যে 'তুমি' দৃষ্টিভ্রম নও, কল্পনা নও। দশম ও একাদশ পংক্তিতে অবশেষে উপদেশের ছলে, তিনি এই 'তুমি' কেন দৃশ্যমান নয় তা ফাঁস করছেন। তিনি শুরুতে বলেছিলেন বালিতে রেখা রেখে ঢেউ যেমন মিলিয়ে যায় তুমি তেমন মিলিয়ে গেছ; এখন সেই একই কথাই যেন বলেছেন: মিলিয়ে যাও, দুধ যেমন অদৃশ্য হয়ে যায় শিশুর কণ্ঠে। কিন্তু ঢেউয়ের আর দুধের অন্তর্ধান এক নয়; দুধ অন্তর্হিত শুধু হয় না, শিশুর অন্তঃস্থ হয়, দুধকে আর দেখা যায় না বটে কিন্তু শিশুটির অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে তা বহমান, শিশুটিকে তা চিরজীবনের জন্য পরিবর্তিত করে। 'তুমি' শুধু পরিবর্তমান ঢেউ-এর মতো সত্য নও, তুমি নও ঢেউ-এর মতো পরিবর্তমান, তুমি চিরকাল আমার মধ্যে রয়ে গেছ। 'তুমি' কেবল সুদূর চাঁদের মতো ধ্রুব নও, তুমি নও চাঁদের মতো সুদূর, তুমি আমার একান্ত, কাছে, তুমি আমারই মধ্যে আছো। শেষ তিন পংক্তিতে তিনি বাতাসের উপমায় ফিরে গেলেন। যে-বাতাস আকাশকে নীল করে সে-বাতাস দেখা যায় না বটে কিন্তু তারই প্রভাবে বৃক্ষরা আন্দোলিত হয়। মূর্খেরা, অবুঝ পাখিরা, অবশ্য ভাবে যে গাছ 'নিজে দোলনক্ষম'; কিন্তু আমরা যে হিল্লোলিত হই তা কেবল তোমারই বাতাসে।

'তুমি'র যে সংজ্ঞা বিনয় এই কবিতায় দিলেন— 'তুমি' আমার অন্তঃস্থ, আবার 'তুমি' সর্বব্যাপ্ত, তোমার মধ্যেই আমাদের জীবন— তা স্পষ্টতই ঈশ্বরের প্রতি প্রযোজ্য। বিনয় কেন তাঁর গ্রন্থটির নাম বদলে 'ঈশ্বরীর প্রতি' রেখেছিলেন তা অনুমান করা শক্ত নয়। তাঁর কল্পনায় প্রেম, প্রেমই নয়, যদি-না এমন কেউ থাকে যার মধ্যে আমরা সবাই— গাছ মাছ পাখি ও মানুষ— এক হয়ে যেতে পারি। আর এরকম যদি কেউ না-থাকে তো আমাদের সবই অর্থহীন; ক্রন্দন ও প্রার্থনা নিষ্ফল।

'ফিরে এসো চাকা'র প্রথম কবিতাটিতে যে উজ্জ্বল মাছ উড়েছিল, তা, এখন বোঝা যায়, কী জন্য; এবং কেন এই দৃশ্য দেখে বেদনায় রক্তিম হয়েছিল ফল; এবং কেন বিনয় জোর দিচ্ছেন জলের স্বচ্ছতার ওপর। বিনয় প্রত্যক্ষত যদিও বলছেন জল নীল নয়, কিন্তু ঠিক এও বলছেন না, জল প্রকৃতই স্বচ্ছ। জলের স্বচ্ছতাও একটা প্রস্তাব, একটি মত, যে-মত তিনি অবগত আছেন। জল থেকে এক মাছ অন্য এক লোকে উত্তরণ করতে চেয়েছিল; আমরা সবাই চাই ('আমরা তো সাগরে আকাশে সঞ্চারিত হতে চাই, চিরকাল হতে অভিলাষী') সেই অন্য কাউকে ছুঁতে, প্রত্যক্ষ করতে। এই দৃশ্য আর কেউ দেখেনি, কেবল একটি ফল দেখেছিল। অবশ্যই আরও অন্তত একজন সাক্ষী ছিলেন— কবি স্বয়ং— কিন্তু তৃতীয় কোনও যে দর্শক নেই এই দৃশ্যের, যিনি থাকলে বেদনায় ফলকে রক্তিম, পক্ক, অবশেষে গলিত হতে হত না, যিনি থাকলে মাছের প্রয়াস ব্যর্থ হত না, প্রয়াসের প্রয়োজনই হত না, সেই অনুল্লিখিত অনুপস্থিতিই এই কবিতায় একমাত্র উপস্থিতি। পাখি উড়ে যায়, কিন্তু কোনও পরম পক্ষীমাতার— যাঁর উল্লেখ বিনয় এই চক্রের দ্বিতীয় কবিতায় করছেন— নীড়ে সে পৌঁছয় না। আর গাছেরা তো আমৃত্যু প্রত্যেকে যে-যার জন্মভূমিতে নির্বাসিত; অন্য কারও কাছে পৌঁছবার যে চেষ্টাটুকু অন্তত, তা যতই বিফল হোক, মীন কি হংস করতে পারে তাও অনড় গাছের সাধ্যের বাইরে।

ব্রেখ্‌ট্‌-এর একটি কবিতায় বিনয়ের গাছ ও বাতাসের ধারণার এক প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। 'প্রথম গাঁথা' নামক এই কবিতায় ব্রেখ্‌ট্‌ বলছেন:

অন্ধকার পৃথিবীর উপর আকাশের বর্তুল মুখ রাত্রে
বড়ো ভয় করে।...
পাহাড়ের গায়ে একলা একটি গাছ; সে অন্য কোনো
গাছ দেখেনি; তার কাছে গাছের পুরো ধারণাটাই অবিশ্বাস্য।
সারাক্ষণ বাতাস বয়; বাতাস বড়ো আস্তিক; সে
চায় সব কিছু যুক্ত হোক, মিলিত হোক।

ব্রেখ্‌ট্‌-এর চিন্তায় এই পৃথিবীটা এক অজ্ঞাত নির্বাসনভূমি, যার নাম-পর্যন্ত অন্য কেউ জানে না। এখানে কোনও ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর, কোনও ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী জাহাজডুবির পর, কয়েকটি প্রাণী জড়ো হয়েছি। আর কোথাও কেউ নেই। কাউকে চিৎকার করলে কেউ উত্তর দেবে না। এখানেই, পরস্পরকে হত্যা করে, ভালোবেসে, পচন ও পুষ্টির মধ্যে আমাদের কাটাতে হবে। আকাশের মুখ ভয়াবহ, কারণ তার আড়ালে আর কারও মুখ নেই। গাছের ধারণা সম্ভব নয়, কারণ গাছ অন্য কোনও গাছের চেহারা জানে না, এবং এই গাছের চেহারাও অন্য কেউ জানে না। কেবল পরম আশাবাদী হাওয়া এখনও ঘুরে ঘুরে গাছ ও পাথর ও ঢেলার মধ্যে সেতু রচনা করে।

বিনয়ও জানেন আকাশ কেবল আকাশ, কিন্তু তিনি এখনও আশা ছাড়তে পারেন না যে আকাশের নীলত্ব হয়তো পুরোপুরি কল্পনা নয়। অন্তত এটুকু তো ঠিক যে সেই অন্য কারও জন্য আমাদের পিপাসা আছে? গাছেরা অসুস্থ— কারণ বিচ্ছেদ ঘটেছে। হয়তো বিচ্ছেদ অপূরণীয়। হয়তো নয়। হঠাৎ যখন হাওয়া শান্ত হয়, গাছেরা যখন মনে হয় দম বন্ধ করে আছে, তখন কে জানে তাদের মনে কোনও অভাবনীয় স্বপ্ন উঁকি দিচ্ছে। 'ফিরে এসো চাকা'র প্রথম কবিতায় যে চিন্তা আমাদের মনেও উঁকি দিল, সেই স্বপ্ন; যখন পৃথিবীর সব গাছ দূর-দূর থেকে হেঁটে আসবে কোনও এক পরম জনকের ক্রোড়ে মিলিত হওয়ার জন্য, গাছেরা এবং পাখিরা এবং মানুষেরা, এই এমনই শ্বাসরোধী কথা যে বেশিক্ষণ ভাবা যায় না। অথচ না-ভেবেও উপায় নেই। নিঃসঙ্গ মানুষের এ-ছাড়া ভাবার আর কী আছে?

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা

নীচের প্রশ্ন-ক'টি পাঠিয়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন কবিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাঁরা যেন পৃথক-পৃথকভাবে অথবা একসঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন।—
সম্পাদক

১। আমাদের দেশে এখনকার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা কবিতা লেখার সময় আপনাকে প্রভাবিত করছে বলে আপনার মনে হয়? যদি করে, কীভাবে?

২। অত্যধিক রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশে কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা এসেছে বলে আপনার মনে হয়? অথবা কবিতাই ক্রমে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে আপনি মনে করেন? বাংলার সমাজমানসে বাংলা কবিতার প্রভাব কী রকম বলে আপনি মনে করেন?

৩। কবিতায় আপনি যে-ভাষায় কথা বলেন তার সঙ্গে মুখের ভাষার কোনও বিরোধ আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন? কবিতার ভাষাকে আপনি কি মুখের ভাষার কাছাকাছি রাখবার পক্ষপাতী? অথবা কবিতার এক নিজস্ব ভাষা-নির্মাণই আপনার লক্ষ্য? কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয় বলে সাধারণ মানুষের যে-অভিযোগ তাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

৪। জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কবিতায় সঞ্চারিত হলে, বা তা নিয়েই লিখলে, কবিতা কি আরও বেশি লোককে আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে বলে আপনি মনে করেন?

৫। এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার?

উত্তর লিখেছেন: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

১। হ্যাঁ, কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করছে বলেই তো মনে হয়। এবং তা সামাজিক মানুষ হিসেবে আমাকে স্পর্শ করছে। অবশ্য সব সময়ে সরাসরি নয়, অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষও বটে। এবং সর্বত্র যুক্তিবুদ্ধির পাকাসড়ক ধরে নয়, অনুভবের বায়ুহিল্লোলের মতোও। একেক সময় মনে হয়, আমরা সবাই একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির খাড়াই বেয়ে তার প্রকাণ্ড ফোকরটার দিকে উঠছি, কেবলই উঠছি। আর মুহূর্তে মুহূর্তে আশঙ্কা, নাকি প্রতীক্ষা: এই বুঝি ঘুমন্ত উৎসের মুখ পায়ে মাড়িয়ে তাকে উসকে দিলুম।

২। প্রথমত, 'অত্যধিক রাজনৈতিক সচেতনতা' 'কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতার' জন্ম দেয় না, অন্তত দেওয়া উচিত নয়। এর প্রমাণ লেনিন, মাও-ৎসে-তুঙ, হো চি মিন। লেনিন যে মায়াকোভস্কির চেয়ে পুশকিন পছন্দ করতেন বেশি, এ-তো আমরা শুনেছি। সত্যিকার রাজনীতি-সচেতন মানুষের কাছে রাজনীতি ও কবিতা একই সামগ্রিক জীবনদর্শনের বিভিন্ন ও পরিপূরক প্রকাশ, তাই তাদের মধ্যে মৌল-বিরোধ তিনি অনুভব করেন না। তবে কিনা, আমাদের এই দেশের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। এদেশে শ্রমিক-শ্রেণীর আনুগত্য মানা রাজনীতিতেও বিগত যুগের মধ্যবিত্ত নৈরাজ্যবাদের নঞর্থক প্রভাব এখনও দুর্মর, যার ফলে রাজনীতি ও সুকুমার কলাচর্চার মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের কথা বোধহয় একমাত্র এদেশেই কল্পনা করা হয়। তাই এটা খুব সম্ভব যে আমাদের দেশে অনেক রাজনীতি-সচেতন পাঠক একমাত্র প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক-সামাজিক কবিতা ছাড়া অন্য কবিতা সম্পর্কে সাধারণত উদাসীন থাকেন।

আবার এও ঠিক, মধ্য পঞ্চাশ দশক থেকে বাংলা কবিতায় ফিরে-ফিরতি যে নব্য রোমান্টিক রীতির প্রবর্তনা ঘটেছে, ওরিজিনাল হওয়ার লোভে তা কাব্যবস্তু ও রচনারীতিতে খেয়ালিপনা ও চমক লাগানো চূড়ান্ত করে আগের চেয়েও বেশি কবিতাকে সমাজবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। পাঠককে প্রথমে সন্ত্রস্ত ও পরে উত্তেজনার পিঠোপিঠি অবসাদের ধাক্কায় অনীহ করে তুলেছে।

ফলত, কবিতা ও পাঠককে পৃথগন্ন করার ব্যাপারে উপযুক্ত উভয় প্রভাবই খানিকটা কাজ করেছে।

'বাংলার সমাজমানস'? সেটা কী বস্তু? উনিশ শতকে পশ্চিমা শিক্ষা প্রচলনের শুরু থেকে সে 'মানস' তো দু-টুকরো হয়ে আছে। একদিকে পশ্চিমা শিক্ষাবঞ্চিত বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ— প্রধানত গ্রামাঞ্চলের মানুষ— যাঁদের মনে কৃত্তিবাস-কাশীদাস থেকে ভারতচন্দ্রের এবং ছড়া ব্রতকথা পাঁচালি কবিগান ইত্যাদির প্রভাব এখনও সক্রিয়; অপরদিকে, বিশেষ করে শহুরে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সমাজ, যাঁদের অধিকাংশের মন আজও গাঁটছড়াবাঁধা শুধুই রবীন্দ্রনাথ নজরুলে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে একদিকে আধুনিক শিল্পোদ্যোগ, প্রচার-বাহন ও লেখাপড়ার আপেক্ষিক প্রসার, অপরদিকে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন উপর্যুক্ত দুই বাংলার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ অল্প কিছুটা করতে সক্ষম হলেও ব্যবধান এখনও দুর্লঙ্ঘ্য। আর এর মধ্যে আধুনিক কবিতার প্রভাব?— বড়ই সংকীর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীর একাংশ, তরুণ কবিযশঃপ্রার্থী, কিছু রাজনৈতিক কর্মী আর কবিকুল স্বয়ং— এর বাইরে সে-প্রভাবের কথা আজও কল্পনা করা যায় কি?

৩। কবিতার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার— বিরোধ ঠিক নয়, স্বাতন্ত্র্য— অনুভব না করে উপায় নেই। কবিতার ভাষার চালটা মুখ্যত অনুভূতি ও আবেগের, চলনটা ব্যঞ্জনার, আর মুখের ভাষার আবেদন প্রয়োজনের খাতিরে প্রধানত মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধির কাছে; তাই তার চালচলন যতদূর-সম্ভব স্বচ্ছ, স্পষ্ট, সরাসরি। তবু এ তো ভোলবার নয় যে কথ্যভাষার ঝরনায় কাব্যভাষার নদী জলপান করে বাঁচে। বাচনভঙ্গি, বাকরীতি, শব্দসম্ভার, ব্যঞ্জনা— সব উপাদানের জন্যই কবিকর্মকে ফিরে-ফিরে হাত পাততে হয় মুখের ভাষার দরজায়। কবিতার নিজস্ব ভাষা-নির্মাণ অবশ্য আমার লক্ষ্য। যেহেতু দেশের ভাষার রাজপাটে সে সামন্ত-ভাষা, তাই আমি চাই বা না-চাই কবিতার ভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি থাকতেই হয়। 'কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয় বলে সাধারণ মানুষের' 'অভিযোগ' আছে না কি? ঠিক জানি না। তবে আমি এই বুঝি, কবিতার ভাষা হুবহু মুখের ভাষা হলে কাব্য বাদ পড়ার ভয়, আবার মুখের ভাষার একেবারে বিরোধী হলে কাব্য মারা পড়ার সম্ভাবনা। কাব্যভাষা কথ্যভাষার শত্রুও হবে না, আটপহুরে ঘরের লোকও হবে না। ওরা থাকবে পরস্পরের নিকট-প্রতিবেশী, বন্ধু।

৪। 'জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কবিতায় সঞ্চারিত হলে, বা তা নিয়েই লিখলে, কবিতা...আরও বেশি লোককে আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে' এ-কথা বলা যায় না। কিন্তু ওই সব সমস্যা বা প্রসঙ্গকে কবি যদি নিজের বলে অনুভব করেন, মানসিক রক্তক্ষরণে রচনায় যদি তাঁর খাঁটি কবিত্বের লালিমা লাগে তবে— হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, 'আরও বেশি লোককে আরও গভীর ভাবে' তা 'আকৃষ্ট করবে' বইকি। উপর্যুক্ত বিষয়গুলিকে কাব্যের theme হিসেবে নিলেই চলবে না, কাব্যের content হিসেবে আত্মস্থ করতে পারলে তবেই কাজ দেবে।

৫। কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল সময় নেই। আছে বলে আমি অন্তত মনে করি না। সাহিত্যের ইতিহাসে শান্ত সময়ের সাক্ষী কবিতার কাকচক্ষু অথই দীঘির সন্ধান যেমন পাই, তেমনই যুদ্ধ ও উপপ্লবের গোমুখ থেকে ফেনায়িত কল্লোলিত কাব্য-গঙ্গার উৎসারও লক্ষ করি। কে বড়, কে ছোট? কাকে ফেলে কাকে রাখি, বলুন? 'এখনকার এই সময়' অস্থির, উচ্চণ্ড, অভিনব। আমাদের সমস্ত ভাবনাচিন্তা, সমস্ত মূল্যবোধকে ধোপার পাটে অহরহ আছড়াচ্ছে সে। মস্ত মস্ত ভুল করছে, মাশুল গুনে দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ আগে কখনও এত বিচলিত হয়নি। এমন আমূল উন্মথিত অথচ এত উৎসুক আগে কখনও হয়নি। এ-ও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আর তাই এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে প্রতিকূল না অনুকূল, তা চিন্তা করার সময় দিচ্ছে কে!

কবিতা-পরিচয়, দ্বাদশ সংকলন, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

গৌর যাযাবর

১৯৯২-এর ছোটদের শ্রেষ্ঠ বই হিসাবে
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত।
বোর্ড বাঁধাই শোভন সংস্করণ।
যুধাজিৎ সেনগুপ্তের পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি ও বহুবর্ণ প্রচ্ছদ।
₹৪০

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

পুরনো অ্যালবাম

কালান্তর

১৩৫৪-১৩৫৫ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন সংখ্যায় সম্পাদকের লেখা লেখক-পরিচিতি

'বনফুল' ইঁহার প্রকৃত নাম শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। জন্ম ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩০৬। পেশা ডাক্তারী। মণিহারী ইস্কুলে, হাজারীবাগ কলেজে এবং কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কৈশোর হইতে লিখিতেছেন। 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় ইঁহার রচনা যখন প্রথম মুদ্রিত হয় তখন ইনি ইস্কুলের ছাত্র। ব্যঙ্গ-কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি লিখিয়াছেন। দীর্ঘাঙ্গ, বলিষ্ঠ, স্থূলকায়, মাংস-দুগ্ধ প্রিয় এবং ভোজন বিলাসী। রন্ধন ও গোলাপ বাগান করিবার সখ আছে। স্ত্রী শ্রীমতী লীলাবতী সাহিত্যানুরাগিণী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট।

সরোজ কুমার রায়চৌধুরী প্রথম সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করেন কবিতা দিয়ে। সুতীব্র স্বাদেশিকতা তাঁকে জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রের সংস্পর্শে আনে। বসুমতী, আনন্দবাজার প্রভৃতি বহু পত্রিকার সম্পাদনার কাজে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নব-শক্তির সম্পাদক হিসাবে ১৯৩০ সালে কারা-বরণ করেন। ইতিপূর্ব্বে যদিও এঁর কয়েকটি রচনা সুধী-সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, কারাবাসের পর তিনি 'শৃঙ্খল' নামে উপন্যাস লিখে প্রচুর প্রশংসা লাভ করেন এবং বাংলা সাহিত্যে নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নিরহঙ্কার, মার্জিত রুচি, মজলিসি লোক। আড্ডা দিতে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং আড্ডা জমাতে জানেন। বর্তমানে 'বর্তমান' সম্পাদক।

যুক্ত প্রদেশের বর্তমান গবর্ণর জনপ্রিয় নেত্রী মাননীয়া শ্রীমতী **সরোজিনী নাইডুর** প্রতিভার মধ্যে বিরোধাভাস আছে।

একদিকে রাজনীতির সংঘাতময় কঠোর জীবন, অন্যদিকে কবিতার কল্পলোকে সচ্ছন্দ চরণ-চারণা। আর, উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন আপন কীর্তির মাহাত্ম্যে। উনসত্তর বৎসর বয়স, কিন্তু কর্মক্ষমতা অনন্য-সাধারণ। বাংলারই মেয়ে, কিন্তু বরাবর বাংলার বাইরে। কবিতা লিখেছেন মাতৃভাষায় নয়, ইংরাজিতে। ভাবে ও ভাষায় মনোহর কবিতা-গ্রন্থগুলি বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে— ইউরোপীয় ও ভারতীয়। Royal Society of Literature-এর সদস্যা। অসামান্য ভাষণ-শক্তি; জনগণকে উদ্দীপিত করার কলা করায়ত্ত। ভারতীয় নারী-জাগরণে বিশিষ্ট অংশ নিয়েছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের জন্ম উড়িষ্যার ঢেনকানল রাজ্যে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা এবং প্রবন্ধ, সাহিত্যের চতুর্বিধ ক্ষেত্রেই রসিক-সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত লেখার মধ্যে এমন মার্জিত পরিচ্ছন্নতা আছে যা সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বরাবরই গান্ধীজীর অহিংস-মতবাদের উপর বিশেষ আস্থাশীল। অনাড়ম্বর, মিতভাষী এবং স্বল্পাহারী। উড়িয়া ভাষাতেও বই লিখেছেন।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯০৭ সালে নভেম্বর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ মেধাবী ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্লভ। আই এ, বি এ, ও এম এতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ঈশান স্কলারশিপ ও নানাবিধ বৃত্তি, সম্মান লাভ করেন। ষ্টেট-স্কলার হিসাবে অক্সফোর্ডে পড়তে যান। সেখানে স-সম্মানে বি লিট ও পরে ব্যরিষ্টার হয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। কেবল মেধাবী ছাত্র হিসাবে নয়, সাহিত্য, রাজনীতি ক্ষেত্রেও ইনি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। বহু সুচিন্তিত পুস্তকের ইনি রচয়িতা, বিশেষতঃ তাঁর প্রণীত India Struggles for Freedom পুস্তকটি সাহিত্য ক্ষেত্রে আলোড়ন এনেছে। ইনি সদালাপী, অমায়িক, সুবক্তা, সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হিসাবে ছাত্র মহলে এঁর অসীম প্রতিপত্তি।

আধুনিক বাংলা গল্প লেখকদের মধ্যে **মনোজ বসু** অন্যতম। ৪৬ বছর বয়স। বাংলার গ্রাম জীবনের শান্ত কোমল রূপটি অত্যন্ত সহজেই তাঁর লেখার মধ্যে প্রতিভাত হয়। রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ যে সব গল্প লিখেছেন সেখানেও বন্ধন এবং বন্ধন মুক্তির মূল সুরটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রধানত ছোট গল্প লেখেন। পাঠকদের চাহিদামত উপন্যাস এবং নাটকও লিখেছেন। শান্ত ও মিষ্টভাষী মানুষ। সাংসারিক বুদ্ধিও কম নয়। শুধু বই লিখে বাংলা দেশে চলে না বলেই বোধ হয় পুস্তক-প্রকাশের কাজও করেন। সেটা ভাল চলে।

বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়। নামের মতই প্রাচীন এঁর চেহারা। ভূষণ যদি কিছু থাকে তা হল ফাউন্টেন পেন, যার মাধ্যমে রৌদ্র ও মেঘ দুয়েরই খেলা চলে। যদি কোনও আসরে এঁকে চোখে পড়ে আপনার তাহলে বিশ্বাস করবেন 'গন্‌শার' সৃষ্টিকর্ত্তা হিসাবে, কিন্তু 'রানুর' নয়। হেসেই উড়িয়ে দেবেন যখন জানবেন যে সরল কলমটি যেমন তাঁর করায়ত্ত, গোলাকার ফুটবলও তাঁর অনুরূপ পদানত। বিহারে এঁর বাস, অথচ সাহিত্যের চক্রযানে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে অব্যাহত বিচরণ।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু গল্প-লেখকই নন, তিনি কবি এবং সম্পাদক। তাঁর সহজ সতেজ ঋজু রচনার মত মানুষটিও সাদা সাপ্টা। সরলমনা, উদার-হৃদয় বললেই তাঁর সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না। বিচিত্র ধরণের রুক্ষতা মিশে আছে মানুষটার মধ্যে। ললিতে কঠোরে মেশানো মানুষটি তাই সহজেই মনোহরণ করতে পারেন।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র। রং ফর্সা, লম্বা চওড়া গড়ন। বয়স প্রায় চল্লিশ। দেখলে কিন্তু গজেনবাবুকে সাহিত্যিক বলে মনে হবে না। কিন্তু লিখছেন বহুদিন ধরে। গল্প এবং উপন্যাস দুয়েই তিনি হাত পাকিয়েছেন মন্দ নয়। এঁর লেখা 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম' ও 'মনে ছিল আশা' বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

প্রতাপকুমার রায় সম্পাদিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত 'কালান্তর' ১৩৫৪-১৩৫৫ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত। *বানান অপরিবর্তিত। সৌজন্য: রুবি রায়।*

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

। পর্ব ১৩ ।

অভিভাবক রাজশেখর বসু

রাজশেখর বসুরা ছিলেন চার ভাই। শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর। শশিশেখরের জন্ম ১৮৭৪-এ ১৬ আগস্ট, রাজশেখরের ১৮৮০ সালের ১৬ মার্চ। পিতা দ্বারভাঙা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার। সে

কারণে রাজশেখরের এম এ পর্যন্ত পড়াশুনো বিহারে। এদিক দিয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর জীবনের প্রথম দিকের কিছুটা মিল আছে।

রাজশেখরবাবু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁকে দেখলে কে বলবে ইনিই গড্ডালিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন প্রভৃতি হাসির গল্পগ্রন্থের লেখক।

রাজশেখরবাবুর কাছে যখন যাই, তখন ১৯৫৩ সাল। 'চলচ্চিন্তা' নামে একটি প্রবন্ধগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আনবার জন্য। ওঁর প্রধান প্রকাশক ছিলেন এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স। রাজশেখর প্রধান প্রকাশক কখনও পালটাতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তবে আমরা যখন অগ্রন্থিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশে আগ্রহ দেখালাম, তখন উনি আর আপত্তি করলেন না। বললেন, হ্যাঁ, তা অবশ্য করতে পারেন।

সেই পাণ্ডুলিপি নিতে গিয়ে চমৎকৃত হলাম। শুধু পাণ্ডুলিপি পরপর সাজানো নয়, নম্বর দিয়ে দিয়ে বিষয় অনুসারে সাজানো। ছাপার কপিতে নানারকম বানান আছে। সেগুলি সব একরকম হবে। বানান কীরকম হবে সুন্দরভাবে একটি কাগজে লেখা। প্রুফরিডার কীভাবে প্রুফ দেখবেন তারও নির্দেশ আর একটি কাগজে। বললেন, এই কাগজগুলি কপি করে একটি প্রেসকে আর একটি প্রুফরিডারকে দিয়ে দেবেন। তাহলে আর অসুবিধা হবে না।

আমি পাণ্ডুলিপি বুঝে নিয়ে, প্রণাম করে বললাম, আমার নাম ভানু। আপনি আমাকে 'তুমি' বলবেন স্বচ্ছন্দে।

রাজশেখর গোঁফের ফাঁকে একটু হাসলেন, বললেন, তা বলা যায়, তবে কী জানেন, 'ভানুবাবু', 'আপনি' এসব শব্দ উচ্চারণ করলে বেশ একটা কাজের আবহাওয়া তৈরি হয়।

আমি আর কী বলব। চুপ করে রইলাম। এই 'চলচ্চিন্তা' বইটি প্রকাশের কাজ করতে গিয়ে আমি দুটি মানুষকে একত্র করেছিলাম। আমাদের বেশিরভাগ বইয়ের প্রুফ দেখতেন কৃষ্ণদয়াল বসু। 'মেন' মিত্র ইনস্টিটিউশনের বাংলার শিক্ষক। কবি। ছন্দের জ্ঞান অসাধারণ, সেই সঙ্গে বানানের, ব্যাকরণেরও। কবিশেখর কালিদাস রায়ের ছাত্র। কালিদাসবাবু বলতেন কৃষ্ণদয়ালের ব্যাকরণ-জ্ঞান আমার থেকেও বেশি। ছন্দের জ্ঞানও। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় ছন্দের অধিমাত্রা ভুল ধরেছিল। কবিগুরু প্রশংসা করে

ওকে চিঠি দিয়েছিলেন, বলেছিলেন এই ভুল তুমি ছাড়া আর কেউ ধরতে পারেনি, আসলে শব্দটা তো নাম, তাই বিকল্প শব্দ আর পাইনি।

'চলচ্চিন্তা' বইটির প্রুফ দেখার ভার কৃষ্ণদয়ালবাবু ছাড়া আর কাকেও দেওয়ার মতো ব্যক্তি তখন ছিলেন না। ওঁকেই দেওয়া হল প্রুফ দেখার ভার, রাজশেখর বসুর নির্দেশ সহ। তখন তো আর কম্পিউটার কম্পোজ কাকে বলে আমরা জানতুম না। ছিল লাইনো, আর নয়তো সীসের অক্ষর হাতে সাজিয়ে সাজিয়ে বইয়ের পৃষ্ঠা তৈরি করা। 'চলচ্চিন্তা' বইটি নিয়ে কৃষ্ণদয়ালবাবুর সঙ্গে পরামর্শ হল। ঠিক হল, প্রথম প্রুফ আমরা কেউ দেখব, কৃষ্ণদয়ালবাবু প্রথম প্রুফ সংশোধনের পর দ্বিতীয় প্রুফ। তৃতীয় বা ফাইনাল প্রুফ যাবে রাজশেখরবাবুর কাছে।

আশাপূর্ণা দেবী ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজশেখরবাবু প্রুফ দেখে চমৎকৃত। বললেন, এত সুন্দর প্রুফ দেখা ও আমার নির্দেশ ঠিক ঠিক মানা এমন জীবনে দেখিনি, কে মশাই ভদ্রলোক!

আমরা তখন কৃষ্ণদয়ালবাবুর নাম বললাম।

রাজশেখর বললেন, হ্যাঁ আমার নামটি পরিচিত লাগছে। একবার আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন? আমার 'চলন্তিকা' অভিধানটি ছাপা হবে। সংশোধনও আছে। অভিধান নতুন করে কম্পোজ, বোঝেন তো? মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া।

এই দুই ব্যক্তিত্বকে একত্র করা আমার জীবনের একটা বড় কাজ মনে হয় আজ। দুজনেই দুজনের কাজে পরম সন্তুষ্ট ছিলেন। যদিও কোনও কোনও বিষয়ে মত-পার্থক্য হত। রাজশেখরবাবু 'খুশি, বেশি' প্রভৃতি শব্দ বিশেষ্য ক্ষেত্রে ব্যবহার হলে ই-কারান্ত দিতেন, বিশেষণ হলে ঈ-কারান্ত চাইতেন। উদাহরণ দিই— (১) তোমাকে আজ খুব 'খুশী, খুশী' দেখাচ্ছে। (২) আজ আমার 'খুশি'তে আনন্দ ধরে না।

কৃষ্ণদয়ালবাবুর মত ছিল এতে বানানের জটিলতা বাড়বে। এই পার্থক্য পাঠক পড়তে পড়তেই ধরতে পারবে।

আমি কখনও এরকম সময়ে গিয়ে পড়লে দুজনের আলোচনা শুনতাম। এরকম জ্ঞানগর্ভ আলোচনা কটাই বা শোনা যায়।

রাজশেখরবাবুর কাছে যাতায়াত করতে করতে যখন আমার সহজগম্যতা বাড়ল, তখন রাজশেখরবাবুও কাজের কথার পর সাহিত্যের এটা সেটা গল্প করতেন। একদিন দুঃখ করছিলেন, রবীন্দ্রনাথ-বিভূতিভূষণের পর সাহিত্যে নিসর্গ-চর্চা কমে গিয়েছে। মানুষের চরিত্রের ওপর প্রকৃতির তো একটা প্রভাব আছে। সেটা ঔপন্যাসিক বা গল্পকাররা না দেখালে সৃষ্টি অসম্পূর্ণ থাকে।

আমি তারাশঙ্কর, বনফুলের দুয়েকটা লেখার কথা ভয়ে ভয়ে উল্লেখ করেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ-বিভূতিভূষণের পর সাহিত্যে নিসর্গ-চর্চা কমে গিয়েছে। মানুষের চরিত্রের ওপর প্রকৃতির তো একটা প্রভাব আছে। সেটা ঔপন্যাসিক বা গল্পকাররা না দেখালে সৃষ্টি অসম্পূর্ণ থাকে।

রাজশেখরবাবু স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, তা আছে বটে, তবে আমার মনে হয় বিভূতিভূষণের পর এদিকটা বেশ ঘাটতি পড়েছে। আমি 'নিসর্গ-চর্চা' নিয়ে একটি প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিছু লিখেছি।

রাজশেখরবাবু প্রমথনাথ বিশী, বনফুল, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী এঁদের লেখা পছন্দ করতেন। এঁদের বই পৌঁছে দিয়েছি ওঁর কাছে।

রাজশেখর, আশাপূর্ণা এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এক পাড়ায় কাছাকাছি থাকতেন। ৭৭, বেলতলা রোডে আশাপূর্ণা, ৫ নম্বর শ্যামানন্দ রোডে অচিন্ত্যকুমার, ৭২, বকুলবাগান রোডে রাজশেখর— এক ত্রিভুজের তিন শীর্ষবিন্দুতে যেন তিনজন অবস্থান করছেন।

রাজশেখরবাবুর সমস্ত কাজ ছিল ধরাবাঁধা। অচিন্ত্যবাবুর বসবার ঘর থেকে রাজশেখরবাবুর বাড়ির বারান্দা দেখা যেত। অচিন্ত্যবাবু একদিন দেখালেন, ভানু এই দেখো ১১টা বাজে। রাজশেখরবাবু স্নানে যাচ্ছেন বারান্দা দিয়ে। কোনও দিন এক মিনিটও এদিক-ওদিক হল না।

৩০, বিধান সরণির তাপসী প্রেস (এখন অবশ্য নেই) একসময়ে বিশ্বভারতীর বহু বই ছাপত। আগেই বলেছি, তখন তো লেটার প্রেসের যুগ। যতবার ছাপা হবে ততবারই নতুন করে কম্পোজ, অক্ষর সাজাও আর প্রুফ দ্যাখো। রবীন্দ্রনাথের একটা জটিল প্রবন্ধের বই ছাপা হবে। আগের সংস্করণে ভুল আছে তথ্যের, অভিযোগ এসেছে। কে প্রুফ দেখবে? পুলিনবিহারী সেন অনেক বলে-কয়ে রাজশেখরবাবুকে রাজি করালেন একটা করে প্রুফ দেখে দিতে।

তাপসী প্রেসের সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য আমাকে বলেছেন। তখনও রাজশেখরবাবু বেঙ্গল কেমিক্যালে যাচ্ছেন। উনি বেরোবার আগেই সূর্যবাবু গিয়েছেন। সূর্যবাবুকে দেখে বললেন, এই যে টেবিলের ওপর আপনাদের প্রুফ।

সূর্যবাবু দেখলেন, দড়ি দিয়ে গোল করে নিখুঁতভাবে বাঁধা। ওপরে প্রেসের প্রতি নির্দেশপত্র। কাজ দেখলে

সজনীকান্ত দাস ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

চোখ জুড়িয়ে যায়।

এই মানুষই ব্যস্ত সময়ের মধ্যে অন্যের লেখা পড়েন। প্রবন্ধ উপন্যাস সবকিছু। গজেনবাবুকে (গজেন্দ্রকুমার মিত্র) তাঁর উপন্যাস পড়ে লিখেছিলেন, আপনি উমার (উপন্যাসের একটি চরিত্র) জীবনে বড় কষ্ট দেখিয়েছেন, তাকে শেষজীবনে একটু শান্তির মুখ দেখাবেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর খুব ভক্ত ছিলেন। বলতেন, উনি কলম না ধরলে বাংলা সাহিত্যে এত সব আরবি-ফারসি শব্দ আসতই না।

মুজতবা আলীও ওঁর লেখার বড় সমঝদার। আমাকে বলেছিলেন, ভানু, 'ঠোঁটের সিন্দুর অক্ষয় হোক' এমন একটা লাইন কেউ ভাবতে পারে?

রাজশেখরবাবুর বইয়ের চিত্রশিল্পী ছিলেন যতীন সেন। বহুদিনের বন্ধু। যখনই দেখতাম দুজনে বসে আছেন। চুপচাপ। কোনও কথাবার্তা নেই। এর মধ্যে বৈকালিক জলযোগ হল। সেও প্রায় নিঃশব্দেই। এর মধ্যে যতীন সেন মশাইয়ের সঙ্গে হৃদ্যতা হল রাজশেখরবাবুর দাদা শশিশেখর বসুর বইটির কভার আঁকার বিষয়ে। দুই বন্ধুতে বসে কভার কী রঙের হবে, বইয়ের সাইজ কী হবে ঠিক করে দিলেন। নামও দিলেন রাজশেখর 'যা দেখেছি যা শুনেছি।'

শশিশেখর রাজশেখরের অগ্রজ। ছয় বছরের বড়। পড়াশুনো ম্যাট্রিকুলেশন বা এন্ট্রান্স পর্যন্ত। কিন্তু অল্প বয়সেই পায়োনিয়র ইংলিশম্যান পত্রিকায় ইংরিজি প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। আটাত্তর বছর বয়সে তাঁর খেয়াল হল বাংলায় লেখা যাক। তার আগে তিনি নিজেও বোধহয় জানতেন না এমন সরস রচনা তাঁর হাত দিয়ে বেরতে পারে। শশিশেখরের বাংলা লেখা পড়ে এমনই চমকে গিয়েছিলেন স্বয়ং রাজশেখর, লোক পাঠিয়ে খবর নিয়েছিলেন, দ্যাখ তো এই লেখক আমার দাদা কিনা? এই শশিশেখর আটাত্তর বছর বয়সে বাংলা লেখা শুরু করেন আর তিন বছরেই পরপারে। কী রসের বই লিখে গিয়েছেন তা যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন। এই মানুষই যখন লেখেন 'রাজশেখরের ছেলেবেলা' রাজশেখর বলেন, না না এটা লেখা উচিত হয়নি, ভেরি ব্যাড, এটা বইয়ে যাবে না। তবু নতুন সংস্করণে বইয়ের শেষে তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। আশা করছি ওপার থেকে রাজশেখর আমাকে ক্ষমা করবেন।

রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা বেরিয়েছিল কথাসাহিত্য থেকে। ১৯৫৮ সালে। তাঁর মত নিতে যাই। আপত্তি ছিল খুবই, তবে আমাদের উপরোধে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দেন। কথায় কথায় একবার বলেছিলেন, দেখুন আমি ইদানীংকার লেখকদের লেখা পড়েছি কম, তবে যা পড়েছি তাতে তিন জনের বাংলা লেখায় কোনও ভুল পাইনি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সরলাবালা সরকার ও সজনীকান্ত দাস।

কথাসাহিত্য পত্রিকার জন্য লেখা আনতে গিয়েছি, যে সময়ে যেতে বলেছেন ঠিক সময়ে গিয়ে কখনও ফিরে আসতে হয়নি। পাণ্ডুলিপিও কী চমৎকার, কালো কালিতে পরিচ্ছন্ন সুস্পষ্ট সুন্দর অক্ষরে লেখা। কোথাও শব্দ বদলাতে হলে সেটি ছোট আকারে কাগজে লিখে পাণ্ডুলিপিতে সাঁটা।

কথাসাহিত্যের রাজশেখর বসু সংবর্ধনায় গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলেন। তাঁকে রাজশেখরবাবু বলেছিলেন গল্প প্রভৃতি হালকা লেখাগুলি উনি 'পরশুরাম' নামে লেখেন। আর প্রবন্ধ ইত্যাদি স্বনামে অর্থাৎ 'রাজশেখর বসু' নামে লেখেন।

আর যে চমকপ্রদ তথ্য দেন গৌরীশঙ্করবাবুকে সেটি হল মূল সংস্কৃত থেকে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ ও চলন্তিকা অভিধান প্রণয়ন। এগুলি নাকি সময় কাটানোর জন্য।

অথচ আমরা সবাই তো জানি, অভিধান প্রণয়নের জন্য একান্ত মনঃসংযোগ ও অভিনিবেশ প্রয়োজন। গৃহস্থালির নানা প্রয়োজন ও প্রশ্ন থাকতেই পারে। রাজশেখরও তা জানতেন। সম্ভাব্য প্রশ্ন ও তার উত্তর লিখে রাখতেন। প্রশ্নের দরকার মতো উত্তরপত্র এগিয়ে দিতেন। সহধর্মিণী এক পারিবারিক বন্ধুর কাছে অনুযোগ করেছিলেন, দেখুন না, আমার প্রশ্নের উত্তরেও আমাকে কাগজ ধরিয়ে দেয়।

একবার পেনসিল কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে যায়। ব্যান্ডেজ করে রেখেছেন। যেই আসে জিজ্ঞেস করে, আঙুলে কী হল?

রাজশেখর একটি বড় কাগজে দৃশ্যমান করে লিখে রাখলেন, পেনসিল কাটতে গিয়ে আঙুল সামান্য কেটেছে, চিন্তার কারণ নেই।

এসব ঘটনার কথা শুনেছিলাম, ওঁর প্রকাশক আমার গুরুজনস্থানীয় সুধীরচন্দ্র সরকার মশাইয়ের কাছে।

সৈয়দ মুজতবা আলী

সৈয়দ মুজতবা আলীর খুব ভক্ত ছিলেন। বলতেন, উনি কলম না ধরলে বাংলা সাহিত্যে এত সব আরবি-ফারসি শব্দ আসতই না। মুজতবা আলীও ওঁর লেখার বড় সমঝদার। আমাকে বলেছিলেন, ভানু, 'ঠোঁটের সিন্দুর অক্ষয় হোক' এমন একটা লাইন কেউ ভাবতে পারে?

বেঙ্গল কেমিক্যালস

মূল সংস্কৃত থেকে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ ও চলন্তিকা অভিধান প্রণয়ন নাকি সময় কাটানোর জন্য।

এই আপাতগম্ভীর মানুষটিই তাঁর এক আত্মীয়-পুত্রকে কবিতায় একটি মজাদার চিঠি দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ দেখে সেটা জোর করে প্রবাসীতে ছাপিয়ে দেন— কয়েকটি লাইন উদ্ধার করি তার থেকে—

পটলডাঙার দুধারেতে গভীর পটল বন
ডাল ধরে তার নাড়লে পড়ে পটল দু-দশ মন।
ছিঁড়তে পটল পাড়তে পটল মোটেই বারণ নেই
বারণ কেবল পটল তোলা আইন হচ্ছে এই।
অটল ঘোষের পিসির ননদ পটল তুলেছিল
ইস্কুলে তাই অটল ঘোষের নামটা কেটে দিল।

পরশুরামের গল্পের বহু উক্তি ও বাক্যাংশ প্রবাদে পরিণত হয়েছে—

১। রোগী বলছেন— ব্যারামটা কি আন্দাজ করলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার— তা জেনে তোমার কি চারটে হাত বেরোবে? যদি বলি পেটে ডিফারিন্সিয়াল ক্যালকুলাস হয়েছে, বুঝবে কিছু?

২। কবিরাজের প্রশ্ন: প্রাতঃকালে বমি হয়? হয়, টান্‌তি পারো না। হাত কনকন করে? করে, টান্‌তি পারো না।

৩। হাড্ডি পিলপিলায় গিয়া।

৪। গরুর যেমন শিং, শজারুর যেমন কাঁটা, খট্টাশের যেমন গন্ধ, তেমনি সিদ্ধপুরুষের আত্মরক্ষার উপায় গালাগালি।

৫। ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক।

৬। দার্জিলিঙে কি আছে হ্যাঁ? চললে হাঁপানি, থামলে কাঁপুনি।

হ্যান্ড কম্পোজ থেকে যখন লাইনো টাইপের প্রবর্তন হল, তখন বাংলা যুক্তাক্ষরগুলো নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। সে সমস্যা নিরসনেও প্রধান কর্তা রাজশেখর। আনন্দবাজার পত্রিকার অধিকর্তা রাজশেখরবাবুর শরণাপন্ন হলেন, রাজশেখর তাঁর কাছে হাতের লেখা ভালো এমন একটি ছেলে চাইলেন। অর্ধেন্দু দত্তকে পেলেন। পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকার শিল্পী। রাজশেখরবাবু বাংলা যুক্তাক্ষরগুলোর সরলীকরণ করে দিলেন। আজ যে নতুন পদ্ধতিতে ফোটোটাইপ অক্ষর তৈরি হয়েছে, তার বহুলাংশ রাজশেখরের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে।

রাজশেখর বসুর জীবনকাল আশি বছরের মতো। ১৮৮০ থেকে ১৯৬০। আমরা প্রায় এই জীবনকালেই রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি সাহিত্যকর্ম ছাড়াও তিনি কত কী করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে আমরা তেমনভাবে কাছে পাইনি। রাজশেখরবাবুকে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেকটা কাছে পেয়েছি। দেখেছি, একজন সার্থক মানুষ তাঁর জীবন সাহিত্যকর্ম থেকে নানাবিধ সৃষ্টিমূলক কাজে কত সার্থকভাবে কাটাতে পারেন।

বিজ্ঞানী রাজশেখর বসু প্রথম জীবনে বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ণধার। প্রায় বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম লেখক রূপে আত্মপ্রকাশ এবং প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' বেরতেই তিনি বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী আসনটি দখল করলেন। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত চমৎকৃত। রাজশেখর পরশুরাম ছদ্মনামে লিখেছিলেন। এই লেখকের প্রকৃত পরিচয় জানবার জন্য পাঠক-সাহিত্যিক মহলে তুমুল কোলাহল পড়ে যায়।

রাজশেখর উপন্যাস লেখেননি। পরশুরাম ছদ্মনামে গল্প ও স্বনামে প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর গল্প ও প্রবন্ধের ভাষা সর্বত্র বাহুল্য-বর্জিত। পড়তে পড়তে মনে হয়, একটি শব্দও বাড়তি নেই, কোনও বাক্য দুর্বল বা অসংবদ্ধ নয়। তাঁর জীবনও এইরকম, সুনিয়ন্ত্রিত ও এক আশ্চর্য শৃঙ্খলায় ছিল বাঁধা। বাহুল্যহীন উচ্ছ্বাস-বর্জিত তাঁর এই আদর্শ যদি আমরা অনুসরণ করতে পারতাম তাহলে জাতি হিসেবে আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারতাম।

পরশুরামের সাহিত্যকৃতি ও সাহিত্যকর্মের কথা বলছি। প্রবন্ধের মধ্যে কত বিষয় কত আলোচনা তার তালিকা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। প্রায় তাঁর নিজের গুণ ও ব্যক্তিগত দক্ষতার মতোই। রাসায়নিক, যন্ত্রবিজ্ঞানী, কুটিরশিল্পজ্ঞ, দক্ষ ব্যবসায় পরিচালক, ভাষাবিজ্ঞানী, বিপণনে বাংলা ক্যাপশন বিশেষজ্ঞ, শাস্ত্রবিদ, আভিধানিক ও রসস্রষ্টা।

সাহিত্য ও সমাজের অভিভাবক প্রসঙ্গে রাজশেখর এক জায়গায় বলেছেন, বিদ্যাবত্তা কাণ্ডজ্ঞান ও চারিত্রগুণ দেখে মনুষ্যসমাজ এমন একজন ব্যক্তিকে অভিভাবক পদে বরণ করে নেন। এর জন্য নির্বাচন বা ভোটের প্রয়োজন হয় না। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এইরকম অভিভাবক।

রবীন্দ্রনাথের পর রাজশেখরকে আমরা সে জায়গায় বরণ করে নিয়েছিলাম।

রাজশেখরের ছেলেবেলা

গিরীন্দ্রশেখর বসু

রাজশেখর বসুরা পাঁচভাই। চতুর্থজন গিরীন্দ্রশেখর। 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার রাজশেখর বসু সম্মাননা সংখ্যায় ভাই রাজশেখরকে কেন্দ্র করে পুরনো দিনের অনেক স্মৃতিই রোমন্থন করেছিলেন তিনি। সেই লেখাটিই উদ্ধার করে **'কালের কষ্টিপাথর'**-এ পুনর্মুদ্রিত হল।

তিনটা হাতি পিলখানায় বাঁধা খড়গপুর এসটেটে, মুঙ্গের থেকে কুড়ি মাইল। একটা হাতির পেটের নীচে খড়ের ওপর আমি বসে আছি, আমার পাশে তিলকা চাকর, তার কোলে দু'বছরের একটি ভীষণ আবদেরে খোকা কাঁদতে কাঁদতে বলচে, 'হম বাঘ দেখেগা তব দুধ খায়েগা!' আমার বয়স আট বছর। খোকাটাকে ধমক দিয়ে বল্লাম, 'তোম দুধ নেই পিয়েগা তো বাঘ নেহি আওয়েগা'। খোকা বাংলা বলতে পারে না। সেসময় যে কয়টি বাঙালি সেই এসটেটে থাকতেন, বলতেন, 'এ ছেলে কখনোই বাংলা শিখবে না! বাপ-মার সঙ্গে হিন্দি!'

পুনিয়া দাই দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে, চারটে সাঁওতাল তির-ধনুক নিয়ে। অনেক কষ্টে খোকাটি দুধ চুমুক দিতে লাগল। দুবার চুমুক দিয়েই আবার আবদার, 'হম নদী কিনারে যায়গা তব দুধ পিয়েগা'।

তিলকার কাঁধে আমি, তার কোলে খোকা। চললাম বনবাদাড় দিয়ে 'মন' নদীতে। মনে করলাম বলি যে, নদীতে যাব না, কুমীর আছে। সামলে নিলাম, তিলকা টিপে দিলে, আবদার করবে, 'হম কুমির দেখেগা।' দু'বছরের ছেলে, কথার বেশ ফ্লুয়েনসি ছিল।

দরভঙ্গা ঘুরে এসে একবার চন্দ্রশেখর (পিতা) বললেন, 'ফটিকের নাম ঠিক হয়ে গেছে। মহারাজা (লক্ষীশ্বর সিং, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার দ্বিতীয় ছেলের নামও একটা শেখর হবে না কি? কি শেখর হবে?' আমি বল্লাম, ইয়র হাইনেস যখন তাকে আশীর্বাদ করচেন, তখন আপনিই তার শিরোমাল্য— আমি আপনার সামনে তার নামকরণ করলাম— রাজশেখর। দরভঙ্গার রাজা যার শিরে আছেন।...'

রাজশেখর আরও বড় হলে কলকাতা থেকে একটা আড়াই টাকা দিয়ে এনজিন কিনে এনেচে। তাতে ইসপিরিট দিয়ে চালাবার জন্য আমাদিকে সব ডাকল। শোঁ শোঁ হিস্ হিস্ করচে স্টিম, কিন্তু এনজিন চলচে না। সায়েনটিফিক মেকানিক্যাল ব্রেন বিপদ ঘটবে বুঝে নিলে— চিৎকার করে বলল, 'দাদা পালাও! পালাও!' সকলে পালিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দড়াম করে বিকট আওয়াজে আড়াই টাকার বয়লার ফাটল। সকলেই চিন্তিত— কর্ডমেলের বয়লার ফাটে যদি?

যখন দরভঙ্গায় এলাম তার বয়স তখন সাত আন্দাজ। আমি লুকিয়ে বাবার বাক্স থেকে 'বেগ্স' সিগারেট চুরি করে খাই। রাজশেখর যখন আর একটু বড় হল, বল্লাম, 'ওরে ফটিক, একটা সিগারেট টান দিকি, এতে ভারি মজা!' রাজশেখর একটু টেনে ফেলে দিলে।

বুড়ো বয়সে যখন দিল্লিতে অপারেশন হল বেচারি যন্ত্রণায় ছটফট করচে। ডাক্তার সন্তোষকুমার সেন পেশেন্টকে অন্যমনস্ক

করবার জন্য বল্লেন, 'সিগারেট খান একটা।' পেশেন্ট বল্লে, 'খাই না।' 'কখনও খান নি?' রাজশেখর উত্তর দিল, 'আমার দাদা একবার লুকিয়ে খাইয়েছিল ছেলেবেলায়।'

আমার স্ত্রী ছোটবেলায় দরভঙ্গায় রাজশেখরের সামনে আমাকে 'ছোটলোক' বলে ভর্ৎসনা করেছিল। এলাহাবাদে গিয়ে যখন আমার স্ত্রী আমাকে চিঠি লিখল, রাজশেখরকেও লিখল। রাজশেখর উত্তর লিখে নাম সহি করল, 'ইতি শ্রী ছোটলোকের ভ্রাতা'। সরোজিনীর বান্ধবীরা তার কাছে এসে স্বামীর চিঠি দেখতে চাইত না, বলত, 'তোর দেওর কী লিখেচে দেখা।'

আমি বুড়ো বয়সের কথা লিখচি না। রাজশেখর বামুনপাড়ায় (জেলা বর্ধমান) ১৮৮০ সালে ১৬ই মার্চ জন্মেছিল। তার আঁতুড়ের নাম 'পূবদুয়ারী ঘর'। এর বারান্দায় একটা সিন্দুক ছিল, সেইটার নাম ছিল 'মিউটিনির সিন্দুক'— দানাপুরের জিনিস থাকত। এই গ্রামে অনেক বাঁদর, বনশুয়ার, সাপ ও ডাকাত ছিল। মোদো কোটাল রিটায়ার্ড ডাকাত আমাদের এই মামার বাড়িটা পাহারা দিত। বেশ লোকটি।

দরভঙ্গায় আমরা ভাই, ভগ্নী ও বাঙালি ঝি রাই, চণ্ডী, গোবিন্দ বামনিকে নিয়ে থিয়েটার করতাম। রাজশেখর রামতারণের দোকান থেকে বাংলা ছ'আনার দামের নাটক পছন্দ করে আনত ও নিজে পার্ট না নিয়ে ডিরেকশন দিত। আমি কৈকেয়ী সাজতাম, রাই দশরথ সেজে আমার মান ভাঙ্গাত। রাজশেখর ম্যাজিকও করত, ঘড়ির ক্যাটলগ পড়ত, গিলটির গয়নার কেতাবের ক্যাটলগ পড়ত। রামায়ণ মহাভারতও পড়ে ফেলেছিল।

আমার বিয়ে হবার পর রাজশেখরের আর একটি ইয়ার জুটল, একসঙ্গে আড্ডা দিতাম আমি, ভগিনীরা, রাজশেখর ও আমার পত্নী; পাশের বাড়ির ছেলেরাও যোগ দিত। সায়েন্স পাশ করবার আগেই ল্যাবরেটরি হল, দুই আলমারি অ্যাসিড, ক্লোরেট অফ পটাস, কোবাল্ট ক্লোরাইড ইত্যাদি। কবিরাজি কেতাব আমি এনে দিতাম তাই পড়ত। টেম্পল মেডিক্যাল স্কুলে শখ করে মড়াও চিরত।

তার অরিজিন্যাল কমপোজিশনে ঝোঁক হতে লাগল, কিন্তু সে কভারওয়ালা ম্যাগাজিন ভিন্ন লিখত না; যতদূর মনে পড়ে 'ইন্ডিয়ান টিট বিট' ম্যাগাজিনে কী একটা লিখেছিল ছেলেবেলায়। কী অরিজিন্যাল লিখত দেখাত না। ফেলে দিত ছিঁড়ে।

শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখি অতবড় খোট্টা শহরে বাংলাবিদ্যার চমকপ্রদ অস্তিত্ব। বালক রাজশেখরের কবিত্বের ইঙ্গিত।

হঠাৎ থিয়েটার দেখে এসে তেরো বছরের সরোজিনী আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে একটা হাত নেড়ে অ্যাকট করতে লাগল—

'বিকশিত হেরি ফুলবন— কাননেতে/ধায় সমীরণ; কোমল পল্লব/কোলে হায়, ফুল কুলবনে লুকায়/ভাবে বায়ু, 'ফুটে নাই ফুল'।/ফিরে যায় হইয়া আকুল। কুসুমেরও/স্বার্থের ভাবনা!'

বললাম, 'বাদশাহি মণ্ডির সেই গাইয়ে ছোঁড়াটা বুঝি কবিতা তৈরি করেচে?' সরোজিনী বলল, 'তার বাপের সাদ্দি এরকম কবিতা লেখে?' জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কে তবে নামটাই শুনি?' সরোজিনী, 'শুনতেই তো পাবে একদিন শত সহস্র লোকের মুখে; আমি বলে কী করব?'

কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল। এলাহাবাদের তেরো বছরের ছাতুখেকো দেশের মেয়ে বাংলা দেশের 'রাজশেখর' আবিষ্কার করেছিল ষাট বৎসর পূর্বে।

দেবর রাজশেখর ১৪, 'ভউজায়ী' সরোজিনী ১৩। রাজশেখর লেখাপড়া করে, টেবিলে বসে কাগজ মুড়ে সুড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। কাউকে শোনায়ও না কবিতাটা কেমন উতরাল। উঠে রেলের লাইনে বেড়াতে যায়।

ঘোমটা দেওয়া সরোজিনী চুপিচুপি আসে, মোড়া সোড়া কাগজগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পেট কোঁচড়ে লুকিয়ে ফেলে, আরও খোঁজে, 'খেপী খুঁজে খুঁজে দেখে পরশপাথর।' চারিদিকে চট করে দেখে নেয় শাশুড়ি, ননদ, গুরুজন বা কৌতুকপ্রিয় স্বামী দেখচে কি না— বেচারি ভয়েই অস্থির পাছে কেউ বলে, ধরে ফেলে, 'বউ পদ্য পড়ছ— ছি!' তাতে আবার দেওরের পদ্য!

নিজের ঘরে গিয়ে গভীর রাত্রে আমি ঘুমুলে সরোজিনী ল্যাম্প জ্বেলে, ডুমো ডুমো কাগজগুলো মাটিতে খুলে হাত দিয়ে ফ্ল্যাট করে ফেলত। কবিতা মুখস্থ করত, তারপর প্যাক করে তোরঙ্গে পুরত। তোরঙ্গের ওপর লেবেল আঁটা হয়েচে 'এলাহাবাদ, এল ডাবলু পি, ভায়া মোকামাঘাট'। বাপের বাড়ি গিয়ে সেগুলো কপি হবে— এমন মোটাসোটা বাঁধানো দুখানা খাতা।

কবিতা-লেখক যখন নিজেই নারাজ, তখন সরোজিনীর কথামতো তার মৃত্যুর পর মহাদেব, গানের খাতা ও দুখানা মোটা খাতা 'মেজ ঠাকুরপোর কবিতা' পটনার গঙ্গাজলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বালকের সাহিত্য ধ্বংস করায় আমার পাপ হল কি? তাতে আবার সে বালক সহোদর, ছোট বয়সে। নাকি স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করে পুণ্য হল? আমি বড় ভাই না হয়ে যদি সাহিত্য-ইতিহাসের পণ্ডিত হতেম ধমক-ধামক দ্বারা বা যাদু-বাছা বলে হয়তো 'মেজঠাকুরপোর কবিতা' ইংরেজি লেখকদের 'Early Poems', 'Fragments' ইত্যাদির মতন প্রকাশ করতাম আর তাতে বাংলা সাহিত্যের গৌরব হত।

সরোজিনী যে কর্ড মেলের run কবিতা আওড়াত তাও শুনেচি। এলাহাবাদে কর্ড মেল ঢুকচে আর রাজশেখরের দাদা ট্রেনে পত্নীর জন্য অস্থির হয়েচেন। দাদার বিরহে তার চেয়ে ছ'বছরের ছোট ভাইও ব্যথিত—

আর কত দেরি আর যে সহে না/ ধড়ে প্রাণ আর থাকিতে চাহে না/ এইবার মেল ঢোকে ইসটিশান/ ভ্যাকু-অম ব্রেকে পড়েছে কি টান?/ গুম্ গুম্ গুম্, ঝড় ঝড় ঝড়/ হড়াৎ হড়াং হড় হড় হড়/ ক্যাঁচ ক্যাঁচ কোঁ থামিল গাড়ি।

কবিতার টুকরো যা দিলাম তা সরোজিনীর মুখেই শুনেছি, মুখে আওড়ানো কবিতা তার প্রপার্টি, রাজশেখরের নয়। আমি স্ত্রীর খাতা থেকে কিছুই কখনও বের করে রাজশেখরের বারণের সীমা অতিক্রম করিনি। স্ত্রীর মুখে শুনেই আওড়াতে শিখলাম।

সরোজিনী কেন বলেছিল, 'সব খাতা গঙ্গায় দিও?' তার কি 'মেজঠাকুরপোর কবিতার' প্রতি রাজশেখরের মতনই অবজ্ঞা জন্মেছিল? তা নয়, সে লুকিয়ে টুকে নিয়েছিল বলে চিরকাল খাতা দুটো লজ্জায় লুকিয়ে রাখত। মনে করলে গোপন করা জিনিস জলের মধ্যেই গোপনে থাক। তাকে তো কেউ ডিসকভারির জন্য বাহাদুরি দেবে না।

বা হয়তো মনে করত, মেজঠাকুরপো যখন কবিতা লেখা ছেড়েই দিয়েছে, তখন ও খাতা দুটো দেখলে হয়তো রাগ করবে, কাজ কী বিপদে?

সরোজিনীর স্কুলের বান্ধবীরা দলে দলে এসে 'মেজ ঠাকুরপোর কবিতা' নিজেদের খাতায় কপি করে নিয়ে যেত। বাপ-মা-দিকে শোনাত। 'মেজঠাকুরপো' নাম এলাহাবাদে বাঙালির বাড়ি বাড়ি চালু হয়ে গেল। কলকাতা নয়, খোট্টা দেশে বাঙালি মেয়ে-মহল উদ্ভাসিত করে প্রথমে এই বালকের নাম বিকশিত হল।

ছেলেবেলা বা বুড়ো বয়সে লেখা ছাপা না হলে কি সেটা সাহিত্য হয় না। 'পুরাণ', 'রামায়ণ' ইত্যাদি পাততাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছিল। ডঃ সুনীতি চাটুজ্জে মহাশয় বোধহয় তাঁর অপিনিয়ন এবার বদলাতে পারেন 'রাজশেখর পরিণত বয়সেই সাহিত্যরঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন' (কথাসাহিত্য, রাজশেখর সংখ্যা)। সাহিত্যরঙ্গ ১৮৯৩ সালেই শুরু হয়েছিল, সুনীতিবাবুকে জানাই।

বাংলা গল্প লেখার আগে রাজশেখর অন্যান্য ইংরেজি ম্যাগাজিনে লিখত। একটা মনে পড়ে 'দ্য টিউবওয়েল'। কলম একেবারে ঘুমিয়ে ছিল না।

রাজশেখর সাহিত্যসম্রাট হয়েই জন্মেছিল। তা বন্ধ হবার জো নাই। ডঃ চ্যাটার্জি লিখেছেন, 'এতদিন ধরে কোথায় চাপা ছিলেন?' তার উত্তর কে দেবে?

** সংক্ষেপিত। বানান অপরিবর্তিত।*

বিষাদগাথা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

১৩

(পরিচ্ছেদ: ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২)

৩৭

একটা কংকালের মুখ মানুষের চামড়া দিয়ে টান টান করে ঢেকে দিলে যেমন দেখায় রুদ্র ঝম্পটির মুখের চেহারা তেমনই হয়েছে। দিনে রাতে দু-পাঁচ মিনিটের জন্যও সে শুতে পারে না, সব সময় বসে থেকে মুখ হা করে শুধু হাঁপায়। চোখ দুটো তখন ঠেলে বেরিয়ে আসে, বাড়ির লোক সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ভয়ে দমবন্ধ করে ভাবে, এই বুঝি চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসবে।

বালিসোনার আদিবাসী বৃদ্ধরা যে যার ভিটেয় বসে বলাবলি করতে লাগল, নদী আকাশ চায়, বাতাস চায়, দুই তীরে তার বৃক্ষশিকড়বন্ধন চাই, বুকের ওপর ঘরবাড়ির এত জঞ্জালভার সে সইবে কেন!

হাঁপানির টান কমলে পিঠের কাছে উঁচু বালিশের স্তূপে হেলান দিয়ে বসে বসেই যতটা পারে জিরিয়ে নেয়।

বড় বড় ডাক্তারবাবুরাও তাকে কোনও আরাম দিতে পারেনি। তার শ্বাসনালীর ভেতরে আটকে থাকা খাসির নলীর হাড়ের টুকরো শুধু ওষুধ দিয়ে বের করা অসম্ভব বলে সবাই রায় দিয়েছে। একমাত্র উপায় জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন। আগে একবার তার গলায় অপারেশন হয়ে গেছে, তারপর নতুন করে আবার অপারেশন করাতে সে নিজে ও তার বাড়ির লোক রাজি নয়। সতেরো বছর ধরে বুক ভরে একটু বাতাস নেবার যন্ত্রণাদায়ক চেষ্টা নিয়ে সে এখনও বেঁচে আছে। তার দলের ছেলেরা, প্রবীণ রাজনৈতিক সহকর্মীরা, প্রতিবেশীরা যে যখনই তাকে দেখতে আসে সে শুধু তার দুর্বল কাঁপা কাঁপা হাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। শুধু তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। গলার ক্যান্সার অপারেশনের পর থেকে সে আর কথা বলতে পারে না।

সকলের কাছে তার নির্বাক ক্ষমা প্রার্থনার কথা এতদিনে বালিসোনার অনেকেই শুনেছে। তাদের মধ্যেও কেউ কেউ তাকে দেখতে আসে। তাদের কাছেও ঝম্পটি জোড় হাতে ক্ষমা চায়।

চৌধুরীবাড়ির সেজোছেলে বৃদ্ধ বয়েসেও একদিন রাত করে ঝম্পটির কাছে এসে ব্যক্তিগত একটা কাজে তার সাহায্য চাইল। তার অনেকদিনের ইচ্ছে, সামান্য কয়েকটা পারিবারিক কবরস্থান ছেড়ে রাসমাঠ তার বন্ধু-প্রমোটার হরেন ভদ্রের হাতে তুলে দেয়। তার

বর্ষার জল পেয়ে আগাছার মতো, লোভের জল পেয়ে দুর্নীতি, দুঃশাসন, স্বার্থসর্বস্বতা সমাজের সব স্তরে হু হু করে বেড়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ না, বিকল্প মূল্যবোধও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সে জন্য শুধু মঙ্গলমঞ্চ নয়, সংগীত-মিছিল থেকেও আমাদের কর্মীদল গড়তে হবে।

সঙ্গে পার্টনারশিপে ওখানে জেলার সবচেয়ে বড় পাঁচতলা শপিং মল হবে। দীঘির পাড় ধরে অনাবাসী ভারতীয়দের জন্য বিলাসবহুল বাংলো হবে। বালিসোনার একটা বড় সম্পদ দূর সাগরের দখনো-হাওয়ার কথা এখন মার্কিন প্রবাসী বাঙালিরাও জানে।

মেজদা বা লক্ষ্মী-সরস্বতী খুব একটা বাধা হবে বলে মনে হয় না, তারা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবে। আধপাগলা প্রদীপকেও সে সামলে নেবে। সমস্যা পরীক্ষিৎকে নিয়ে। তাকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না। 'তোমার ছেলেদের তুমি যদি একটু বলে দাও— বাদায় টাউনশিপের ব্যাপারে যেমন বলে দিয়েছিলে আর কী—'

কথা শেষ হবার আগেই ঝম্পটি সারা মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে জোড় হাতে তার অক্ষমতা জানাল।

এক বুধবার বিকেলের দিকে চিরন্তনী এল। রুদ্র ঝম্পটির কথা সে অনেক শুনেছে, কখনও চোখে দেখেনি। এত বেশি অসুস্থ দেখে ধীর স্বরে বলল, 'নমস্কার। আমি অবনীমোহন চৌধুরীর বড় মেয়ে লক্ষ্মীপ্রতিমার মেয়ে চিরন্তনী। এই শনিবার আমাদের মঙ্গলমঞ্চের সভা হবে। সেখানে আপনি কি আপনার অনুতাপ নিয়ে কোনও বিবৃতি দিতে চান? আপনি লিখে দিলে আমরা সেটা মঞ্চ থেকে পড়ে শোনাতে পারি।'

চৌধুরীবাড়ির কেউ তাকে দেখতে আসবে চোখে দেখেও তার বিশ্বাস হয় না। চিরন্তনী ঘরে ঢোকার মুহূর্ত থেকে ঝম্পটি সেই যে হাত জোড় করেছে, তারপর একবারও আর নামায়নি। তার চোখ দিয়ে এত জল ঝরছে যে এই প্রস্তাবে তার হ্যাঁ-না কিছুই বোঝা গেল না।

শনিবার অনুষ্ঠান শুরুর আগে পর্যন্ত মঞ্চ-সজ্জার কাজ চলল। সাদা কাপড়ের গায়ে বড় বড় করে লেখা— জগৎ সুন্দর হয় মানুষের গুণে, সমাজ সুখের হয় মানুষের দানে।

চিরন্তনী সকলকে নমস্কার জানিয়ে শুরু করল— মঙ্গলমঞ্চ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা আপনারা জানেন। সেই প্রয়োজন আজ আরও বড় হয়ে উঠেছে। বর্ষার জল পেয়ে আগাছার মতো, লোভের জল পেয়ে দুর্নীতি, দুঃশাসন, স্বার্থসর্বস্বতা সমাজের সব স্তরে হু হু করে বেড়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ না, বিকল্প মূল্যবোধও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সে জন্য শুধু মঙ্গলমঞ্চ নয়, সংগীত-মিছিল থেকেও আমাদের কর্মীদল গড়তে হবে। তারা প্রত্যেকে বালিসোনার ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের সুখ-দুঃখ শুনে দেখে বিচার করে তাদের মূল সমস্যার শ্রেণী বিন্যাস করবে।

যারা গান শোনার আশায় সভায় এসেছিল, তারা চিরন্তনীর বক্তৃতা শেষ হতেই উঠে পড়তে লাগল। তখনই সে পরীক্ষিৎকে হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, 'তুমি বলো মামা, সবাই তোমার কথা শুনতে চায়।'

পরীক্ষিৎ নিস্পৃহভাবে বলে, 'আমি কী বলব? এবার নতুনরা কথা বলবে। চিরন্তনী কথা বলবে। মাটি ও আকাশ যথাসাধ্য মুক্ত রাখা কীভাবে সম্ভব আমি ভেবে পাই না। মানুষের দুঃখ কষ্ট কমাতে না পারলে সে সবই বৃথা।' এ-ব্যাপারে প্রত্যেকের ভূমিকা সম্পর্কে পরীক্ষিতের বিশদ আলোচনার মাঝখানে 'বল হরি, হরি বোল' শুনে কেউ কেউ কৌতূহলে এগিয়ে গিয়ে দেখে একজন অস্থিচর্মসার বৃদ্ধের শবদেহ-কাঁধে জনা কুড়ি-পঁচিশ ছেলে শ্মশানে চলেছে। বল হরি হরি বোলের পাশাপাশি 'কমরেড রুদ্র ঝম্পটি অমর রহে' শ্লোগানও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

মঞ্চের শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'অ্যাদ্দিন পুলিশের খাতায় ফেরার ছিল, এবার জীবনের খাতায় ফেরার হয়ে গেল।'

শবযাত্রীদের কোলাহলে পরীক্ষিৎ কথা থামিয়ে দিয়েছিল, বহু কষ্টে 'আপনি বলুন, আপনি বলুন' শুনে সে দ্বিধা নিয়েই আবার তার বক্তৃতা শুরু করল। চোখে কালো চশমা থাকায় সে শ্রোতাদের মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।

'আমার ঠাকুর্দা বৃথাই চেয়েছিলেন বালিসোনার মানুষ তাঁর সমাধি মাড়িয়ে আমাদের রাসমাঠে আসবে। আমার বাবা বৃথাই চেয়েছিলেন লুপ্ত নদী খুঁড়ে বালি থেকে সোনা বের করে বালিসোনাকে দেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ গ্রাম করে তুলবেন। আমার রাঙাজেঠিমা গান দিয়ে, মান দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে মানুষকে একত্র করার লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছেন। আমার রাঙাজেঠু অবনীমোহন মানুষের আরোগ্যের জন্য তপস্যা করে গেছেন। আসল কথা, মানুষকে সারাজীবন লড়াই করে যেতে হবে তার চারপাশের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে। প্রত্যেকের জীবনে জয়ী হবার ওই একটাই পথ। কে কোন পথে এগোবেন সেটা তাঁকেই বুঝতে হবে। জানি না, হয়তো মানুষের পায়ে পায়ে তৈরি হওয়া পথই আসল পথ। হয়তো এই পথেই এখন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। মানুষের ওপর সবরকম অন্যায় অবিচার বঞ্চনা লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে মানুষের মনেই ধিক্কার জাগাতে হবে। অন্যায়কারীকে দেখে আকাশ-বাতাসও যেন ছি ছি করে ওঠে।'

সুষমা বিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাসের একদল ছাত্রী স্কুল ফেরত বাসস্টপে দাঁড়িয়ে বাসের অপেক্ষা করতে করতে শবযাত্রীদের 'বল হরি হরি বোল' শুনে যে যার কপালে হাত ঠেকাল, কেউ কেউ মুখ ফিরিয়ে রাখল, দুজন একেবারে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

শ্মশানযাত্রীরা হরিধ্বনি দিতে দিতেই দেখল, উল্টো দিক থেকে একটা ভ্যানরিকশায় হাতে হাতকড়া দিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে নিদ্দাকে নিয়ে দুজন বন্দুকধারী পুলিশ আসছে। ভ্যানের মাঝখানে চটে মোড়া একটা মৃতদেহ বা ওইরকম কিছু। 'ও বাবা, তোরে কোথায় নিয়ে চলল রে, ও বাবা, আমায় কার হাতে দিয়ে গেলি রে!' বলতে বলতে মাঝবয়েসী একটা মেয়েছেলেকেও আলুথালু বেশে ভ্যানের পিছন পিছন দৌড়োতে দেখা গেল।

ভোররাতে সাতশিমুলতলার জঙ্গলে পুলিশ চটের লম্বাটে বস্তা খুলে দেখেছে ভেতরে একটা আস্ত নরকংকাল, মৃতদেহ সাজিয়ে পাচারের চেষ্টা করছিল। সঙ্গে আরও দুজন লোক ছিল, তারা কঙ্কাল কেনা-বেচার দালাল। তারা নিদ্দার চোখ এড়িয়ে দুজন পুলিশের হাতে টাকা গুঁজে দিতে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নিদ্দার কাজ খুন করা দেহের গতিবিধি আন্দাজ করা, বালিসোনায় খুন-খারাপির কমতি নেই, খুন করে গোপনে কে কোথায় দেহ পুঁতে দেয় তার খোঁজ পাওয়াটাই আসল। তারপর সুযোগ মতো কবর খুঁড়ে কংকাল বের করে দালালদের হাতে তুলে দেওয়া। দালালারা আগাম বার্তা পেয়ে কংকাল বের করবার জায়গায় চলে আসে।

কংকাল খোঁড়ায় নিন্দার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা, সাদা চুল-দাড়ি নিয়ে টান-টান শরীর কোমর থেকে ঝুঁকিয়ে সে এখনও একইরকম নৈপুণ্যের সঙ্গে মাটি থেকে কংকাল বের করে আনতে পারে। সারা জীবন অনেকরকম ব্যবসাই সে করেছে, কোনওটার আয়েই তার হা-মুখ সংসার টানতে না পেরে বুড়োবয়সে কংকাল খোঁড়ার ব্যবসা ধরেছে। তার বউয়ের দুচোখে পুরু ছানি, মাথাটা সবসময় কেষ্টনগরের পুতুলের মতো এপাশ-ওপাশ দোলে। এদিকে তিন ছেলের দুজন পোলিওয় পঙ্গু, একটা নিষ্কর্মা, পাঁচ মেয়েকে কে যে কখন কোত্থেকে এসে কালীঘাটে বিয়ে করবে বা দিল্লিতে চাকরি দেবে বলে নিয়ে চলে গেছে নিন্দা জানে না। শুধু তার বড় মেয়ে গত পৌষসংক্রান্তির দিনে তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের কাছে ফিরে এসেছে। মেয়েটা বরাবরই বোকা, 'পোষ সংকান্তি' না কাটিয়ে কেউ কি তার ঠাঁই ছেড়ে বেরয়? মেয়েটাকে কাঁদতে কাঁদতে দূর থেকে ছুটে আসতে দেখে নিন্দা হাতকড়া পড়া দুহাত তুলে চোখের জল মোছে।

ঝম্পটিবাবুর শবযাত্রীরা তাকে দেখতে দেখতে চলে গেল, কেউ একবারও থামল না।

কনস্টেবল দুজন ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কী একটা পরামর্শ করে ভ্যান থামাল, নিন্দাকে বলল, 'তোর মেয়েটা তোর পিছু ছাড়বে না, ছুটতে ছুটতেই বেদমে মরে যাবে। ওকে তুলে নে।'

ভ্যানে উঠে বিলাপের চেয়ে তার কান্নাই বেড়ে গেল।

নিন্দা ধমক দিয়ে বলল, 'এবার ক্ষান্তি দে যামিনী!'

কান্নার মধ্যেই একবার এ-সেপাইয়ের, একবার ও-সেপাইয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে গলা চিরে যামিনী কাঁকুতি-মিনতি করে, 'আমার বাবারে ছেড়ে দেন গো ছায়েব। বাবারে আমার ছেড়ে দেন।'

'থানায় চ, দেখি কী করা যায়।' বলে এক সেপাই আরেক সেপাইয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকায়।

থানায় ঢুকে 'জেবনের পিদিম ঝ্যানো নিবু-নিবু করছে, মা রে।' বলতে বলতে নিন্দা মেঝেতে বসে পড়ল।

দুজন কনস্টেবলের একজন যামিনীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'বড়বাবু এলে তার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে দেখি তোর বাবাকে তোর সঙ্গেই ফেরত পাঠানো যায় কিনা। ততক্ষণ তুই গাছের ছায়ায় গিয়ে বোস।'

দ্বিতীয় কনস্টেবলকে কিছু বলতে হল না, সে যামিনীকে নিয়ে পুলিশ-ব্যারাকের ছাদে যেখানে কদমগাছের ঘন ডালপালা ঝুঁকে আছে, সেখানটায় গিয়ে বলল, 'বড়বাবু না আসা অব্দি এখানে বসে থাক। এলে তোকে খবর পাঠাব, তখন বাবাকে নিয়ে ঘরে ফিরবি।'

ভোরবেলা চোখে রোদ লেগে ঘুম ভেঙে গিয়ে সে দেখল গায়ে তার শাড়ি নেই, বেলাউজ পাশে পড়ে আছে, বুক ক্ষতবিক্ষত। উঠে বসতে গিয়ে তার সারা শরীর ব্যথায় টাঁটিয়ে উঠল, শরীরের তলায় চাপ চাপ রক্ত। এতক্ষণে যামিনী শরীরের যন্ত্রণা ভুলে চিলচিৎকারে কেঁদে উঠল।

চারজন সেপাই ছাদে উঠে এল। তাদের একজন হুংকার দিয়ে বলল, 'চোপ! একদম চেঁচাবি না!'

একটু পরে মাটির ভাঁড়ে চা আর একটা আস্ত পাউরুটি দিয়ে গেল একজন। যামিনী অনেকটা ভরসা পেয়ে চা-রুটি খেয়ে কমদগাছের ছায়ায় হঠাৎই ঢুলে পড়ে গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল।

ভোরবেলা চোখে রোদ লেগে ঘুম ভেঙে গিয়ে সে দেখল গায়ে তার শাড়ি নেই, বেলাউজ পাশে পড়ে আছে, বুক ক্ষতবিক্ষত। উঠে বসতে গিয়ে তার সারা শরীর ব্যথায় টাঁটিয়ে উঠল, শরীরের তলায় চাপ চাপ রক্ত। এতক্ষণে যামিনী শরীরের যন্ত্রণা ভুলে চিলচিৎকারে কেঁদে উঠল।

চারজন সেপাই ছাদে উঠে এল। তাদের একজন হুংকার দিয়ে বলল, 'চোপ! একদম চেঁচাবি না!' আরেকজন হাঁটু গেড়ে বসে বলল, 'খবরদার, কাউকে কিছু বলবি না। বললে খুন করে ফেলব। যাকে বলবি তার মাথাও গুঁড়িয়ে দেব!'

যামিনী তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করতে চাইল, ঠোঁট নড়লেও মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরল না।

একজন নরম মনের সেপাই তার ভয়ার্ত চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'তোর বাপ আদালতে চালান গেছে, সেখানকার কাজ মিটিয়ে আজ নিশ্চয়ই ঘরে ফিরবে। তুইও ঘরে যা। রিকশা ভাড়াটা রাখ।' বলে দুটাকার একটা নোট তার গায়ে ফেলে দিল।

দুপুরে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিন্দা মাথা ঘুরে পড়ে গেল। সন্ন্যাস রোগে তার মৃত্যুর খবর বাইরে চাউর হওয়ার পর, স্বভাবকবির দেশ বালিসোনার কেউ একজন ছড়া বানাল—'মুখোমুখি যদি হয় দুই শবদেহ/দুইয়ে মিলে সাথী চায় আরও এক দেহ।' তা থেকেই পরে বালিসোনাবাসীদের মুখে মুখে নতুন প্রবাদের জন্ম হবে: মুখোমুখি শবদেহ, সাথী হবে আর কেহ।

৩৮

বাজ পড়বার আগে ছটন্ত বিদ্যুৎসর্পের মতো অধিকাংশ ফ্ল্যাটের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে দেখে সাউথ উইন্ডের বাসিন্দারা বিরক্ত। ওপরের তলাগুলিতে বেশি ফাটল। ঝড়-বৃষ্টিতে তো কথাই নেই, শুকনো দিনেও যখন ঝম ঝম শব্দে রেলগাড়ি যায় তখন বিল্ডিংয়ের বড় বড় ফাটল কাঁপে। বালিসোনায় ডেভেলপার্স সংস্থার স্থানীয় অফিসে অভিযোগ জানালে প্রতিবারই এক মহিলা তাদের লিখিত অভিযোগ পেনাঙের হেড অফিসে ফ্যাক্স করে দেয়। কোনও উত্তর আসে না, কেউ দেখতেও আসে না, ফাটল ময়ালের হায়ের মতো দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

দেওয়ালির রাতে আকাশ জ্বালিয়ে বাজি পুড়িয়ে, বাতাস কাঁপিয়ে পটকা ফাটিয়ে, তৃপ্তিসহকারে পান-ভোজন শেষ করে অনেক রাতে সবাই ঘুমে অচেতন, সেই ফাঁকে ওপরের দুটি তলা তিপান্নটি ঝুলবারান্দা সমেত হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল।

পরদিন ভোর থেকে সারা দিন ধরে নিহত ও আহতদের উদ্ধারকাজ চালিয়েও হতাহতের সঠিক সংখ্যা বোঝা গেল না। সারি-সারি শবদেহ ঘিরে ভিড়, ভিড়ের কাছেই দ্রুত নতুন সারি সাজানো হচ্ছে। পুলিশবাহিনী দিশেহারা। অ্যাম্বুলেন্সে গাদাগাদি করে হাসপাতালে পাঠানো মারাত্মক জখম নারী পুরুষ শিশুর সংখ্যা লিখতে ব্যস্ত পুলিশ জানাল, রাজধানী শহর থেকে বড় উদ্ধারকারী দল আসছে। তারা এসে ভগ্নস্তূপের নীচে সন্ধান না করা পর্যন্ত পুলিশ ভীত সন্ত্রস্ত ক্রুদ্ধ আবাসিকদের ধৈর্য

ধরতে অনুরোধ করল।

বালিসোনার আদিবাসী বৃদ্ধরা যে যার ভিটেয় বসে বলাবলি করতে লাগল, নদী আকাশ চায়, বাতাস চায়, দুই তীরে তার বৃক্ষশিকড়বন্ধন চাই, বুকের ওপর ঘরবাড়ির এত জঞ্জালভার সে সইবে কেন!

ভোরবেলা পরীক্ষিতের ঘুম ভাঙিয়ে নীলাঞ্জনা উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গো, আমাদের লালকমল-নীলকমল ফিরে আসেনি তো?'

প্রশ্নটা বুঝতে পরীক্ষিতের সময় লাগল। ঘুম ভাঙা চোখে কিছুক্ষণ নীলাঞ্জনার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'ফিরেছে? কই, জানি না তো! আমি তো ওদের ফেরার আশা নিয়েই বেঁচে আছি। হঠাৎ তোমার একথা মনে হল কেন?'

'কাল রাতে সাউথ উইন্ড ভেঙে পড়েছে, বহু লোক মারা গেছে। এর পিছনে লাল-নীলের হাত নেই তো?'

পরীক্ষিৎ ভাবে, মাটি আর আকাশ ঢাকা পড়লে বাবার কষ্ট হয়। নদীটা খুঁড়ে বের করে বাঁচাতে চেয়েছিল, পারেনি। সেই নদীর বুকের ওপর আস্ত একটা বিদেশি শহর বসিয়ে দেওয়া বাবা সহ্য করবে কী করে! নীলাঞ্জনা ভীত মুখে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে পরীক্ষিৎ তার প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'লালু-নীলুর এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সাউথ উইন্ড ধ্বংসে বাবার হাত আছে মনে হয়। বাবার দীর্ঘশ্বাসে ঝড়ও উঠতে পারে।'

'কী! কী বলছ তুমি? তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

'আমার বাবা তার স্বপ্নের জন্য অনন্তকাল যুদ্ধ চালাতে পারে।'

'তুমিও কি মিতামায়ের মতো হয়ে যাচ্ছ? বাবা আজ কত বছর নেই, তুমি ভুলে গেছ?'

'বাবার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। মাঝে মাঝে কথাও হয়।'

'পরীক্ষিৎ, তুমি প্রকৃতিস্থ হও। তোমাকেও কি শেষে সারা দিন শুধু তিকানের কীর্তন শোনাতে হবে?'

'তিকানকে কি তুমি কিছু বলেছিলে?'

'আমাকে এত ছোট ভাবলে? আমিই চলে যাবার কথা ভেবেছিলাম।'

পরীক্ষিৎ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার শুয়ে পড়ল।

'এখন উঠবে না? লাল-নীলের খবর নিয়ে দেখলে হত না!' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলল, 'সন্তানভাগ্য সকলের ভালো হয় না, জানো?'

দু-ভাই নিরুদ্দেশ, অরণ্য কতদিন বাড়ি থেকে দূরে, 'শুশ্রূষা'য় তার নেশা ছাড়ানোর চিকিৎসা চলছে। অরণ্যর কথা ভেবে নীলাঞ্জনা এবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সন্তানভাগ্যের কথাটা আরও একবার বলল।

পরীক্ষিৎ রাতের বেশিটাই সরোজিনীর লাইব্রেরিতে বসে লেখে। দোতলায় প্রদীপের ঘরেও সারা রাত আলো জ্বলে। সে মাঝে মাঝে পরীক্ষিতের কাছে অদ্ভুত অদ্ভুত বই চাইতে আসে। না পেলে বিরক্ত হয়। তার সমস্যার কথাও পরীক্ষিৎকে বলে। বালিসোনার ইতিহাস লিখতে লিখতে কখন সে রাজধানীর ইতিহাস লেখায় ঢুকে যায়, কখন আবার তার জীবনকাহিনীতে মন্থরোর মা এসে পড়ে, সেই জট সে আর ছাড়াতে পারে না। সে বিড় বিড় করে বলতে থাকে, 'বিশ্বজুড়ে সবুজ ধ্বংসে মানুষের প্রাণবায়ুর উৎস শুকিয়ে যাচ্ছে, কত কীটপতঙ্গ পশুপাখি শেষ হয়ে যাচ্ছে, ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। জেগে গিয়ে লিখতে লিখতে আবার দুঃস্বপ্নে ডুবে যাই। মাইনাস গাছপালা প্লাস দুঃস্বপ্ন— ইকোয়াল টু দ্রুতবর্ধমান দুঃস্বপ্ন।'

একদিন হঠাৎ পরীক্ষিতের কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'আনন্দমোহন তোকে আর আমাকে খুন করতে পারে। রাসমাঠে ও একটা বিরাট শপিংমল বানাতে চায়। সঙ্গে নব্য ধনীদের জন্য বড় বড় বাংলো। আমি বলেছি আমি বেঁচে থাকতে একাজ করতে দেব না। তাই আমাকে খুনের ফন্দি আঁটছে। তোকেও ও খুন করবে। খুব সাবধানে থাকিস, বাবা। ওকে ছুরি-হাতে দেখলেও ভয় পাসনি, ভয় পেলে শরীরের এনার্জি চলে যায়। কথা বন্ধ হয়ে যায়।'

একদিন ঘোর বর্ষারাতে সে পরীক্ষিৎকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। বিরাট ঘরটার অর্ধেক জুড়ে বুনো গাছের জঙ্গল, যেখানে যা পায়, শেকড়-সুদ্ধ তুলে এনে টবে পোঁতে। বড় বড় জানলার চওড়া পটিতে তিল, তুলসি, নয়নতারার ঝাড়। ছোট মাপের রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়াও বাইরের দিকে মাথা হেলিয়ে রেখেছে। পশ্চিমের জানলায় লজ্জাবতী লতার সারি পাতা বুজিয়ে ঘুমিয়ে আছে। পরীক্ষিৎকে ঝোপঝাড় বাঁচিয়ে ঘরের অন্য প্রান্তে নিয়ে গিয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে প্রদীপ বিছানার দিকে ইঙ্গিত করল। পাটভাঙা সাদা চাদরে লাল, কালো, হলদে, খয়েরি, সবুজ, বেগুনি রঙের বড় বড় ছোপ। একেকটা ছোপের নীচে একেকটা শব্দ লেখা। কোনওটার নীচে লেখা হিংসা, কোনওটার নীচে প্রতিহিংসা, কোথাও ক্ষুধা, কোথাও প্রেম, কোথাও দাবদাহ, কোথাও দখিনাবাতাস, কোথাও জ্ঞানতৃষ্ণা, কোথাও জ্ঞানদাহ, কোথাও উচ্চাশা, কোথাও ফ্যাশন। এইরকম আরও অনেক শব্দ রঙিন বিছানা জুড়ে লিখে রেখেছে।

'নিউ জেনারেশনের মনের মানচিত্র তৈরি করছি আমি। তাদের মানসিকতার লসাণ্ড গসাণ্ড বের করা দরকার।' কথাটা বলে তার মানচিত্রের ওপরেই সে শুয়ে পড়ে তখনই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ফোঁপাতে লাগল।

পরীক্ষিৎ নিজের ঘরে যাবার পথে দেখল অত রাতেও ভণ্ডুলের সঙ্গে চারজন যুবক বাড়ির ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। দুজন মহিলাও আছেন, একজনকে অনেকেই আজকাল নামে চেনে। পরীক্ষিৎও খবরের কাগজে প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষে তাঁর অনেকগুলো প্রবন্ধ পড়েছে।

ছেলেরা পরিচিত কয়েকজন কবি লেখক শিল্পীর স্বাক্ষর করা একটা ছাপানো কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষিৎকে বলল, 'আপনি তো স্যার ক্ষমতাসীন দলের অনেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লিখেছেন, এবার শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আপনার সমর্থন চাইতে এসেছি আমরা। কাগজটায় শুধু আপনার একটা সই দিলেই হবে।'

দেশবাসীর উদ্দেশে ছাপানো আবেদন পড়ে পরীক্ষিৎ বলল, 'দুর্জন দুরাচারী ক্ষমতাসীন যে-কোনও দলের বিরুদ্ধে আমাকে পাবে। কারও পক্ষে আমাকে পাওয়া যাবে না। পক্ষসমর্থনের যুগ এটা নয়।'

প্রবন্ধলেখক তরুণী এগিয়ে এসে বলল, 'সত্যকে সমর্থনের যুগ নয় বললেন, তবে কি এটা মিথ্যাচার সমর্থনের যুগ? আপনার স্বাধীন মতটা শুনতে পেলে ভালো হয়।'

'সত্যকে সমর্থন করা না-করার কথা কি বলেছি? কথাটা ছিল পক্ষসমর্থন নিয়ে।'

'বেশ। স্যার আপনার মতে যুগটা তাহলে নিরপেক্ষতার?'

একটি ছেলের এই প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষিৎ নিস্পৃহ স্বরে বলল, দেশকে যারা ভালোবাসে, তাদের এখন যুগশুদ্ধির কথা ভাবতে হবে।'

পরদিন বিকেলে পরীক্ষিতের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বেখেয়ালে মন্থরোর মায়ের কবরের কাছে পৌঁছে প্রদীপ দাঁড়িয়ে পড়ল। সেও মন্থরোর মাকে মাটি দিয়েছিল, অথচ কবরটাই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ পরীক্ষিতের দিকে চেয়ে বলল, 'মন্থরোর মা'র মুখের সঙ্গে আমার মুখের কোনও মিল দেখতে পাও তুমি?' পরীক্ষিৎকে 'তুই' বলে, মনে পড়ল না।

'আমি তো মন্থরোর মাকে দেখিনি।'

'আমার চিবুক কি মন্থরোর চিবুকের মতো মনে হয় তোমার?'

'মন্থরোর কথা আমি শুধু শুনেছি, দেখিনি কখনও।'

দুটো ঋতু কেটে যাবার পর থেকেই পরীক্ষিতের কাঁধ না ধরে প্রদীপ হাঁটতে পারে না। পরীক্ষিৎ তাকে ধরে ধরে বালিসোনার অবশিষ্ট গাছপালা ঝোপঝাড়ের কাছে নিয়ে যায়।

পরের বছর প্রদীপ বালিসোনায় বৃক্ষসুমারি শুরু করল। আগামী কয়েক বছরে কোথায় কত গাছ না লাগালেই নয়, তার একটা ধারণা পাবার জন্য বৃক্ষসুমারি করা দরকার। পরীক্ষিৎকেও একাজে নিয়মিত সাহায্য করতে

হয়। পরীক্ষিতের নিজেরও আগ্রহ কম নয়। আবার কিছু গাছ লাগাবার একটা সম্ভাবনা তাকে আকর্ষণ করে।

সাউথ উইন্ডের আকাশচুম্বী আবাসনকে পুরসভার পক্ষ থেকে ভেঙে ফেলার নোটিস দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় অফিসের মহিলা সে নোটিস পেনাঙে হেড অফিসে ফ্যাক্স করে দিল। আদালতের নোটিসও ফ্যাক্স মারফৎ পেনাঙে পাঠানো হল।

পুরসভার শাসানির চেয়েও বেশি প্রাণের ভয়ে আবাসিকরা প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করেও ফ্ল্যাট খালি করতে লাগল। এইসময় থেকে বালিসোনায় বাড়ি ভাড়া নেওয়ার ব্যাপক প্রবণতা দেখা গেল। সুযোগ বুঝে বেশিরভাগ বাড়িওলা চড়া ভাড়া হেঁকে বসল।

সংস্থার দুজন ডিরেক্টর হেড অফিস থেকে বিমানে উড়ে এসে বাড়ি ভাঙতে রাজি না হলেও আদালতে হাজিরা দিয়ে অ্যাডভোকেটের মাধ্যমে জানাল, তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। নকশায়, নির্মাণে, মালমশলায় কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। বাড়ি ভেঙে পড়ার একমাত্র কারণ অধিকাংশ ফ্ল্যাট ওনার্স মেঝের সেরামিক টাইলস তুলে ফেলে পুরো ফ্ল্যাটেই মার্বেল বসিয়েছে। অত বেশি বাড়তি লোড নিতে না পারায় বিল্ডিং কোলাপ্স করে। নিহত বা আহতদের জন্য কোনওরকম ক্ষতিপূরণ দিতেও তাই তারা বাধ্য নয়।

অভিযুক্তদের আইনজীবী ও সরকার পক্ষের আইনজীবীদের সওয়াল-জবাব শুনে বিচারক বিদেশি দুজন ডিরেক্টরকে ষোল দিনের জেল হেপাজতের আদেশ দিলেন।

আদালতের বাইরে বিক্ষুব্ধ জনতার নিশ্ছিদ্র ভিড় কেটে আসামীদের পুলিশের গাড়িতে তুলতে ঘর্মাক্ত পুলিশবাহিনীর একজনের কোমরের বেল্ট ছিঁড়ে গেল। টুপি হারা দুজনের কাদামাখা পদপিষ্ট টুপি দিনের শেষে কুড়িয়ে পেয়ে আদালত চত্বরেই এক পাগল গায়ক থানায় জমা দিয়েই পালিয়েছে।

তেইশ বছর ধরে মামলা চলার পর আদালতের রায়ে পেনাঙের ডিরেক্টররা প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস হয়ে গেল। বিচারক স্থানীয় কন্ট্রাকটরদের ছ'মাসের জেল ও সাতান্তর হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছ'মাস কারাবাসের আদেশ দিলেন। উচ্চ আদালতেও এই রায় বহাল রইল। পুরসভার আলাদা একটা মামলায় বিদেশি সংস্থাকে বিপজ্জনক বিল্ডিং ভেঙে ফেলবার খরচ হিসেবে পুরসভাকে আট লক্ষ টাকা দেবার আদেশ দেওয়া হল।

৩৯

রবিবারের গানের মিছিলে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় ক্রমেই বেড়ে চলল। কিশোর

নিন্দার বড় মেয়ে আগে যখন ভিক্ষে করতে আসত, একমুঠো চালের সঙ্গে একটা আলু বা পটল বা ঝিঙে চাইত, পেলেই তাড়াতাড়ি চলে যেত। পোয়াতি হবার পর এবার এই প্রথম এসে নাতবউরানিকে গান করতে দেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে গানের কথাগুলো মন দিয়ে শুনল। গান থামলে বলল, 'একমুঠো চাল আর একটু নুন দেবে মা? নুন দিয়েই ভাত কটা খেয়ে নেব।' যামিনী সব বাড়িতেই আজকাল চাল আর নুন চায়। শুধু ভাত খেয়ে নুনটুকু জমিয়ে রাখে।

কণ্ঠের মায়াভরা উচ্চারণে 'গান দিয়ে প্রাণ বাঁচাব' ভালো করে শুনতে রাস্তার পাশের বাড়িগুলোর ছাদে বারান্দায় গৃহবাসীরা ছুটে আসে। মিছিলের সামনে-পিছনে পুলিশের গাড়ি এখন একবারের জন্যও আর বাদ পড়ে না।

চাকরি থেকে আগাম অবসর নেবার পরও পরীক্ষিৎকে তার সাপ্তাহিক কলাম 'বিষাদগাথা' লিখে যেতেই হয়। আজও তার কোনও কোনও অংশ গানের মিছিলে লাগে, তার অনেক কথাই দেওয়ালে দেওয়ালে দেখা যায়।

পরীক্ষিৎ মিতার কথাও লেখে। মিতা আজকাল তিকানের গাওয়া 'আমি যোগিনী হইয়ে যাব সেই দেশে' গুনগুন করে গায়। 'দে দে আমায় সাজায়ে দে গো' গাইতে গাইতে তার গলা বুজে আসে। তবু সারা দিন ওই একই পদ সে বার বার গায়। যখন গায় না তখন একমনে বসে কী ভাবে, পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করার সাহস পায় না।

নিন্দার বড় মেয়ে আগে যখন ভিক্ষে করতে আসত, একমুঠো চালের সঙ্গে একটা আলু বা পটল বা ঝিঙে চাইত, পেলেই তাড়াতাড়ি চলে যেত। পোয়াতি হবার পর এবার এই প্রথম এসে নাতবউরানিকে গান করতে দেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে গানের কথাগুলো মন দিয়ে শুনল। গান থামলে বলল, 'একমুঠো চাল আর একটু নুন দেবে মা? নুন দিয়েই ভাত কটা খেয়ে নেব।'

যামিনী সব বাড়িতেই আজকাল চাল আর নুন চায়। শুধু ভাত খেয়ে নুনটুকু জমিয়ে রাখে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর সবটুকু জমানো নুন সদ্যোজাত শিশুর মুখের হায়ের মধ্যে পুরে তার কচি গলা টিপে তার জীবনের প্রথম চিলচিৎকার চিরদিনের মতো থামিয়ে দিল।

দিন কয়েক আগে ভাইয়েরা ঘরের পিছনের আস্তাকুঁড় থেকে মাটি খুঁড়ে তিনটে বড় বড় মেটে আলু তুলেছিল, সেই গর্তে প্রাণহীন শিশুকে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে তার ওপর পা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাবাতে লাগল। হঠাৎ একসময় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে সে মাটির ওপর বসে মাটিমাখা দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদেই চলল।

পরীক্ষিৎ গানের মিছিলে যাওয়া বন্ধ করায় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে তার কাছে এসে দুয়েক ঘণ্টা তাকে ঘিরে বসে থাকে। পরীক্ষিৎ মন দিয়ে প্রত্যেকের কথা শোনে। তাদের নিজেদের মধ্যের আলোচনায়ও কখনও কখনও কেউ কেউ তাকে দলে টানতে চায়।

এরা সবাই কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, অধিকাংশই লক্ষ্মীদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। বেশ কিছুদিন একজন শিক্ষকের বদলি হিসেবে পরীক্ষিৎ লক্ষ্মীর অনুরোধে ক্লাস নিয়েছিল, এরা তার সেই সময়ের মুগ্ধ শ্রোতা। সুযোগ পেলেই গানের মিছিলে যায়, পরীক্ষিতের কাছে আসে।

পরীক্ষিৎ তাদের অনেক বিষয়ে তার সংশয়াচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা ও কোনও কোনও বিষয়ে তার দ্বিধান্বিত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা বলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুগত হঠাৎ পরীক্ষিৎকে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার আপনি যামিনীর মর্মান্তিক পরিণামের কথা শুনেছেন?'

পরীক্ষিৎ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ও শোনার মূল্য কী? ঘৃণায় রাগে প্রতিবাদে আমি কি জ্বলে উঠতে পেরেছি?'

সুগতর সহপাঠী দেবালয় বলল, 'না স্যার, সেকথা না। চারজন পুলিশ রাতে তার কুঁড়ে ঘরে ঢুকে তার ছেলেমেয়েদের বাইরে অন্ধকারে

যুবাবয়সি এক পাগল বারো মাস তিরিশ দিন আদালত চত্বরে ঘুরে ঘুরে দরদী গলায় একটার পর একটা গান গায়। সবই রবীন্দ্রসংগীত বা নজরুলগীতি। মাঝে মাঝে হঠাৎই পরিচিত গানের মধ্যে নিজের বানানো কোনও লাইন গেয়ে ওঠে, শুধু তখনই বোঝা যায় তার চোখের সামনের সব কিছুর ওপর তার তীক্ষ্ণ নজর।... আজও শেষবেলায় 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে/তখনও রাঘব-বোয়াল চুনোপুটি এক ঘাটে গো এক ঘাটে' গাইতে গাইতে সে বাউলদের মতো কোমর ভেঙে নাচতে লাগল।

বের করে দিয়ে তাকে আবার রেপ করে।'

পরীক্ষিৎ শান্ত স্বরে বলল, 'তোমরা কী করলে?'

অনেকেই একসঙ্গে বলে ওঠে, 'শুনেই সকালে আমরা থানা ঘেরাও করেছি। এস পি এসে দোষীদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দেবার পর আমরা ঘেরাও তুলেছি। চার পুলিশ নাকি আমাদের আসতে দেখে থানার পিছনের পথ দিয়ে পালিয়েছে। এখন, স্যার, চারজনের এগেনস্টেই পুলিশ কেস হচ্ছে।'

তথাগত অস্বাভাবিক শান্ত স্বভাবের ছেলে, সকলের সব কথা একমনে শোনে, নিজে কিছু বলে না। প্রাচীন কাল থেকে ভারতভাগের সময় পর্যন্ত এদেশের পারিবারিক কাঠামো নিয়ে সে পি এইচ ডি-র থিসিস লিখছে, নানা প্রসঙ্গে পরীক্ষিতের কথা তাকে পথ দেখায়, অনেকক্ষণ থেকে পরীক্ষিতের চোখে চোখ রেখে কিছু বলার কথা ভাবছে দেখে পরীক্ষিৎ বলল, 'তথাগত, কিছু বলতে চাও?'

'পরে বলব, স্যার। আজ আমি উঠি।' অন্যদের দিকে চেয়ে, 'তোমরা কথা বলো।'

বরাবরের অভ্যেস মতো পরীক্ষিৎ তাকে বাইরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলে তথাগত নিচু স্বরে বলল, 'আমার মেজকা আপনার খুব বড় ফ্যান, স্যার। বিষাদগাথা একবারের কিস্তিও ওর বাদ যায় না। আপনি তো জানেন, মেজকা পুলিশের বড় গোয়েন্দা অফিসার। নিজে এলে কারও চোখে পড়তে পারে বলে আমাকেই বলেছে আপনাকে জানাতে— পুলিশ আপনার চারপাশে জাল গুটিয়ে আনছে, যে-কোনও সময় আপনাকে অ্যারেস্ট করে এবার কোনও গোপন জায়গায় নিয়ে গিয়ে জেরা করবে। শাসকদল বিরোধীদল— কেউ কিন্তু আর আপনার পাশে নেই স্যার। আপনি কোনও পক্ষেরই কাজে লাগেননি। মেজকার পরামর্শ, আপনি আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা দরকার হলে মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য নিন। আফটার হল, দেশের মানুষ আপনার সঙ্গে আছে, হয়তো সরকার আপনার জন্য কিছু করে দেখাতে চাইবে।'

তথাগত তার স্বভাববিরুদ্ধ একটানা দীর্ঘ কথা বলে দম নিল।

ঘরে ফিরে এসে পরীক্ষিৎ ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে থেকে আগের কথার খেই ধরে বলল, 'সেই চারজন এস-আই কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা তোমরা জানো?'

'না স্যার, ওরা এখনও পলাতক। পুলিশ তাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়েও কাউকে পায়নি। মজার কথা, দোষীরা কিন্তু এখনও একই অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। দেবালয় সবটা জানে না, যামিনীকে এবার শুনেছি ওর ঘরে ঢুকে ধর্ষণের পর খুন করে ফেলতে চেয়েছিল, ওর ছেলেমেয়েদের প্রাণপণ চিৎকারে ভয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেছে।'

আরেকজন যোগ করল, 'যামিনীর ভাই তিনটেকে তো আগেই ছিঁচকে চুরির অপরাধে জেলে পাঠিয়েছে।'

পরীক্ষিৎ প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলে উঠল, 'সক্রেটিস কেন হেমলক পান করেছিলেন তোমরা জানো?'

যারা জানে এবং যারা জানে না, দু পক্ষই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

কয়েকদিনের মধ্যে বালিসোনা আদালতের সামনে ভিড় উপচে পড়ল। একদল বিক্ষুব্ধ মানুষের গালি-গালাজ ভেদ করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যামব্যাসাডর গাড়িতে একজন প্রাক্তন সাংসদকে আদালতে হাজির করা হল। তার বাড়িতে তল্লাসি চালিয়ে সোনা-হিরের প্রচুর গয়নাগাটি ছাড়াও নগদ বিয়াল্লিশ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। পুলিশবেষ্টিত সাংসদের পিছু-পিছু চার পলাতক পুলিশ সেদিনই তাদের উকিলের সঙ্গে আদালতে আত্মসমর্পণ করল।

দিনের শেষে প্রাক্তন সাংসদ ও চার পুলিশ, কারও-ই জামিন হল না।

যুবাবয়সি এক পাগল বারো মাস তিরিশ দিন আদালত চত্বরে ঘুরে ঘুরে দরদী গলায় একটার পর একটা গান গায়। সবই রবীন্দ্রসংগীত বা নজরুলগীতি। মাঝে মাঝে হঠাৎই পরিচিত গানের মধ্যে নিজের বানানো কোনও লাইন গেয়ে ওঠে, শুধু তখনই বোঝা যায় তার চোখের সামনের সব কিছুর ওপর তার তীক্ষ্ণ নজর। একবার এক কুখ্যাত অপরাধী লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় সমর্থকদের বিরাট বিজয় মিছিল বেরিয়েছিল। সেদিন সারা সন্ধ্যা পাগলের গভীর গলায় 'ওই মহাদানব আসে' শুনে পথচলতি অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আজও শেষবেলায় 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে/তখনও রাঘব-বোয়াল চুনোপুটি এক ঘাটে গো এক ঘাটে' গাইতে গাইতে সে বাউলদের মতো কোমর ভেঙে নাচতে লাগল।

পরের সপ্তাহে অপরাধী শনাক্তকরণে যামিনীকে পুলিশের গাড়িতে জেলের ভেতরের বড় চত্বরে এনে চারজন আসামির সঙ্গে সাধারণ পোশাকের ষোলজন লোকের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। অনেকবার বোঝাবার পর, নানা ভাবে অভয় দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত যামিনীকে একজন অফিসার বললেন, 'দেখুন তো মা, যারা আপনার ওপর থানার ছাদে, আপনার বাড়িতে অত্যাচার করেছিল তারা কি কেউ এদের মধ্যে আছে?'

তিনজনকে চিনতে পেরে যামিনী থর থর করে কাঁপতে লাগল। নিমেষে তার পায়ের কাছে মাটি ভিজে কাদা হয়ে গেল, পরনের ছেঁড়া-ফাটা ময়লা কাপড়ে জলধারা আটকানোর কোনও চেষ্টাই সে করতে পারল না। আঙুল দিয়ে তিনজনকে দেখিয়ে সে কাঁপতে কাঁপতেই মাটিতে পড়ে গেল। মৃৎশয্যা ছেড়ে সে আর ওঠেনি।

চার বছর সাত মাস মামলা চলার পর তিনজনের দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। একজন খালাস হয়ে গেল।

পরীক্ষিতের প্রাক্তন ছাত্রদল এসে তাকে জানাল, রায় ঘোষণার এগারো দিনের মাথায়

আইনের ফাঁক গলে খালাস পাওয়া চতুর্থ আসামী রাতের টহলদারি ভ্যানে বসে মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় রাস্তায় পরস্পরের পশ্চাৎ জুড়ে থাকা বিপরীতমুখী এক কুকুর-কুকুরীকে দেখে আদর করতে গিয়েছিল, কুকুরের কামড় খেয়ে লাফিয়ে ভ্যানে উঠতে গিয়ে পা কেটে কয়েক দিনের মধ্যেই ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা যায়।

ঘটনার বিবরণ শেষ হলে তাদের একজন প্রশ্ন করল, 'এটা কি স্যার যামিনীর অভিশাপ, নাকি পুলিশের নিয়তি?' একজন ছাত্রী যোগ করল, 'নাকি ধর্মের কলে বাতাস লাগা?' আরেকটি ছেলে বলল, 'প্রায় একই সময় অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের অপমৃত্যু নিছক একটা কাকতালীয় ঘটনাও তো হতে পারে?'

'তুমি যেভাবে দেখবে, সেটাই তোমার জীবনে চলার পথ হয়ে উঠবে। আমরা যত কিছুর মধ্য দিয়ে যাই সেগুলো যার প্রাণে যত গভীরে বাজে, তার জীবনের পথও তাকে ততই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়।' একমুহূর্ত থেমে, আবার, 'নিয়ে যায় কি? কী জানি, হয়তো যায়, হয়তো যায় না।' বলে পরীক্ষিৎ লেখার কাগজে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নীরব হয়ে গেল। আজ আর কিছু শোনা যাবে না বুঝে তার প্রাক্তন ছাত্রদল উঠে যায়।

৪০

মাঘমাসের শেষে বৃষ্টি হতে দেখে চাষিদের মনে আশা, এবার জমিতে ভালো ফলন হবে। একজন বুড়ো কৃষক নাতির বয়েসী একজনের হাতে নিজের কলকে ধরিয়ে দিয়ে নিজের মনেই বলে উঠল, 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ/ধন্য রাজার পুণ্য দেশ। খনার বচন কি মিথ্যে হয় রে!'

রবিশস্য উঠে যাবার পর ফাল্গুনের গোড়ায় বেশির ভাগ জমিতে তিল ছড়ানো হল। বালিসোনার বড় দুটি রপ্তানিসংস্থার দালালরা পৌষমাসে চাষিদের ভালোমতো দাদন দিয়ে গেছে। কে কত দাদন ধরাতে পারে তা নিয়ে রেষারেষির শেষ ছিল না। আরবদেশে সাদা তিলের বিরাট বাজার। দীঘির অদূরে সরস্বতীর হাঁসের মতো সাদা নতুন তেতলা বাড়ির আরবি বাসিন্দারা জনে জনে তিলের চাহিদার কথা বলে বেড়াচ্ছে। আরবিদের প্রিয় পদ হোমস্-এ তো বেগুন বাটার চেয়ে তিলই বেশি। তাদের দেশে এরকম অনেক পদ ও মিষ্টিতে তিলের আধিক্য।

আরবদেশে মিস্ত্রি-মজুরের চাকরির আশায় নীচের তলার মাদ্রাসায় যারা আরবি শিখতে আসে, তাদেরও সে-দেশের তিলপ্রধান পদ ও মিষ্টির মহিমার কথা বলা হয়।

আগে আরবদেশীয় মাত্র দুয়েকজনকেই বালিসোনায় দেখা যেত, আজকাল তাদের আনাগোনা কেন বাড়ছে তা নিয়ে বর্ষীয়ানদের

রাস্তার দুধারে বড় বড় ইলেক্ট্রিক বাতির নীচে নানা পসরার সারি সারি দোকান। ছুরি কাঁচি রঙিন কাচের বাসন, তুর্কিদের সেরামিকের বৃত্তাকার সৌভাগ্য-চাকতি, আতর, সুর্মা, নানারকম মেঠাইয়ের দোকানে দোকানে মানুষের ভিড়। অনেক দোকানেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিনা পয়সায় পানি বা সরবত পানেরও ঢালাও ব্যবস্থা।

মনে নানা সংশয়। এভাবে বাড়ি করে তারা এখানে থাকছে কী করে সেটাও তাদের কাছে এক রহস্য। এ রহস্য ভেদ করার দায়িত্ব যাদের সেই পুলিশের বক্তব্য, এরা তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে আসে, যে বাড়িতে তারা থাকছে সেটাও তাদের আত্মীয়দেরই।

ব্যাখ্যা শুনে বিরক্ত এক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক অফিসার বললেন, 'সব জেনেও দে হ্যাভ ক্লোজড দেয়ার আইজ।'

সোমনাথ মণ্ডল বন্দরের শুল্ক বিভাগে সুনামের সঙ্গে চাকরি করে সদ্য অবসর নিয়েছেন, আরবিদের কথায় বললেন, 'আপনি শুধু আরবদেশীদেরই দেখছেন, উর্দুভাষীদের সংখ্যাও বালিসোনায় কীরকম বেড়ে চলেছে লক্ষ করেননি?'

কর্মজীবনে ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ দপ্তরে ছিলেন, সেই অভিজ্ঞতার জের টেনে নিকুঞ্জবাবু বললেন, 'আরবিভাষী হোক, আর উর্দুভাষী হোক, এই যে সবাইকে নীলচাষের মতো তিলচাষে লাগিয়ে দিল এর ফল কী ভয়ানক হবে ভাবতে পারেন? তিলে-তিলে এরা বালিসোনার সর্বনাশ করে ছাড়বে।'

আসাম ত্রিপুরা আন্দামানে নিজের বেত সংগ্রহের ব্যবসা মার খাওয়ার পর থেকে বিষাদগ্রস্ত সুদেব হাজরা কানের নীচে ঘাড় ও গালের সন্ধিস্থল থেকে ঝুলে থাকা মৌচাকের মতো বহুদিনের পুরনো টিউমার অভ্যেস মতো বাঁহাতে ধরে রেখে নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'সামনের মাসে মুসলমানদের স্তমা সমাবেশ। স্তমা, না ইস্তমা, না ইসমা জানি না, আমার মুরগি খামারের ছেলেরা স্তমা বলেই ছুটি চেয়ে রেখেছে।'

'মোছলমানদের এই বারো মাসে তের পার্বণের ঠেলায় আমাদের তো ত্রাহি-আল্লা অবস্থা! রমজান, ঈদ, মহরম তো ফি-বছর দেখছি—'

নিকুঞ্জবাবুর কথার মাঝখানে মণ্ডল বলে উঠল, 'সবেবরাত? সবেবরাত জানেন না?'

'স্তমা ওগুলোর মতো বার্ষিক পরব না, এ হল গিয়ে মুসলমানদের মহাসমাবেশ। চার বছর পর পর একেকবার একেক জায়গায় হয়।'

স্তমা উপলক্ষে বালিসোনায় রেল, বাস, লরি, দেশি-বিদেশি গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই দেশ-বিদেশের ইসলামধর্মাবলম্বীদের ভিড়ে এখানকার বাতাসের গন্ধই বদলে গেল। রাসমাঠে আগাছায় ঢাকা অসমাপ্ত শপিং মলের এক ফালি জায়গা বাদে সব জায়গার ঘাস ঢেকে খালি বাস লরি গাড়ি, ঘোড়া খুলে নেওয়া শকটের ভিড়। অধিকাংশ গাড়ি ধর্মসমাবেশ যতদিন চলবে ততদিন এখানেই থাকবে।

দুবাই, কাতার, সৌদি আরব, মিশর, তুর্কি, সিরিয়া, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনেই থেকে অনেকে স্তমায় যোগ দিতে বালিসোনায় এসেছে। আরব দেশের আপাদমস্তক ধপধপে সাদা পোশাকের দীর্ঘদেহী পুরুষদের দেখে বালিসোনার মানুষ অবাক চোখে চেয়ে থাকে। প্রথম ক'দিন একেকরকম মুখের আদল দেখে একেক দেশের মানুষকে আলাদা করার প্রতিযোগিতা চলল। সব দেশের মৌলবীরাই সুদর্শন। কালো বা সাদা শ্মশ্রু শোভিত, সাদা বা কালো আলখাল্লায় ঢাকা তাদের সম্ভ্রান্ত চেহারা নিয়ে বালিসোনায় পাড়ায় পাড়ায় নিন্দা-প্রশংসার ঢেউ বয়ে গেল।

রাসমাঠ থেকে আধমাইল এগিয়ে ফসল তুলে নেওয়া বিরাট চাষের খেতে অনুষ্ঠানের আকাশচুম্বী প্যান্ডেল, বহু দূর থেকে দেখা যায়। বাসরাস্তার ধারে বিদেশিদের জন্য অনেকগুলো ডিপ টিউবয়েল বসানো হয়েছে। বড়রাস্তা থেকে প্যান্ডেল পর্যন্ত তিরিশ ফুট চওড়া রাস্তা করা হয়েছে, আগাগোড়া লাল নীল সবুজ কাপড়ের আচ্ছাদনে ঘেরা। রাস্তার দুধারে বড় বড় ইলেক্ট্রিক বাতির নীচে নানা পসরার সারি সারি

সাদা তিলখেতের মধ্য দিয়ে একমুহূর্তের জন্য পরীক্ষিৎ সাদা শাড়ি পরা রাঙা-জ্যাঠাইমাকে আসতে দেখল। কোথা থেকে আসছিলেন, কোথায় যাচ্ছেন, কিছুই জানা হল না। তাঁর নতুন সেনাবাহিনী গড়ার কাজ এখন দিশেহারা, গতিহারা নিছক একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়নি কি? পরীক্ষিৎ ভাবে, এ তো বড় রঙ্গ— কাজ শেষ না হলেও জীবন শেষ হয়ে যায়! তার নিজেরই বছরের পর বছর সমুদ্রে ঘোরার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে, কোথাও কোনও কূল এখনও দেখা গেল না।

দোকান। ছুরি কাঁচি রঙিন কাচের বাসন, তুর্কিদের সেরামিকের বৃত্তাকার সৌভাগ্য-চাকতি, আতর, সুর্মা, নানারকম মেঠাইয়ের দোকানে দোকানে মানুষের ভিড়। অনেক দোকানেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিনা পয়সায় পানি বা সরবত পানেরও ঢালাও ব্যবস্থা।

প্যান্ডেলে ঢোকার অধিকার শুধু মুসলমানদের। ছোটরাও যাচ্ছে। তাদের সবাইকে শামিকাবাব দেওয়া হচ্ছে। যারা ভেতরে যেতে পারেনি তারা রাস্তায় ভিড় করে চারদিকের মাইক থেকে মৌলবীদের পাঠ শুনছে।

বালিসোনার বড় বড় সব রাস্তায় ভিড় সামলাতে কাছাকাছি তিন থানার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রোজই দিনের শেষে পুলিশদের সঙ্গে রাস্তার এইসব লোককেও কাবাব, মেঠাই, সরবত খাওয়ানো হয়।

প্রায় পক্ষকাল পরে স্তমা শেষ হয়ে গেলে, বালিসোনার সাধারণ মানুষের মনে সরবত-মেঠাইয়ের মধুর স্মৃতি ছাড়াও তাদের আরও একটা বড় পাওনা হয়েছে— মিনি-মাগনায় সাত-সাতটা গভীর জলের নলকূপ!

রাসমাঠে রোজকার প্রাতঃভ্রমণের আড্ডায় সোমনাথ মণ্ডল, নিকুঞ্জ হালদার, অতীশ রায়, দাসগুপ্ত, সেনগুপ্ত, মুখুজ্যে, বাড়ুজ্যে প্রমুখ শিক্ষিত বয়োবৃদ্ধেরা রাসমাঠ জুড়ে বাস-লরি-গাড়ির রাত্রিবাসীদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর দুর্গন্ধে যারপরনাই বিরক্ত।

'সে-আমলের ভুবন চৌধুরীর কবরটা এখানেই কোথাও না? তার অবস্থাটা ভাবো একবার।' শশধর আঢ্যির এ-কথার পিঠে অবসর পাওয়া সংস্কৃতের হেড পণ্ডিত নিরাপদ ভট্চায বরাবরের মতো পৈতেটা বুড়ো আঙুলে একপাক পেঁচিয়ে রেখে সেই আঙুলেই তর্জনী চেপে বড় একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'তাঁর অবিনশ্বর আত্মা এমন খোশবু সইতে পারলে হয়! নিজের জমিতে নিজের কবরে বারোভূতের মলমূত্র মস্তকধার্য করা কি চাট্টিখানি কথা!'

নিকুঞ্জবাবু বললেন, 'পণ্ডিতমশাই, মলমূত্র কী বলছেন, এ তো দুনিয়ার ম্লেচ্ছদের গু মাথায় নিয়ে বসে থাকা।'

'শীট' থেকে এফিডেফিট করে সেন হওয়া বিনোদ বলল, 'তোমার আবার সব তাতে বাড়াবাড়ি! গুয়ের আবার ব্রাহ্মণ-ম্লেচ্ছ কী!'

কুঁড়ে কর্মকারের আসল নাম লোকে ভুলে গেছে। চাকুরিজীবনে কুঁড়েমি করে এত বেশি অফিস কামাই করেছিল যে একবার মাসের শেষে সর্বসাকুল্যে ছিয়াশি পয়সা বেতন পেয়েছিল। সেই কুঁড়েও সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে যোগ করল, 'ভুবন চৌধুরীর সেই ছেলেটা, যে বালিসোনায় খাটা-পায়খানা বন্ধ করেছিল, সেও তো বাপের পাশেই ঠাঁই পেয়েছে!'

৪১

গ্রীষ্মে তিলফুলে রাস্তার দুধার দিগন্ত অবধি সাদা হয়ে উঠেছে। এক রবিবার সংগীতমিছিলের শেষ পর্বে ফুলের সাগরে ঢেউ উঠেছে দেখে আনন্দে গান গাইতে গাইতেই একদল কিশোর-কিশোরী রাস্তা ছেড়ে তিলখেতে নেমে পড়ল। তারা আল ধরে এগিয়ে চলেছে।

নীলাম্বরের মা মিছিলের বাইরে এসে তাদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'ওরে, মেয়েরা, তোরা ফিরে আয়। তিলফুল তুলে মালক্ষ্মীকেও বারো বছর বামুনের ঘরে দাসীর কাজ করতে হয়েছিল, তোরা জানিস না? মেয়েরা, তোরা ফুল ছুঁসনি যেন, বিয়ের আগে একটা তিলফুল ছিঁড়লেও শাপ লাগে, তোরা ফিরে আয়।'

তার গলার স্বরে তার বয়েস এখনও ছাপ ফেলেনি দেখে অনেকেই আশ্চর্য হয়। কথাগুলো মেয়েদের উদ্দেশে বললেও তার আসল লক্ষ্য তাদেরই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী তিস্তা, যেমন গানে, তেমনই লেখাপড়ায়, তেমনই পারিবারিক পরিচয়ে মেয়েটি একটি রত্নবিশেষ। একেই সে মনে মনে তার ভাবী পুত্রবধূ বলে ভেবে রেখেছে।

মেয়েরা তিলফুল নিয়ে তার সতর্কবার্তা কেউ শুনে, কেউ না শুনে ছেলেদের সঙ্গে আনন্দে গাইতে গাইতে তিলখেতের মধ্যে এগিয়ে চলল।

সেদিন গানের মিছিলের শেষে নন্দিনী নীলাম্বরের মাকে বলল, 'সত্যিই তিলফুল তুললে মেয়েদের শাপ লাগে, দিদি?'

'ওমা, তুমি লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়োনি? লক্ষ্মী তিলফুল তুলেছিল বলেই ব্রহ্মা তাকে শাপ দিয়েছিল। তাতেই তো মালক্ষ্মীকে বারো বছর অভিশপ্ত জীবন কাটাতে হয়েছে।'

'সর্বনাশ! তাহলে আমার কী হবে দিদি?'

'তাহলে বলি, কোনওদিন তোমায় বলিনি, আজ বলছি, দিবাকরকে ওভাবে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করল শুনেই আমার মনে হয়েছিল তুমি নিশ্চয়ই বিয়ের আগে তিলফুল তুলেছিলে!'

'আমার দুর্ভাগ্যের কথা না। ওই যে মেয়েরা তিলখেতে ছুটে গেল, ওদের মধ্যে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার মেঘাবৃতর বিয়ের কথা হয়ে আছে। সে যদি ফুল ছিঁড়ে থাকে?'

'কোন মেয়েটা বলো তো?'

'তোমাদের স্কুলেই পড়ে, তিস্তা।'

পরের রবিবার খুব সকালে রাসমাঠে নেমে এসে পরীক্ষিৎ সংগীতমিছিলের যাত্রা শুরু করিয়ে মিছিল দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত বাবার কবরের কাছে বসে রইল। সমবেত কণ্ঠের গান ভেসে এলেও মিছিলের সম্মুখভাগ যখন আর চোখে পড়ে না, তখনও মিছিলের শেষটুকু ধীরে ধীরে রাসমাঠ পার হচ্ছে দেখা গেল। সেইসময়টা পরীক্ষিৎ নিজের মনে কথা বলে চলল। ভোর থেকেই আকাশ খুব মেঘলা দেখে জাহাঙ্গীরও চলে এল। অম্বরীশ নিজের কবরের ওপরে কায়ক্লেশে এসে বসল।

সাদা তিলখেতের মধ্য দিয়ে একমুহূর্তের জন্য পরীক্ষিৎ সাদা শাড়ি পরা রাঙা-জ্যাঠাইমাকে আসতে দেখল। কোথা থেকে

আসছিলেন, কোথায় যাচ্ছেন, কিছুই জানা হল না। তাঁর নতুন সেনাবাহিনী গড়ার কাজ এখন দিশেহারা, গতিহারা নিছক একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়নি কি? পরীক্ষিৎ ভাবে, এ তো বড় রঙ্গ— কাজ শেষ না হলেও জীবন শেষ হয়ে যায়! তার নিজেরই বছরের পর বছর সমুদ্রে ঘোরার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে, কোথাও কোনও কূল এখনও দেখা গেল না। রাঙা-জ্যাঠাইমাও তার জীবন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। দিনের শেষে তাঁকে না দেখে তার বুক মোচড়ায়, দুঃখে মন অসাড় হয়ে যায়। ভাবতে ভাবতে ভেজা চোখে হঠাৎ দেখল, সাদা ফুলে ভরা তিলখেতের হাওয়ায় সাদা আঁচল উড়িয়ে রাঙা-জ্যাঠাইমা বহু দূরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, পরীক্ষিৎ তাঁকে দেখছে, তিনি জানতেও পারছেন না। জানলে একবার অন্তত পরীক্ষিতের দিকে তাকাতেন।

দুপুর গড়িয়ে গেলে ভণ্ডুলরা এসে পরীক্ষিৎকে পাঁজাকোলা করে বাড়ি নিয়ে গেল।

মাঝরাতে জ্বর বাড়লে নীলাঞ্জনা তার মাথায় আইসব্যাগ ধরে। পরদিন সকালে ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে জানালেন— 'মেজর মেন্টাল শক। তাছাড়া হয়তো কোনও ব্যাপারে সাংঘাতিক ফ্রাসট্রেশনে ভুগছেন।'

ওষুধে জ্বর নামছে না দেখে সন্ধ্যায় অন্য ডাক্তার আনা হল। তাঁর ডায়াগনোসিস— মারাত্মক স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি, একাকীত্বের ক্লান্তি। সেইমতো আরও দুটো ওষুধ বাড়িয়ে দেওয়া হল।

জ্বর নেমে যাবার পর মিতা একটা দুর্গামূর্তি দেখিয়ে পরীক্ষিৎকে জিজ্ঞেস করল, 'পেতলের দুর্গাঠাকুর তুই কোথায় পেলি রে? তোর জোড়ের 'হিসট্রি অফ সিভিলাইজেশন'-এর খণ্ডগুলোর ধুলো ঝাড়তে গিয়ে বইয়ের পিছনে পেলাম।'

পরীক্ষিৎ হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে বলল, 'পেতলের? বাবা ভেবেছিলেন সোনার। নদী খুঁড়তে খুঁড়তে পেয়েছেন। এটা, আর একটা অজ্ঞাত আমলের স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে বাবার ধারণা হয়েছিল হারানো নদীও খুঁজে পাওয়া যাবে। ঘাটের ধ্বংসাবশেষটাও বাবাকে হাতছানি দিত। ডায়েরিতে এসব লিখে গেছেন। তুমি বলছ ওটা সোনার নয়, পেতলের?'

'দেখে বুঝতে পারছিস না?'

'স্যাঁকরাকে দেখিয়ে নিলে হয়।'

পাঁচ পুরুষ ধরে জমিদারবাড়ির সোনা-রুপোর গয়না, থালা-বাটি, ঠাকুরের সিংহাসন বানায় যে স্যাঁকরাবংশ তাদের এখনকার তরুণ বংশধর রাধাবল্লভ দুর্গামূর্তি যাচাই করে এসে জানাল, এটা অনেক আগের আমলের জিনিস। তেইশ ক্যারেট সোনার তৈরি। নদী খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া গেছে মানে এ তো এখন সরকারের

এক ভাই রাগে উন্মত্ত দৃষ্টিতে আনন্দমোহনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেও ঠান্ডা মাথায় বলল, 'এ জায়গাটা আমাদের সতীদাহগঞ্জো হলে আজ রাতেই তোমার ধড় গঙ্গায় ভাসত, মামা। মুণ্ডুটা আমরা পাইকারদের কাছে বেচি, খুলিও কাজে লাগে।'
'মামা! কে তোদের মামা!' রাগে কাঁপতে কাঁপতে আনন্দমোহন দারোয়ান ভূধরকে হাঁক পাড়লেন, দরজার দিকে ঘুরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভূধর! ভণ্ডুল! এ দুটোকে ঘাড় ধরে বাড়ির বাইরে বার করে দে।

সম্পত্তি। সেকথা সালংকারে ব্যাখা করে জিজ্ঞেস করল, 'গলিয়ে ফেলি কত্তাবাবু? জিনিসটা তাহলে আর সরকারের ঘরে যায় না। সোনার দাম দিন দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে, আখেরে আপনাদেরই লাভ! আজকাল সোনা ঢেলে বিশেষ কেউ আর তেমন গয়নাগাটিও বানাচ্ছে না।'

পরীক্ষিৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'সরকারের জিনিস গলাবি কী রে! পরিচয়লিপি তৈরি করে দুর্গামূর্তি সরকারকেই দান করে দেব।'

পরীক্ষিতের আত্মঘাতী পিসির দুই ছেলে রাসমাঠ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে শুনে কিছুদিন হল মামার বাড়িতে এসে বসে আছে, তারা দুজন একসঙ্গে বলে উঠল, 'এটা তো মামা পেয়েছিল, এতে আমাদের মায়েরও ভাগ আছে।'

এবার একজনের গলা, 'মার অবর্তমানে তার অংশ তো আমরাই পাব।' দুজনে আবার একসঙ্গে বলে ওঠে, 'তোমরা এটা কাউকে দান করতে পারো না।'

পরীক্ষিৎ, নীলাঞ্জনা, পারমিতা তিনজনই বিরক্ত হয়ে যে যার মতো চুপ করে রইল।

দুই ভাই পরপর তিনজনের মুখ দেখে নিল। এক ভাই বলল, 'এবার কিন্তু আমরা আমাদের মায়ের সম্পত্তির ভাগ বুঝে নিতেই এসেছি। আমাদের পাওনা-গণ্ডা নিয়ে তবেই ফিরব।'

অন্য ভাই বলল, 'রাসমাঠের কীরকম দাম পাওয়া যাবে পরীক্ষিৎ?'

পরীক্ষিৎ ক্লান্ত স্বরে বলে, 'আমি বেঁচে থাকতে রাসমাঠ বিক্রি হতে দেব না।'

একভাই এবার হেসে ফেলল, 'জন্মালে মরতে হবে, অমর কে কোথা থাকবে ভাই? তুমি আর কদ্দিন, যা তোমার শরীরের অবস্থা!'

পারমিতা ক্রোধ চেপে বলল, 'গঙ্গার ধারে তোমাদের পৈতৃক বাড়িতে শুনেছি তোমরা দুভাই চিতার কাঠের ব্যবসা করো, বাড়িতে চ্যালা কাঠ ডাঁই দিয়ে রাখো। বারো মাস তিরিশ দিন, দিন নেই রাত নেই শবযাত্রীরা, চণ্ডালরা এসে কাঠ প্যাঁকাটি নিয়ে যায়। এই করে যারা সংসার চালায় তারা চৌধুরী বাড়ির কে? কেউ না! তোমরা আর এসো না। কিছু টাকা দিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে চিরকালের মতো চলে যাও!'

দুভাই একসঙ্গে, 'কত টাকা?'

পরীক্ষিৎ শ্রান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কত আশা করো?'

'কাল রাসমাঠ ঘুরে এসে বলব। স্বর্ণদুর্গার কীরকম ওজন?'

নীলাঞ্জনা কথা না বলবার সংকল্প ভেঙে বলে উঠল, 'স্বর্ণদুর্গায় তোমাদের কোনও অধিকার নেই। ওতে তোমাদের মা'র কোনও অংশ নেই। আমি পরীক্ষিতের মাথা ধোয়াব, তোমরা বাইরে যাও।'

'স্বর্ণদুর্গা কত ভরি বললে না তো?'

সেজোভাই আনন্দমোহন দরজার বাইরে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল, হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলল, 'আমি সব খবর নিয়েছি। তোদের দামড়া ছেলে তিনটেকে চিতার কাঠ শ্মশানে ডেলিভারি দেওয়ার কাজেও লাগিয়েছিস!'

এক ভাই রাগে উন্মত্ত দৃষ্টিতে আনন্দমোহনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেও ঠান্ডা মাথায় বলল, 'এ জায়গাটা আমাদের সতীদাহগঞ্জো হলে আজ রাতেই তোমার ধড় গঙ্গায় ভাসত, মামা। মুণ্ডুটা আমরা পাইকারদের কাছে বেচি, খুলিও কাজে লাগে।'

'মামা! কে তোদের মামা!' রাগে কাঁপতে

হুইশিল পড়ে গেছে, যাত্রীরা তবু অনড় দেখে বুড়ি অনুনয় করল, 'সাতটা ইস্টিশন পরেই শহরের দোকানে নাম্যে দে চলে আসব, আমারে একটু তুলে নেন বাবুরা।'

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। লম্বা-চওড়া বুড়ি এক গুঁতোয় জায়গা করে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে বস্তাটা কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমরা যে দুগ্গাপুজোয় পাঁঠা বলি, মোষ বলির রক্ত মাখো তখন কি মোছলমানরা কিছু বলে?'

কাঁপতে আনন্দমোহন দারোয়ান ভূধরকে হাঁক পাড়লেন, দরজার দিকে ঘুরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভূধর! ভণ্ডুল! এ দুটোকে ঘাড় ধরে বাড়ির বাইরে বার করে দে। একেবারে বালিসোনা পার করে দিয়ে আসবি। দরকার হলে আমাদের দলের ছেলেদের খবর দিবি।'

এক ভাই ভণ্ডুলদের দিকে হাতের তালু তুলে রেখে বলল, 'তার দরকার নেই মামা। আমরা রাসমাঠ দেখে ফিরে যাচ্ছি। আবার আসব।'

'খবরদার আর বালিসোনায় কখনও পা দিবি না! দাসপাড়ার প্রমোদ-ছোঁড়ার সঙ্গে তোর মা যেদিন স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা না দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল সেদিনই চৌধুরীবাড়ির মুখে চুনকালি দিয়েছিল। তারপর আত্মঘাতী হয়ে আরও এক পোচ কালি লাগাল। এখন তো কাঠপোড়া কালি লাগাচ্ছিস! চিতার কাঠ বেচে খাস, এবার এসেছিস সম্পত্তির ভাগ নিতে! সহোদর বোন না হলে কবেই মেয়েটাকে কুচি কুচি করে কেটে হাতানিয়া- দোয়ানিয়ায় ভাসিয়ে দিতাম! কে রে তোরা? তোদের পদবি আলাদা, গোত্র আলাদা, তোদের বাপ ছিল জোচ্চর রেশন-দোকানদার, রেশনের চাল-চিনি ব্ল্যাক করত, তোরা হলি চিতার চ্যালাকাঠ সাপ্লায়ার!'

'চিতায় আমরা তুলতেও জানি। ওদের বলে দাও কেউ যেন আমাদের গায়ে হাত না দেয়! রাসমাঠ একচক্কর ঘুরে চলে যাব। এত তড়পালে, তাই বলে যাচ্ছি, এখানে তোমাদের যে দল, ওখানে আমরাও কিন্তু সেই দলই করি।'

'চোপ! বেরো, বেরো এখান থেকে!'

'বেরব তো নিশ্চয়ই, আবার আসবও ঠিকই! বলো তো একশো ভাগ শুকনো কিছু কাঠ আগাম পাঠিয়ে দিই। শ্মশানে এই কাঠকে কী বলে জানো তো? বারুদমাখা কাঠ। সামনের ভোটে কিন্তু ভিজে কাঠও ব্ল্যাকে বিকোবে!'

নীলাঞ্জনা আর পারমিতা পরীক্ষিৎকে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মাথা ধুইয়ে দিচ্ছিল, যাতে দেওয়াল ভেদ করেও যম-রাক্ষসের বাগযুদ্ধ জলের শব্দে ঢাকা পড়ে যায়, কিছুতেই পরীক্ষিতের কানে না পৌঁছয়।

মাথা ধোওয়ানো শেষ হবার অল্প পরেই প্রদীপ পরীক্ষিতের খবর নিতে এল। রোজ রাতে সে একবার এসে দেখে যায় পরীক্ষিৎ কতটা সুস্থ হল, কাল তাদের বেরনো হবে কিনা।

ততক্ষণে পরীক্ষিতের ধুম জ্বর ফিরে এসেছে।

তিলখেতেই আবার রাঙা-জ্যাঠাইমার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। এবার তাকেও দেখেছে। ভরা জ্যোৎস্নায় সাদা তিলফুলের মধ্যে গ্রিক দেবীর মতো সাদা গাউনে আবক্ষ ঢাকা সরোজিনী পরীক্ষিতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'ভেঙে পড়িস না রে। বালিসোনানদী না বাঁচলে বালিসোনা-ও বাঁচবে না। তোর বাবা এখনও মাটি খুঁড়ে চলেছে, নদীর খোঁজ ও একদিন পাবেই।'

পরীক্ষিতের খুব কৌতূহল, সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখন কী করছ রাঙাজেঠি?'

'আমার অনেক কাজ। চ' এবার বাড়ি ফিরি। তুই শুয়ে থাকবি, আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দেব।'

বাড়ি ফিরে সত্যিই রাঙা-জ্যাঠাইমা তার শিয়রে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকল।

শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বার আগে পরীক্ষিৎ বলল, 'তুমি যে বেঁচে আছো আমি জানতাম না। আর কখনও চলে যেয়ো না।'

নীলাঞ্জনা পরীক্ষিতের কপালে জলপটি দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, জ্বরের ঘোরে তার ভুলবকার শব্দে জেগে উঠে আইসব্যাগ এনে মাথায় চাপাল।

সেবছরই প্রথম বালিসোনার রাস্তায় উটের সারি দেখা গেল।

কুরবানি ঈদের কিছু আগে থেকে দরজিদের কাঁচি ধার দেবার দোকানগুলোয় গোরু হালাল করার ছুরিতে শান দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। ঈদের দুদিন আগেই মাঝরাতে রাস্তা জুড়ে গোরুর দীর্ঘ সারি দেখা গেল। সকালের দিকে সাতটা উট যেতে দেখে অনেকেই জানলা দিয়ে ছোটদের দেখাতে লাগল।

ঈদের দিন সকাল থেকে কুরবানির রক্তমাখা নতুন থামি ও গেঞ্জি পরে থালায়, বাটিতে, হাঁড়িতে, গামলায়, ব্যাগে, বস্তায় বড় বড় মাংসের খণ্ড প্রতিবেশীদের বাড়ি-বাড়ি বিলোন শুরু হল। ট্রেনের কামরায় কাঁচা মাংসের থলে থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়তে দেখে হিন্দু যাত্রীরা নাক ঢাকে, মুখ বিকৃত করে। তাদের ক্রুদ্ধ গালিগালাজের মধ্যেই লম্বা-চওড়া চেহারার এক বুড়ি ট্রেন ছাড়বার মুখে একটা মাংসের বস্তা কামরার দরজায় ভিড় করে দাঁড়ানো যাত্রীদের পায়ের কাছে ধপাস করে নামিয়ে দুহাত দিয়ে বস্তাটা ভেতরে ঠেলতে ঠেলতে বলল, 'চর্বি সব জমে গেছে গো, তোমাদের গায়ে এক ফোঁটা রক্তও লাগবেনি!'

হুইশিল পড়ে গেছে, যাত্রীরা তবু অনড় দেখে বুড়ি অনুনয় করল, 'সাতটা ইস্টিশন পরেই শহরের দোকানে নাম্যে দে চলে আসব, আমারে একটু তুলে নেন বাবুরা।'

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। লম্বা-চওড়া বুড়ি এক গুঁতোয় জায়গা করে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে বস্তাটা কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমরা যে দুগ্গাপুজোয় পাঁঠা বলি, মোষ বলির রক্ত মাখো তখন কি মোছলমানরা কিছু বলে?'

দরজায় দাঁড়ানো যাত্রীদের দুজন ছাত্র হাত বাড়িয়ে বুড়িকে সাহায্য করতে ঝুঁকলে বয়স্করা হইহই করে ওঠে।

পিছনের কামরা থেকে উচ্চ রবে সমবেত কণ্ঠের 'জয় জয় রাম, জয় জয় রাম' শুনে এ-কামরার অনেকে তালে তালে মাথা নাড়ছিল, সেদিকে ইঙ্গিত করে মাংসের বস্তাওলা বুড়ি দুঃখ করে বলল, 'রামনামের কামরায় তো পায়ের নাতি উঁচিয়ে দরজা থেকে তেইড়ো দিল, এখানে তবু যা হোক একটু জায়গা দিলে বাবুরা!'

এক মাঝবয়েসি মহিলা সিটে বসে অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন, পুজোয় বলির কথাটা শুনে পাশের কলেজ ছাত্রীকে বললেন, 'আমরা যখন ছোট ছিলাম, স্কুল ছুটির পর হিন্দু-মুসলমান মেয়েরা বাড়ির পথে কিছুটা এগিয়ে দু-দল দুদিকে চলে যাবার সময় আমরা ওদের খ্যাপাবার জন্য মজা করে বলতাম, আল্লা আল্লা করিস তোরা, আল্লা আছে ঘরে? লুঙ্গি টুপি পরে আল্লা ঝিঙে চুরি করে।

ওরাও আমাদের দিকে ফিরে বলত, কালী কালী করিস তোরা— তোদের কালী ল্যাংটা, স্বামীর বুকে দু-ঠ্যাং তুলে নাচছে খালি খ্যামটা।'

ছাত্রীটি হেসে ফেলে বলল, 'এখন তো এরকম ঠাট্টা তামাসা থেকে দাঙ্গা লেগে যেতে পারে, মাসিমা।'

দুধসাদা দু-তিনতলা বাড়ির বাসিন্দারা গোরু-উটের মাংস তিনভাগ করে একভাগ গরিব-দুঃখীদের (বেশিটাই তিলচাষিদের), আরেক ভাগ আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে বাকি একভাগ নিজেদের প্রয়োজনে রাখে। বেশ কিছুটা মাংস অনেকদিন ধরে রোদে শুকনো হয়। তখন অন্ত্যজ হিন্দুরাও নাকে গামছা চাপা দিয়ে রাস্তা পার হয়।

পরের মাসেই উত্তুরে হিমেল হাওয়া শুরুর বদলে দখ্‌নে-বাতাস বইছে দেখে বালিসোনার বয়োবৃদ্ধরা ভয় পেল। পৌষের পর মাঘ শেষ হয়ে এল, মাঝে মকরসংক্রান্তির সময় দিন তিনেকের কনকনে হাওয়া ছাড়া গোটা শীতকালটাই তেমন জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ল না।

পরীক্ষিৎ তার রাঙাজ্যাঠার ওষুধের বাক্স ঘেঁটে চিকেন পক্সের হোমিওপ্যাথি প্রতিষেধকের বড় শিশি বের করে দেখল ভেতরের সব দানা গোলাপি বর্ণ ধারণ করেছে।

দোকান থেকে চার ড্রামের চার শিশি নতুন ওষুধ কিনে সরোজিনীর বালসেনাবাহিনীর ছেলেমেয়েদের দিয়ে আলাদা আলাদা মোড়ক বানিয়ে বালিসোনার দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করল। একাজের মূল দায়িত্ব দেওয়া হল তার স্নেহভাজন, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর।

শীতঋতু থাকতেই গরম পড়ে যাওয়ায় সাপেরা গর্তের শীতঘুম ছেড়ে উঠে এসেছে। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষেই সাতজন চাষিকে সাপে কাটার খবর পাওয়া গেল। বৃদ্ধরা গুড়ুক গুড়ুক শব্দে তামাক টানে আর ভাবে এসব নতুন বছরের অশুভ সংকেত নয় তো?

সকাল থেকে বসন্তের ওষুধ বিলির তদারকি সেরে বাড়ির কাছাকাছি এসে পরীক্ষিতের ভুরু কুঁচকে গেল। তাদের গেটের সামনেটা ঢেকে বিরাট একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে।

লালকমল-নীলকমলের সামনে ট্রাক থেকে ভারি ভারি যন্ত্র নামানো হচ্ছে, আর্মির পোশাকে দুজনকে চিনতে খানিকটা সময় নিয়ে পরীক্ষিৎ অজানা শংকায় বলে ওঠল, 'এসব কী? এ কি কোনও যুদ্ধের প্রস্তুতি?' বলতে বলতে লালকমল-নীলকমলের দিকে এগিয়ে গিয়ে অদ্ভুত একটা আবেগে দুজনকে একসঙ্গে বুকে টেনে নেয়। 'এতদিন কোথায় ছিলে? তোমরা কেমন আছো? এখন এলে কোথা থেকে?'— তার প্রশ্নের যেন শেষ নেই।

পরীক্ষিতের চেয়ে মাথায় লম্বা লালকমলের

পরী গান থামিয়ে মুখ নিচু করে বসে ছিল, এই প্রথম কথা বলল, 'পাড়ার মাতব্বররা আমাকে মায়ের শ্রাদ্ধ করতে বলেছিল, আমার মন সায় দেয়নি। মা হয়তো পথ হারিয়ে ঘুরে মরছে, একদিন ঠিক ফিরে আসবে। ঠিক আসবে, দেখো তোমরা।' মিতা বলল, 'তা-ই যেন হয় রে! মেয়েটা সারাজীবন শুধু দুঃখই পেয়ে গেল।' শিউলির কপাল থেকে নরম চুলসারি সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ধর মা, একটা কীর্তন ধর দেখি।'

গলার স্বরও বদলে গেছে। বাবার বুক থেকে আলগা হয়ে ভরাট গলায় বলল, 'ঠাকুরদা নদীর একটা রুটম্যাপ করেছিলেন না? ওটা একবার দেখা দরকার। বালিসোনা থেকে সাগরমোহনা মোট পঁয়ষট্টি মাইল।'

নীলকমলও তার বদলে যাওয়া স্বরে যোগ করল, 'ভারতের সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে দীর্ঘ খাল আমরাই বানাব।'

'ইন্ডিয়ান আর্মি এই ধরনের কাজ করতে রাজি হবে?'

'আর্মির সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা দুভাই বালিসোনাকে তার হারানো নদী ফিরিয়ে দেব।'

'তোমরা আর্মিতে নেই? আর্মির পোশাক কেন তাহলে?'

'এ তো ওল্ড মিলিটারি গুডসের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। আমরা কিনেছি হিমাচলের একটা দোকান থেকে।'

'যন্ত্রগুলো কীসের? ওগুলোও কি তোমাদের?'

'দুটোই জার্মানির তৈরি। রাজস্থানে লুপ্ত নদী সরস্বতীর সন্ধানে এরকম অনেক যন্ত্র ওরা ব্যবহার করে। পুরনো হয়ে গেলে বেচে দেয়। আমরা এই দুটো কিনে নিয়েছি।'

বাড়িতে ঢুকে মৃদুস্বরে কীর্তন শুনে পরীক্ষিৎ উত্তেজনায় চমকে ওঠে। মিতার ঘরে তার সামনে বসে তিকান নয়, পরী গাইছে। পরীর পাশে ছ-সাত বছরের একটা শান্ত চেহারার মেয়ে।

লালকমল-নীলকমল একসঙ্গে ঘরে এসে বলল, 'ভালো আছো মিতাঠাম্মা?' লালকমল আলাদা বলল, 'তোমার কীর্তন শোনার জন্য কেমন পরীকে এনে দিলাম। পরীর মেয়ে শিউলির কচি গলার কীর্তন শুনেও তুমি অবাক হয়ে যাবে।'

'তিকান এল না কেন?' পরীক্ষিৎ জড়োসড়ো পরীর দিকে উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে রইল।

দু-ভাই একটা কম্পাস আর একটা দূরবীন কেনার খবর বাবাকে দিতে যাচ্ছিল, তাছাড়া পাহাড়ের নীলা আর চুনিও বাবাকে দেখাতে চায়, বলল, 'দোল পূর্ণিমায় পাড়ার প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়ে আর ফেরেনি। অন্যরা সবাই ফিরে এসেছে, তাদের কেউ কেউ বলছে— যমুনায় স্নান করতে গিয়ে তিকান মাসি জোয়ারে ভেসে গেছে।'

পরী গান থামিয়ে মুখ নিচু করে বসে ছিল, এই প্রথম কথা বলল, 'পাড়ার মাতব্বররা আমাকে মায়ের শ্রাদ্ধ করতে বলেছিল, আমার মন সায় দেয়নি। মা হয়তো পথ হারিয়ে ঘুরে মরছে, একদিন ঠিক ফিরে আসবে। ঠিক আসবে, দেখো তোমরা।'

মিতা বলল, 'তা-ই যেন হয় রে! মেয়েটা সারাজীবন শুধু দুঃখই পেয়ে গেল।' শিউলির কপাল থেকে নরম চুলসারি সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ধর মা, একটা কীর্তন ধর দেখি।'

পরীর চোখে জল দেখে শিউলি ফোঁপাতে শুরু করেছিল, এবার কেঁদে উঠল।

পরীক্ষিৎ বলল, 'মেয়েটা পরীর, বুঝতে পারছি। তোমাদের মধ্যে ওর বাবা কে?'

'ওর বাবাকে কি তুমি দেখেছ? পরীকে এ-বাড়িতে প্রাইভেট পরীক্ষার টিউশান দিতে আসত। শিউলি পেটে আসার খবর শুনেই পালিয়েছে! পালাবে কোথায়!'

পরীক্ষিতের সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে লালকমল নীলকমল অম্বরীশের তৈরি লুপ্ত নদীপ্রবাহের পথচিত্র খুঁজতে খুঁজতে প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রাটা দেখতে পেল। লালকমল বলল, 'আমরা পাথরের প্রাচীন মুদ্রা পেয়েছি বাবা,

মানুষের প্রাণবায়ুর জন্য এই মহাযুদ্ধ বালিসোনায় আমরা শুরু করে দিয়েছি। পৃথিবীর যেখানেই ভালো গাছের বীজ পাবি বালিসোনায় এনে ছড়িয়ে দিস।' হঠাৎ লালকমলের কাছে ঘেঁসে এসে চোখের তারা ঘুরিয়ে চারদিক দেখে নিল। তারপর পাতলা কাগজের সাতটা পুরিয়া হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এতে ভালো ভালো মানুষের বীজ আছে, খালপাড়ের নতুন মাটিতে বুনে দে গিয়ে। ভালো মাটি পেয়েছি, এবার দরকার শুধু ভালো গাছের বীজ আর ভালো মানুষের বীজ। যত পারিস ছড়িয়ে যা।'

জেড পাথরের, মোট এগারোটা। হাতির দাঁত বসানো মুকুট-পরা মাথার ছবিওলা সেই মুদ্রা কোথাকার, কার সময়ের, জানতে পারিনি।'

নীলকমল বলে উঠল, 'জানো বাবা, মুদ্রার কাছেই জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে একটা কাঠের মূর্তি আছে। হয়তো কোনও দেবতার মূর্তি', থেমে লালকমলের দিকে চেয়ে, 'বলি, লাল?'

'না বললে বাবা বুঝবে কী করে?'

'জানো বাবা, একটা অদ্ভুত ব্যাপার, মূর্তির লিঙ্গটা একহাতের বেশি লম্বা। সেই পাহাড়ে পাথরের মধ্যে আমরা চুনি আর নীলার অনেক পাথর পেয়েছি।'

'মূর্তিটা হয়তো কোনও আদিবাসীগোষ্ঠীর পৌরাণিক দেবতা। পাথরের মুদ্রাও হয়তো তাদের গোষ্ঠীপতি বা রাজার।'

অম্বরীশের কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে পরীক্ষিৎ বলল, 'লুপ্তপ্রবাহের পথচিত্র মোহনার অনেক আগে শকুনতলি গ্রামে শেষ হয়ে গেছে। শকুনতলির বাসিন্দারা পুরুষানুক্রমে বিশ্বাস করে আসছে যে এখানেই বালিসোনা-নদীতে লখিন্দরের শবের গন্ধে শকুনির ঝাঁক সারা দিন ধরে আকাশে চরকি কেটেছিল।'

শকুনতলির পরে আরও পাঁচটা গ্রাম ছুঁয়ে সেকালে এই নদী সাগরে গিয়ে মিশত। হারানো নদীর বুকে কালে কালে কোথাও শনিমন্দির হয়েছে, কোথাও চালাঘর তুলে লোকজন বসবাস করছে, কোথাও ডোবা খুঁড়ে, পুকুর কেটে মাছ ধরা চলছে, কোথাও বাজার বসে গেছে, অম্বরীশের করা ম্যাপ থেকে সেগুলো আলাদা করে লিখে নেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে নীলকমল।

চৌধুরীবাড়ির স্যাঁকরা রাধাবল্লভ হুগলি থেকে রত্নপাথর কাটার কারিগর আনিয়ে চুনি ও নীলা পাথরগুলোর উপযুক্ত আকার ও উজ্জ্বলতা আনল। রাধাবল্লভ নিজে সাতটা বিভিন্ন ক্যারেটের চুনি ও তিনটে নীলা কিনে নিল, বাকিগুলোও তার কাছে রইল, যখন যেটা ভালো দাম পাবে, কলকাতার বউবাজারের দোকানে বেচে নিজের কমিশন রেখে লালকমলদের টাকা দিয়ে যাবে। রাধাবল্লভ একসঙ্গে এতগুলো রত্নপাথর দেখে এগুলোর কোনও ইতিহাস জানতে চায়নি, ভেলভেটের হাতখানেক লম্বা থলি ভরে নীলা-চুনি নিয়ে চলে যাবার সময় শুধু বলে গেল, 'সাতপুরুষ ধরে আপনাদের সেবা করে আসছি কত্তাবাবু, আপনাদের বিশ্বাসই আমাদের মূলধন। ভালো দামই পাবেন আপনারা। এ হল আসল বার্মিজ রুবি, বার্মিজ স্যাফায়ার।'

লালকমল বলল, 'বর্মার জঙ্গলে আমরা অনেক দিন ছিলাম।'

নীলকমল বলল, 'নীলা-চুনির মান গোত্র ওজন দাম একটা কাগজে লিখে নাম সই করে আমাদের কাছে রেখে যান, কার্বন কপি আপনি নিয়ে যাবেন।'

বালিসোনা গ্রাম বাদে বাকি আঠেরটি গ্রাম ঘুরে দেখে চাপা পড়া নদীর বুকে চালাঘর, বাজার, মন্দির, সেলুন, চায়ের দোকানের প্রত্যেককে তাদের চাহিদা মতো টাকা বিলি করতে ফাল্গুন শেষ হয়ে গেল। চৈত্র থেকে মাটি খোঁড়ার বড় বড় দুটো যন্ত্র চালু করা হল। দিন রাত কাজের জন্য প্রচুর লোকও লাগানো হয়েছে।

তিন মাস অবিরাম মাটি তোলার পর উনত্রিশ জায়গায় মাটি ফুঁড়ে জল চুঁইয়ে উঠতে লাগল। নদীখাত যত মোহনার দিকে এগোয়, তত বেশি জলমুখের সংখ্যা ও পরিধি বাড়ে। শ্রাবণের শেষাশেষি বৃষ্টিতে অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটুজল হলেও ভাদ্রের মাঝামাঝি জল শুকিয়ে গেল। সকলে আশা করেছিল হয়তো মোহনায় জোয়ারের সময় পুরো পঁয়ষট্টি মাইল বা তার অনেকটা জলে ভরে যাবে।

সেই আশাতে লুপ্ত নদীখাতের দুপাড়ে মাটির স্তূপে গ্রামের মানুষ ভাগে ভাগে শাক-সবজির চাষ শুরু করেছে।

প্রদীপও অনেক দিন পর নতুন উৎসাহে খালের দুপাড়ের জন্য ফল ফুল তাল সুপুরি নারকেল গাছের চারা বিলোবার ব্যবস্থা করল। লালকমল-নীলকমলকে পেয়ে প্রদীপ তাদের বোঝায়, 'পৃথিবীতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ কাদের সঙ্গে কাদের হবে জানিস? পরমাণুযুদ্ধের আশংকা আর নেই, এবার বিশ্বযুদ্ধ হবে যারা প্রকৃতি ধ্বংস করে আর যারা প্রকৃতি রক্ষা করে সেই দু-দল মানুষের মধ্যে। মানুষের প্রাণবায়ুর জন্য এই মহাযুদ্ধ বালিসোনায় আমরা শুরু করে দিয়েছি। পৃথিবীর যেখানেই ভালো গাছের বীজ পাবি বালিসোনায় এনে ছড়িয়ে দিস।' হঠাৎ লালকমলের কাছে ঘেঁসে এসে চোখের তারা ঘুরিয়ে চারদিক দেখে নিল। তারপর পাতলা কাগজের সাতটা পুরিয়া হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এতে ভালো ভালো মানুষের বীজ আছে, খালপাড়ের নতুন মাটিতে বুনে দে গিয়ে। ভালো মাটি পেয়েছি, এবার দরকার শুধু ভালো গাছের বীজ আর ভালো মানুষের বীজ। যত পারিস ছড়িয়ে যা।'

নীলকমল হেসে বলে, 'তোমার বিয়ে হল না কেন, ছোট্‌দাদু?'

'গাছপালার সঙ্গে কবেই আমার নাবালক-বিয়ে হয়ে গেছে! তোরা আর সেসব জানবি কী করে! তোরাও কি সেই এক কন্যেকে দুজনে মিলে বাল্যবিয়েই করলি?'

লালকমল বলল, 'আমাদের ঠাকুর্দা মনে হয় আমাদের জন্মের বহু আগে বালিসোনার হারানো নদীর সঙ্গে আমাদের দু-ভাইয়ের বিয়ের কথা পাকা করে গেছেন।'

লক্ষ্মী হাসপাতালের নানা দুর্নীতির খবরে হতাশ ও বিরক্ত হয়ে হাসপাতালে যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। রোগীর অপারেশনের পর সেলাই করার মোটা সুতোর বদলে রোগীর আত্মীয়রা ভালো সুতো চাইতে গেলে ওয়ার্ডবয় টাকা দাবি করে। তাই নিয়ে বচসা ও তার পরিণামে বিনা সেলাইয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়ে এক রোগীর মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই লক্ষ্মী হাসপাতালে যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে খালপাড়ে এসে লালকমল-নীলকমলদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কাটিয়ে যায়। বালিসোনার মানুষের কাছে এটা খাল না, তাদের বিশ্বাস লালকমল-নীলকমল বালিসোনার হারানো নদীই ফিরিয়ে আনছে। কেউ কেউ কল্পনায় দুই পাড়ে নারকেল তাল

সুপারিবনের সারি এখন থেকেই দেখতে শুরু করেছে।

মাঝে মাঝে ভোরে এসে লক্ষ্মী নদীখাতের ধার বরাবর হাঁটতে হাঁটতে মোহনার দিকে অনেক দূর অবধি চলে যায়। গ্রামের মানুষের রোগব্যাধির খবর নেয়। নদীর বুকে একটা ভাসমান হাসপাতাল তার এখন ধ্যান-জ্ঞান। একজন ডাক্তার, একজন কম্পাউন্ডার, একজন নার্স আর একজন মাঝি ও রাঁধুনি নিয়ে ছোট্ট চলমান হাসপাতাল। এরও নাম সরোজিনীর নামে হবে ভেবে রেখেছে। সরোজিনী আরোগ্য তরী। পুরো পঁয়ষট্টি মাইল উনিশটি গ্রামের প্রত্যেকটিতে একদিন করে বজরা নোঙর করে রেখে, সেই গ্রামের অসহায় মানুষদের চিকিৎসা হচ্ছে— সে চোখ বুঝলে দেখতে পায়। খাল কাটা বা নদী উদ্ধার শেষ হবার আগেই সে হুগলির বলাগড় থেকে লিওনের নকশা মতো ছোট বজরা বানাতে উদ্যোগী হল।

সরোজিনী গ্রামীণ হাসপাতালে সরকার থেকে একজন প্রশাসক বসানো হয়েছে। একদিন সেই প্রশাসক ডাঃ খাস্তগীর ভোরবেলা মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে নদীর ধারে লক্ষ্মীকে ধরে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আপনি নাকি নৌকো-হাসপাতাল করার কথা ভাবছেন? এভাবে মানুষের চিকিৎসা হয়? এসব করে আপনি কী পান মিসেস চৌধুরী-উনগারেত্তি?'

'ঠিক জানি না, হয়তো শান্তি পাই।'

বালিসোনা নদীর জলে-কাদায় বালিসোনার মানুষও শান্তি দেখার আশায় বুক বেঁধেছে। নদী যেদিন ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে সেদিনটার কল্পনা করে কেউ কেউ নবান্নের মতো ঘরে ঘরে নদী-উৎসব পালন করার বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে।

দীর্ঘ নদীখাত 'ল্যাজা হইতে মুড়া খুঁইজ্যা' দেখেও 'জলে সোনা, থলে সোনা, বালি সোনাগুঁড়া' পাওয়া যায়নি বলে লালকমল-নীলকমলের মনে খেদ নেই, তারা উনত্রিশটা জলমুখ নিয়েই তুষ্ট, বিভিন্ন ঋতুতে জলের স্বাদ গন্ধ ও কমাবাড়ার বিশ্লেষণে তারা বেশি মনোযোগ দিল।

নদী বেঁচে উঠলে কী কী হবে, তা নিয়ে মানুষের মনেও জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। নদীর ধারে ঘাসজমিতে অনেক বেশি গোরু চরতে দেখে তারা আনন্দ পাবে। একদিন নিশ্চয়ই আমবন জামবন বট অশত্থের মাথায় ভোরে ও সন্ধ্যায় পাখিদের উচ্চ কলকাকলিও শোনা যাবে।

বালিসোনায় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার নতুন ঢেউ উঠতে দেখে লালকমল-নীলকমলের আনন্দের সীমা নেই। রোববারের ভোরের মিছিল যখন হাজার হাজার লোকের গানে-স্লোগানে মুখর, পরীক্ষিৎ যথারীতি মিছিল রওনা করিয়ে অম্বরীশকে নদী উদ্ধারের কথা বলে যাচ্ছে, তখন রাস্তা জুড়ে পর পর আটটি মিলিটারি ট্রাককে পথ ছেড়ে দিয়ে মিছিল বেঁকে নদীখাতের ধার ধরে এগিয়ে চলল।

মিছিলের কয়েকজন সবার আগে দেখল হাঁটুজলে বুজকুরির মধ্যে কার শব ভেসে আছে। একজন বলল, তবে কি কাল রাতে মোহনার জোয়ারে ভেসে এসে ভাঁটায় এখানে আটকে পড়েছে!

মেঘাবৃতর হাতে সম্পূর্ণ হওয়া ডানাওলা দুটো সাইকেলে লালকমল-নীলকমল নদীখাত ও মিছিলের মাঝখান দিয়ে দ্রুত চলে যাবার সময় শুধু বলে গেল, 'আগে বাঢ়ো, আগে বাঢ়ো, শবের কথা পরে ভাবো।'

রোজকার মতো খাল থেকেই এক ঘটি গঙ্গাজল নিতে এসে পরী শবদেহ দেখে আঁৎকে উঠে চোখ ঢাকল। ভয়ে ভয়ে হাত সরিয়ে দ্বিতীয়বার শবের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার দৃষ্টি পাথরের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল। সেদিন থেকে পরী আর কখনও গঙ্গাজল নিতে খালে যায়নি।

আগামী সংখ্যায় শেষ

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
প্রথম উপন্যাস
বিষাদগাথা

দুই শতাব্দী যাপনের জীবন্ত আঁকিবুঁকি। মূল্য ১৭৫ টাকা

২৫ আগস্টের মধ্যে ১২৫ টাকা পাঠিয়ে দিলে আমাদের খরচে ক্যুরিয়ারে ঘরে বসেই বই পাবেন। চেক পাঠাতে হবে নীচের ঠিকানায়। সঙ্গে আলাদা কাগজে নিজের নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখতে ভুলবেন না।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বইয়ের দোকানে পাওয়া যাবে।

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.,** 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-Mail:** info@swarnakshar.in

অনলাইন কেনার জন্য ▸ www.swarnakshar.in

বুড়োক্রেজি

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূরিভোজের ব্যয়ভার

বড় বড় ব্যুরোক্র্যাটদের সঙ্গে সহবাস করতে গিয়ে ছোট ব্যুরোক্র্যাটদের কত না বিপত্তি। বড় ব্যুরোক্র্যাটদের ধরণধারণ একেবারেই অন্যরকম। বেশিরভাগই ভারি কেতাদুরস্ত, উচ্চভ্রূ, কুঞ্চিতনাসিকা। সাধারণ মানুষ তাঁদের দিকে তাকান সম্ভ্রমের চোখে।

কখনও ভীতির চোখেও। ক্ষমতাবান সেই সব মানুষ কখন কার আচরণে রুষ্ট হন তা-ই বা কে জানে!

ছোট ব্যুরোক্র্যাটরা পর্যন্ত তাঁদের সমঝে চলেন।

আবার কোনও ব্যুরোক্র্যাট নিতান্তই খাদ্যরসিক। বাইরে তাঁর কঠিন খোলস, কিন্তু সুখাদ্যের সন্ধান পেলে তাঁর কাঠিন্যের খোলস ঝরে গিয়ে প্রকাশিত হয় ভেতরের মানুষটা।

এরকমই একজন জেলাশাসক একবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন সুন্দরবন দেখতে যাবেন দুদিনের জন্য। সুন্দরবন তাঁর এলাকার মধ্যেই পড়ে, অতএব তিনি যেতেই পারেন জঙ্গলের হালহদিশ নিতে। জঙ্গলের বাইরেটা যতই সবুজ হোক, তার ভেতরে চোরাকাঠুরেরা জঙ্গল কেটে ফাঁক করে দিচ্ছে কি না, কিংবা রয়েল বেঙ্গল নিয়ে আমরা যতই বড়াই করি না কেন, সেখানে চোরাশিকারিরা বাঘ মেরে জঙ্গল শূন্য করে দিচ্ছে কি না— এরকম নানা খবর নিতে যাওয়ার হক আছে তাঁর। যদিও বনবিভাগের বাঘা বাঘা আধিকারিকরা আছেন বাঘের দেখভাল করতে, কিন্তু কত সময় রক্ষকই তো হয়ে ওঠে ভক্ষক। জেলাশাসকের আচমকা এক ভিজিটে কতকিছুই আবিষ্কার করা সম্ভব। তাই ঠাকুরান নদী পার হয়ে গভীর জঙ্গলে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য।

সুন্দরবনে যাওয়ার বাহনগুলি থাকে মহকুমাশাসকদের অধীনে, ডায়মন্ড হারবারের নবাগত মহকুমাশাসককে বার্তা পাঠিয়ে জেলাশাসক জানিয়ে দিলেন তাঁর অভীপ্সা।

মহকুমাশাসক সেই বার্তা পড়ে তৎক্ষণাৎ তলব করলেন মহকুমার নাজিরবাবুকে।

নাজিরবাবু খুব এলেমদার মানুষ, বিষয়টি অবগত হওয়ার পর মাথা চুলকে বললেন, স্যার, ডিএম সাহেব কিন্তু খেতে খুব ভালোবাসেন।

মহকুমাশাসক এখনও অফিসের সব ইন্টুবিন্টু বোঝেন না, বললেন, তা খেতে তো সবাই একটু-আধটু ভালোবাসে।

—কিন্তু স্যার, ইনি একটু বেশি ভালোবাসেন। সাদা জল, রঙিন জল।

মহকুমাশাসক একটু অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি? সেই ব্যবস্থাও কি আমাদের করতে হবে?

—তাই তো করা হয়, স্যার। নাজিরবাবু খোলাখুলি বলেই ফেললেন।

এসডিও ঢোক গিলে বললেন, ঠিক আছে, কত আর খাবেন!

কিন্তু জেলাশাসকের এই ভিজিট একটু আলাদা রকমের। টেলিফোন-বার্তা এল তাঁর সঙ্গে যাবেন তাঁর কিছু বন্ধুবান্ধব, তাঁরা সবাই সুন্দরবন দেখতে ইচ্ছুক, অতএব সেইমতো খাওয়ার ব্যবস্থা যেন থাকে।

নাজিরবাবু বুঝে গেলেন সাহেব কী চাইছেন, তৎক্ষণাৎ বাজারে ছুটলেন সারাদিনের স্টক কিনে লঞ্চে তুলতে। একটু বেশি-বেশিই কিনতে হল সবকিছু।

কিন্তু পরদিনের বার্তায় জানা গেল জেলাশাসকের ইচ্ছে আরও একটু বেশি। তিনি সাধারণ লঞ্চে না গিয়ে যাবেন কেতাদুরস্ত স্টিমারে। নামখানা ঘাটে দু-দুটো পেল্লাই স্টিমার দাঁড়িয়ে থাকে সারাক্ষণ, তার সারেং-খালাসিরা যাত্রীর অভাবে বসে বসে মাইনে পায়। যাত্রী পাবেই বা কী করে! স্টিমার নয় তো রাজার হাতি। তার খোরাকি জোগাড় করতে রাজা প্রাণান্ত। এখানে রাজা মানে জেলাশাসকের অফিস। একটা স্টিমার একঘণ্টায় যত কয়লা খায়, তাতে দশবার লঞ্চে যাতায়াত করা সম্ভব।

এই স্টিমারদুটো কোনও একসময় কেনা হয়েছিল বিগ বিগ ভিআইপিদের নিয়ে সুন্দরবন দেখানোর জন্য। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী, নিদেন রাজ্যের রাজ্যপাল বা মুখ্যমন্ত্রী চড়লে তবু মানায়, মানে খরচটা পোষায়, কিন্তু জেলাশাসকরা কালেভদ্রে চড়েন খরচের কথা ভেবে।

দুটো স্টিমারের একটার নাম 'ইস্তাহার' তো অন্যটার নাম 'ন্যান্সি'। এ বলে আমায় দ্যাখ তো ও বলে আমায় দ্যাখ। দুজনেরই হাতির খিদে। সে-কথা তোলাও হল জেলাশাসকের কানে, কিন্তু তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, লক্ষ লক্ষ টাকা দামের বাহন না-চলে-চলে নষ্ট হয়ে যাবে এরপর।

তাঁর যুক্তিও অকাট্য, অতএব এক সুমধুর ভোরে বহু লোকলস্কর সহ জেলার কর্ণধার চললেন সুন্দরবন অভিমুখে। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন সঙ্গী ও সঙ্গিনী। তাঁদের পোশাক-আশাকেই পরিস্ফুট তাঁদের আভিজাত্য।

'ইস্তাহার'-এর ভাগ্যেই পড়ল এবারের যাত্রা। মস্ত ডেকের ওপর দামি চেয়ার পাতা, সামনে গোল সেন্টার টেবিল। তার ওপর সাদা ধবধবে তোয়ালে পাতা। চেয়ারে বসতে না বসতে এসে পৌঁছল বিশাল কাপে দুধখয়েরি রঙের কফি। সাহেবের আবার কফিই পছন্দ। কফির সঙ্গে আলাদা প্লেটে করে বিগ-বিগ সাইজের কাজু, রকমারি বিস্কুট, চানাচুর।

ইস্তাহারের মাস্তুলে তখন হাওয়া ধরেছে। মাস্তুলের ওপরে সাদা রঙের একটি পতাকা উড়ছে পতপত করে। তার ওপর উড়তে শুরু করেছে সাদা ডানা মেলে সি-গাল। বাতাসে ভেসে আসছে সামুদ্রিক নোনা হাওয়া। তার ঝাপটে টেবিলের তোয়ালে উড়তে থাকে এলোমেলো। উড়তে থাকে সুন্দরী সঙ্গিনীদের লাল-নীল আঁচল।

ডেকের একদিকে একটা মোটা চোঙ, সেই চোঙ দিয়ে বগ বগ করে বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া। ঊর্ধ্বমুখী ধোঁয়ার কুণ্ডলি এঁকেবেঁকে উড়ে যাচ্ছে নীল আকাশ লক্ষ করে।

প্রায় জাহাজের মতো দেখতে বিশাল স্টিমারটির চলার শব্দও ভারি অদ্ভুত। ভেতর থেকে গমগম করে একটানা শব্দ আসছে গম্ভীর স্টিমারের আকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। দুপাশে লোকালয় ছাড়িয়ে একটু-একটু দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের আভাস। সকালের মিষ্টি রোদে তার সর্বাঙ্গে তখন সবুজের নানা শেড।

কফির কাপে তখন তুফান উঠছে আস্তে-আস্তে। আড্ডা নাকি আলোচনা তা বোঝাই দায়। কথার খেই তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে সংবাদপত্রের নানা পৃষ্ঠায়। সংবাদপত্র থেকে আলোচনা জাতীয় রাজনীতি থেকে আন্তর্জাতিক স্তরেও। তার মধ্যে পরিবেশিত হয় নানা ধরণের জোকস। তাতে যেমন হা-হা হাসির হুল্লোড়, তেমন খিলখিল হাসির জলতরঙ্গ।

তার মধ্যে কফির কাপ শেষ হয়ে যায়, কফির সঙ্গে আসে আরও কাজু, প্যাটিস, পেস্ট্রি।

সেই পাট শেষ হতে না হতে এসে যায় ব্রেকফাস্ট। সেন্টার টেবিলে দেখা যায় মোগলাইয়ের গরম উপস্থিতি। চিলি-চিকেনের টুকরো। নোনা হাওয়ায় নাকি খিদের উদ্রেক হয় জোরদার। হুল্লোড়ে আরও। ফলে ব্রেকফাস্টের ডিশ উধাও হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে।

নদীর দুপাশে জঙ্গলের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ। লোকালয় প্রায় শেষ, সবুজ বনভূমি আরও শেড ছড়িয়ে ঘোরতর সুন্দরী হয়ে উঠছে ক্রমশ। দু-মানুষ, আড়াই-মানুষ সমান গেঁয়ো, ক্যাওড়া, বাইন গাছের পাতাগুলি হাওয়ার চামরে নাচছে দু-হাত তুলে। বেলা তখন প্রায় এগারোটা, সবাই সেই মিষ্টি রোদ্দুর-ভেজা অরণ্যে দেখার চেষ্টা করছে কোথাও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে কি না বনের বাসিন্দারা। কিন্তু না, দেখা যাচ্ছে না। কে যেন বলল, ধুর, তারা দুপুরে কেউ বেরোয় নাকি! সন্ধের আলো পড়ুক বনে, তারপর—

কেউ আবার অতি উৎসাহী হয়ে ব্যাগ থেকে বার করে ছোট এক দূরবিন। সেই দূরবিন চোখে লাগিয়ে তন্ন তন্ন ঢুঁড়ে ফেলতে থাকে গহন বনের অন্দর। যদি কোথাও দেখা যায় হরিণের দল। কোথাও জিরোতে দেখা যায় বনের রাজাকে। একটা হেঁতাল বন দেখে কে যেন বলল, হেঁতাল বনেই বাঘের বসবাস কেন-না হেঁতাল বনের রং অনেকটা বাঘের গায়ের মতো হলুদ।

কিন্তু না, হেঁতাল বনও পার হয়ে যায় নিরীহ মুখ করে।

ক্রমে দুপুরের তাত একটু করে বাড়ে। ডেকের ওপর আর তত মনোরম নয়। তাঁরা ডেকের পাট চুকিয়ে চলে আসেন সুদৃশ্য কেবিনের ভেতর। দুধ-সাদা বিছানার চাদরের ওপর ছড়িয়েছিটিয়ে তাঁরা আড্ডায় মশগুল হন। এবারে আসে দফায় দফায় চা। সুগন্ধি চায়ের সঙ্গে উড়তে থাকে আড্ডার খই।

মাথার ওপর তখনও ঘুরেফিরে উড়ছে এক দঙ্গল সি-গাল। তারা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে সাদা পতাকা উড়তে-থাকা মাস্তুলটিকে কেন্দ্র করে। হয়তো মাস্তুলের ওপর পতাকার উড়ন্ত সাদা কোণগুলিকে তারা অন্য কোনও সি-গাল বলেও ভাবতে পারে।

ইস্তাহার তখন গমগম শব্দ করে এগিয়ে চলেছে সমুদ্রবঙের জল কেটে। যত সমুদ্রাভিমুখী হচ্ছে, ততই জলের রং হচ্ছে কপার সালফেট রঙের। স্টিমারের ঘূরন্ত প্রপেলারের ঘর্ষণে সাদা ফেনা কাটছে সেই সামুদ্রিক জল। তার মধ্যে দুপুর গড়িয়ে আসে, সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় উদ্রেক হয় প্রবল খিদের, তার ফলে লাঞ্চ দেওয়া হয় নির্ধারিত সময়ের আগেই। বড় বড় ডিশে বিশাল সাইজের পারশের ঝাল, সর্ষে-ইলিশ, প্লেট-ছাপানো চিতল মাছের পেটি, বাঘা-বাঘা চিংড়ির মালাইকারি শোভা পায়। মাটন আসে বড় বড় বাটি ভরে। ফলে লাঞ্চ প্রলম্বিত হয়।

লাঞ্চের পর কেবিনের জানালা দিয়ে সুন্দরবনের শোভা আরও বৃদ্ধি পায়, কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে জঙ্গল পর্যবেক্ষণের পর সবাই বেরিয়ে আসেন বাইরে। তখন রোদ্দুরের তেজ কমে গিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গল হয়ে উঠেছে আরও মনোহর।

তখন ফেরার পথ ধরেছে সারেং। যতখানি পথ এসেছে উজিয়ে, এখন রাত্রি গভীর হওয়ার আগেই ফিরে যেতে হবে স্টিমারের ঘাটে।

ডেকের ওপর চেয়ারগুলো আবার সকালের মতো ভরভরন্ত। জেলাশাসকের ইঙ্গিত বুঝে নাজিরবাবু তখন টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিলেন অনেকগুলো গ্লাস। সকালে ছিল সাদা জল, এবার চলে এলো রঙিন জল। ফলে সুন্দরবন ভ্রমণ হয়ে উঠল আরও রঙিন। সারা বিকেল সারা সন্ধে রঙে টইটম্বুর হয়ে উঠল পানীয়ের কল্যাণে। ঠিক সেই মুহূর্তে কিনারের কাছে দেখা গেল দুটি হরিণশিশু তাকিয়ে আছে স্টিমারের দিকে, তাদের দুই চোখে ভারি সরল চাহনি।

অমনি লঞ্চের ডেকে তৃপ্তির হুল্লোড়। কেউ বললেন, হরিণ তো দেখা হল, এবার একটা বাঘ দেখলেই যোলোকলা পূর্ণ।

তখন আরও রঙিন পানীয় আসে। ভরে ওঠে শূন্য গ্লাসগুলি। সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার মুহূর্তে আলো জ্বলে উঠেছে ডেকের ওপর। কেউ গুনগুন করে গান করছেন, কেউ হাসছেন উচ্চকণ্ঠে। কেউ গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে হাঁটছেন ডেকের ওপর।

ওদিকে নাজিরবাবু প্রমাদ গুনছেন, যতগুলি বোতল কিনে এনেছিলেন তা প্রায় শেষ। স্টিমারঘাটে ল্যান্ড করা পর্যন্ত স্টক থাকলে হয়! নেশার জিনিস, মাঝপথে ফুরিয়ে গেলে বড় সাহেব খেপে যেতে পারেন অধস্তনের ওপর। অতএব একটু-একটু জল মেশাতে থাকেন পানীয়ে। সবারই চোখ এখন ঝাপসা, পানীয়ের রং ফিকে হলেও ধরতে পারবেন না মনে হয়।

পানীয় ক্রমে ফিকে থেকে ফিকেতর করতে হচ্ছে কেন-না এই মাঝনদীতে তো আর পানীয়ের দোকান খুঁজে পাওয়া যাবে না! ডাঙায় হলে চট করে গাড়ি ছুটিয়ে কিনে আনা যেত ক-বোতল।

অবশেষে মধ্যরাতে স্টিমার ঘাটে ল্যান্ড করতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে নাজিরবাবুর। ঘাটে অপেক্ষা করছিল সাহেবদের গাড়িগুলো, সেই গাড়ি রওনা করে দিয়ে তবে নাজিরবাবুর ছুটি।

পরদিন সকালেই নাজিরবাবুকে ডেকে পাঠালেন এসডিও, জিজ্ঞাসা করলেন, তা কীরকম হল বড় সাহেবের ট্যুর?

মাথা চুলকে নাজিরবাবু বললেন, স্যার, সঙ্গে যাদের এনেছিলেন বড় সাহেব, তাঁদের হাঁটু পর্যন্ত পেটের খোল। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে।

বলে যে-অঙ্কটি বললেন তিনি, তা শুনে এসডিও-র আক্কেল গুড়ুম। বললেন, এত টাকা পেমেন্ট করব কী করে! দাঁড়ান বড় সাহেবকে বলি, তিনি কিছু শেয়ার করেন কি না!

নাজিরবাবু হামলে পড়লেন, স্যার ওই কাজটি করবেন না। আমার চাকরি চলে যাবে।

—তাহলে?

—স্যার, এই সাহেবের অনেক ট্যুর আমি সামলেছি এর আগে। তিনিই উপদেশ দিয়েছেন কী করে বিল মেটাতে হয়। বলেছেন মাঝেমধ্যে অফিসের ডিপার্টমেন্টের আসবাবপত্র অদল-বদল করতে হয়। লোন ডিপার্টমেন্টের আসবাব নিয়ে আসতে হয় কপিং ডিপার্টমেন্টে, আবার কপিং-এর আসবাব নিয়ে যেতে হয় লোনে। এই অদলবদল হয় কাগজে-কলমে। সেই মজুরির টাকাটা চলে যাবে খাওয়াদাওয়ার বিল মেটাতে।

ক য়ে ক টি চি ঠি

কেবলই ছাত্রাবস্থার জন্য বই?

'পুরনো অ্যালবাম'-এ 'কালান্তর' পত্রিকার সম্পাদকীয়-পুনর্মুদ্রণ পড়ে এই চিঠি। চৌষট্টি বছর আগে লেখা সম্পাদকীয়, কিন্তু বাঙালির পাঠাভ্যাস সম্পর্কে আজও একই রকম সত্যি। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গভাষায় রচিত আরও পুরাতন এক প্রহসনের কথা মনে পড়ে গেল। স্ত্রী তাঁর স্বামীকে উপহার দেওয়ার মতো কোনও দ্রব্য খুঁজছেন। কেউ বললে আচকান দিন। স্ত্রী বললেন, সে তো তাঁর আছে একখানা। আরও অনেক জিনিসের কথা বললে অনেকে। স্ত্রীর মন ভরে না, তাঁর সেই এক উত্তর, সেও তো তাঁর আছে ক'খানা। শেষে কেউ একজন বললে, তাহলে বই উপহার দিন। স্ত্রী তার জবাবেও বললেন, সেও তো তাঁর একখানা আছে। এমনই আমাদের পাঠাভ্যাস! সম্পাদক যথার্থই লিখেছিলেন, বাল্যে-কৈশোরে স্কুল-কলেজে পড়ার তাগিদে নেহাত বাধ্য হয়েই কিছু বইপত্র পড়তে হয়। আয়ুর ওই পর্যায়টুকু কোনওমতে কাটিয়ে দিতে পারলে আমজনতার বেশিরভাগের আজও কালো অক্ষরগুলি দেখার প্রতি তীব্র অনীহা। তাই বাংলা বইয়ের পাঠকসংখ্যা সীমিত হয়েই আছে।

কিন্তু পুস্তকপাঠকে আজীবনের অভ্যাস করে তোলা গেল না কেন? অথচ টেলিভিশন, ক্রিশে সিরিয়াল, তো বেশ অভ্যাস হল! সে কি আমাদের পাঠশালামুখী বিদ্যাপ্রবণতার নেতিবাচক প্রভাবে? ছোট থেকে ওই যে রক্তে ঢুকে গেল পড়াশোনার সঙ্গে পরীক্ষা নামে এক বিভীষিকার গভীর আত্মিক সম্পর্ক আছে, আর জানা হয়ে গেল পরীক্ষা মানেই উদ্বেগ, সেই থেকে কালো অক্ষরগুলো বমনউদ্রেককারী ঔষধ হয়ে উঠে থাকবে। সিলেবাসের সঙ্গে আমাদের মনের সংযোগ ঘটল না, বস্তুনিষ্ঠ পৃথিবীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। আর পৃথিবী যে কী বস্তু সে তো সকলেই জানেন! যেখানে আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছে-অনিচ্ছে অচল পয়সা দিয়েও কেনার লোক নেই। এ প্রসঙ্গে প্রতিবেশীর এক শিশুর কথা বলতেই হয়। একদিন অবসরে তাকে ঘরে-বাইরের নানা জিনিস দেখিয়ে সেসবের ইংরিজি অর্থ বলে দিচ্ছিলাম। খেলাচ্ছলে সেও খুবই উৎসাহ নিয়ে তালে তাল দিচ্ছিল। হঠাৎই সন্দেহের চোখ নিয়ে থমকাল। চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমায় পড়ানোর চেষ্টা করছ না তো?' আমাদের স্কুল-কলেজ, পাঠশালা, সমাজ আমাদের অভিমন্যু তৈরি করে বাজারে ছেড়েছে। ছেলেবেলায় পড়াশোনা ফেলে রেখে আমরা যখন মাঠে-প্রান্তরে খেলে বেড়াতাম, বড়রা স্নেহমিশ্রিত ধমক দিয়ে বলতেন, 'জানো না কি, ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ—ছাত্রদের কাছে অধ্যয়নই তপস্যা?' ছাত্রাবস্থা কেটে গেলে জীবনে অধ্যয়নের ভূমিকা কী, সে সম্পর্কে কিছুই জানালেন না। ছোট থেকে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার এইভাবে অসম্পূর্ণ হয়ে থাকল।

অবশ্য এসব কথাই হচ্ছে আমজনতাকে নিয়ে। ব্যতিক্রমীরাও অবশ্যই আছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের মধ্যেও কত যে শ্রেণিভেদ! এমন নেশারু পাঠক দেখেছি, যিনি হাতের কাছে অন্য কোনও বইপত্র না পেলে টেলিফোন ডিরেক্টরি খুলে গম্ভীর মুখে পড়তে বসে যান, যেন তার মধ্যে গভীর কোনও তত্ত্বানুসন্ধান করছেন। আবার বাসে-ট্রামে চলাচলের পথে অজস্র চপলমতি পাঠক-পাঠিকা দেখি, হাতে সম্প্রতি বেরনো কোনও ইংরিজি পেপারব্যাক, অনুমান করতে পারি সেটির সবকটি লাইনই অপঠিত, যদিও বইটি আগাগোড়া মুখস্থ করলেও হয়তো পৃথিবীর বিশেষ কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। বইপাড়ার দোকানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন, টাকার মায়া না করে থলেভর্তি বই কিনছেন, কাঁধে করে ট্যাক্সি অবধি বয়ে নিতে গিয়ে কালঘাম ছুটছে, এমন লোককে এককথায় পাঠক ভেবে নিয়ে বেশ কয়েকবার ঠকেছি। পরে দেখেছি এরা হয় বইদোকানের চতুর্থশ্রেণির কর্মী, নাহলে আরেক শ্রেণির ছদ্ম-পাঠক। এই ছদ্ম-পাঠকরা তাঁদের সাজানো ড্রয়িংরুমের অলংকারের জন্য ভারী ভারী বিষয়ের গোদা গোদা বই কেনেন। অর্থাৎ আপাতস্বীকৃত পাঠকরাও যে সব সময় বই-ই পড়েন এটা বোধহয় ঠিক নয়।

অক্ষরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় শৈশবে। তৎপরবর্তী বয়সকালে একমাত্র খবরের কাগজের মাধ্যমেই সে পরিচয় বেঁচে থাকে। আজকাল সেই পরিচয়-সূত্র বজায় রাখারও বিশেষ কারণ দেখি না। দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যম এখন সংবাদজগতের ঘটোৎকচ। উপরন্তু, অনেকেই দেখতে পাই ভুলে গেছেন হাতে লিখলে 'ত'-এর গোল্লাটা বাঁদিকে ঘুরবে, না ডাইনে, 'ত'-এ র-ফলা আর 'ক'-এ র-ফলা লেখার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য কোন জায়গায়। কেননা, এখন তো কম্পিউটারেই লেখালেখি, পড়াশোনা।

ফলে, বই কে কিনবে এ প্রশ্নের মীমাংসা বই আবিষ্কারের পর থেকেই করার চেষ্টা চলেছে, কিন্তু সমাধান মেলেনি। তা বলে কি বই প্রকাশ পাওয়া বন্ধ হয়েছে? চারদিকে ফোঁস-ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছে কত নাগ-নাগিনী— কেবল টিভি, ইন্টারনেট, সেলফোন, ই-বুক রিডার! তবু তারই মধ্যে বেঁচে আছে বই। বেঁচে আছে বইয়ের গন্ধ। তাই বই না পড়লেও, অনেক বইয়ের মধ্যে থাকার আনন্দে বইমেলায় যায় লোকে।

ব্যাসদেব মহাভারত লেখার জন্য গণেশের শরণ নিয়েছিলেন। গণেশ বললেন, লিখব, কিন্তু তোমার বাপু থামলে চলবে না। জিভ পরিষ্কার করে নাও। স্পষ্ট উচ্চারণে গরগর করে ডিক্টেশন দাও, তবে কাজটা করি। হোঁচট খেলে, থামলে, তোতলালে, আমি কিন্তু নেই।

সেই শুরু। সেই একই মহাভারতের জের, আজও টেনে চলেছেন লেখককুল, সম্মিলিত উদ্যমে।

প্রণবেশ ঘোষ
সাঁকরাইল

কবি কি সময়ের সারথি?

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা অংশে কবি শঙ্খ ঘোষের উত্তর আর একবার পড়তে খুবই ভালো লাগল। কবিতা-পরিচয় যখন প্রকাশ পেত আমি সেসময় কলেজের ছাত্র ছিলাম এবং নিয়মিত পড়তাম পত্রিকাটি। শঙ্খ ঘোষের এই সাক্ষাৎকারটির কথা বিশেষ করে মনে ছিল, তাঁর উত্তর দেওয়ার ভঙ্গিমায় এক ধরণের ঋজুতার জন্য। আজও তাঁর এই কথাগুলি অমোঘ মনে হয়, 'কোনও সময়ই কবিতা লিখবার পক্ষে প্রতিকূল নয়।' তাঁর অসংখ্য কবিতায়, কাব্যগ্রন্থে, এমনকী 'গোটাদেশজোড়া জাউঘর'-সহ একাধিক সাম্প্রতিকতম কবিতা সংকলনে আমরা একথার সমর্থনও পেয়েছি। কিন্তু কৌতূহলবশত একটা কথা জানতে ইচ্ছে হয়, যে সময়ে কোনও কবিতা লেখা হচ্ছে, সে সময়ের প্রভাব কি কবি কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন? দেশে রাজনৈতিক টালমাটালের সময়ে একজন কবির পক্ষে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিখাদ প্রেমের কবিতা লেখা বা প্রকৃতিচর্চা কি সম্ভব? কবির ইচ্ছের ওপর সময়ের কি কোনও চাপ থাকে না? কোনও সময়ই কবিতা লেখার প্রতিকূল নয় বলে কি কবি যে-কোনও সময়েরই সারথি হয়ে উঠতে পারেন?

মিহির দত্ত
বিরাটি

বই-ঠক

নতুন বই
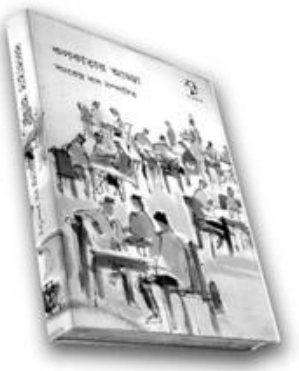
সমরেন্দ্র দাস সম্পাদিত 'কলকাতার আড্ডা'
এবং
লীনা চাকী সম্পাদিত 'বাঙালির আড্ডা'

আড্ডা নিয়ে বাঙালিরই কথা বলা সাজে। কেন না জিনিসটা তাদেরই মজ্জাগত। কিন্তু গত কয়েক দশকে আমরা বিশ্ব-অর্থনীতির খেলাঘরের বোড়ে, তাই খুব কেজো হয়ে গিয়েছি। এখন আড্ডার পরিসর কমে গিয়েছে, রয়েছে কেবল তার অকৃত্রিম স্মরণিকা। বাঙালি আড্ডার তেমনই দুটি—'স্মারক গ্রন্থ'ই বলব, হাতে এল। দুটিই একই প্রকাশকের ঘর থেকে বেরিয়েছে। আড্ডা নিয়ে মহান বাঙালি আড্ডাবাজদের যত লেখা যেখানে বেরিয়েছে, বই দুটির দুই সম্পাদক অসীম ধৈর্য এবং যত্নে সেসব খুঁজেপেতে জড়ো করেছেন। নতুন লেখাও রয়েছে বেশ কিছু। পড়তে পড়তে মন নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়, চোখ সজল হয়ে ওঠে।

সত্তর-আশির দশকে যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁরা বিলক্ষণ মানবেন, অন্য অনেক কিছুর মতো সে ছিল আড্ডারও স্বর্ণযুগ। সেই সময়ের অনেক গদ্যে-পদ্যে-সিনেমায়-সঙ্গীতে তার পদচিহ্ন থেকে গিয়েছে। আড্ডা তার বহিরঙ্গে অলস বিনোদনযাপনের বহুবর্ণ জামা চাপিয়ে ঘুরলেও, মেজাজটি ছিল সৃষ্টির নেপথ্যে মূল কারিগরের মতোই খাঁটি। এ প্রসঙ্গে কয়েকজনের কথা মনে পড়তে বাধ্য। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত তাঁর বিখ্যাত বই 'কলকাতার ফিরিওলার ডাক'-এর ভূমিকায় অননুকরণীয় ভঙ্গিতে লিখেছেন, কলকাতার এক গাড়িবারান্দার নীচে আড্ডায় মজে একসময়

কলেজ স্ট্রিট কফিহাউস এখন

সত্যজিতের শিসে বাখ শুনতে শুনতে কীভাবে ওপরের বারান্দা থেকে এক অপরিণত রসজ্ঞানহীন বালকের মূত্রত্যাগের লক্ষ্য হতে হয়েছিল তাঁদের।

আমাদের আলোচ্য বই দুটিতে সবমিলিয়ে রয়েছে পঞ্চাশটি নাতিদীর্ঘ রচনা। লিখেছেন নানা ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আমাদের পরিচিত মানুষেরা। কিন্তু পড়তে পড়তে পাঠকেরও মনে হবে, এর কোনও একটি বা অনেকগুলির খণ্ডাংশ জুড়ে একটি রচনা নিশ্চয়ই তাঁরও। তাঁরই মনের কথা।

'কলকাতার আড্ডা' বইটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন সমরেন্দ্র দাস। বইয়ের শুরুর রচনাটি বুদ্ধদেব বসুর, যতটা না স্মৃতিকথা তার থেকে ঢের বেশি আড্ডা নিয়ে অ্যাকাডেমিক চর্চা, সূচনা-লেখা হিসেবে মোক্ষম। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় দেখেছেন, 'মানসী' পত্রিকার অফিসের আড্ডা। আর আমরা এই বইয়ে তাঁর লেখায় পড়ছি, সেই রংচটা দেয়ালের ঘরে আড্ডা দিতে এসেছেন নাটোরের মহারাজা জগদানন্দ রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপুল চেহারার রাশভারি ঐতিহাসিক, মহারাজার সঙ্গে শখের কবির লড়াই লড়ছেন, এ যেন অবিশ্বাস্য! রণজিৎকুমার সেনের কলমে অধুনা বন্ধ হয়ে যাওয়া যুগান্তর পত্রিকা অফিসে সন্ধেবেলার আড্ডাও যেন জীবন্ত। বিশেষ করে যে অংশে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের কথা লিখছেন। যুগান্তর সাময়িকীতে সেসময় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল নলিনীকান্ত সরকারের লেখা দাদাঠাকুরের জীবনী। পরিমল গোস্বামীর টেবিলের সামনে বসে দাদাঠাকুর সে লেখার প্রুফ দেখে দেওয়ার জন্য প্রতি সপ্তাহেই আসতেন।

খবরের কাগজ আর পত্রিকা অফিসগুলিতে সন্ধেবেলা সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের উচ্চমার্গের আড্ডা বসত আর তার নিখুঁত কিছু বিবরণ আমরা আগেও সাগরময় ঘোষের লেখায় পেয়েছি। এই সংকলনে তাঁর এক বহুপঠিত লেখা 'হীরের নাকছাবি' স্থান পেয়েছে। বর্ষীয়ান প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে প্রকাশিতব্য 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে অনুজ বিমল মিত্রের অম্লান খুনসুটিও আরেকবার পড়তে ভালো লাগল।

এসব সংকলন-গ্রন্থে একটা বড় কালখণ্ড চোখের সামনে ধরা দেয়। 'কলকাতার আড্ডা'তেও সেই সূত্র ধরে লক্ষ করা যাবে, পুরনো প্রজন্মের সাংস্কৃতিক চরিত্ররা পরবর্তী প্রজন্মের হাতে যেমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার অর্পণ করে যাচ্ছেন, তেমনই তুলে দিয়ে যাচ্ছেন আড্ডার ব্যাটনটাও। কলকাতাতে একে একে আড্ডার ঠেক তৈরি হচ্ছে। শহরের উত্তরে-মধ্যে-পূর্বে খুলে যাচ্ছে কফিহাউসের উদার দরওয়াজা। সেসব ছাড়াও শহরের এখানে সেখানে স্যাঙ্গুভ্যালি, বসন্ত কেবিন, ফেবারিট কেবিন, যোজনগন্ধা, শেলি কাফে নামে খুলছে ছোট-বড় খাঁটি বাঙালি রেস্তোরাঁ। সেখানে তো বটেই, আড্ডা ছড়িয়ে পড়ছে খালাসিটোলার মতো প্রায়ান্ধকার দেশি পানশালায়। আড্ডায় আড্ডাস্থলের একটা বড় ভূমিকা আছে। প্রাচীন গ্রিসে নাকি পণ্ডিতরা আড্ডা দিতেন বারবণিতাপল্লিতে, কারণ সন্ধের পর তাঁরা সবাই সেখানেই জড়ো হতেন। কলকাতায় স্বাভাবিকভাবেই সে সুযোগ প্রকাশ্যে অন্তত ছিল না।

এরই মধ্যে একটা তীব্র নড়াচড়া চোখে পড়ছে সর্বত্র। রাজনীতিতে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সিনেমায়। 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পাচ্ছে। কিন্তু সে ছবি নিয়ে সাধারণ দর্শকের মধ্যে তেমন উৎসাহ নেই। উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কের সামনে ফণিবাবুর চায়ের দোকানে বসে 'পথের পাঁচালী' দেখে রীতিমতো উদ্দীপ্ত কিছু যুবক ঠিক করলেন এ ছবি যাতে সবাই দেখে তার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করতেই হবে। ১৯৫৫ সালে বাংলাছবির প্রচার বলতে বেশি কী আর ছিল! অতএব সেই যুবকরা সারারাত ধরে লাল আলতা দিয়ে পোস্টার লিখলেন 'পথের পাঁচালী দেখুন। পথের পাঁচালী দেখা আমাদের কর্তব্য', আর প্ল্যাকার্ডে তা সেঁটে পরদিন সকালে মিছিল বেরোল। সেই যুবকদের একজন, আজকের বর্ষীয়ান পরিচালক তরুণ মজুমদার লিখছেন, 'মিছিল ফড়িয়াপুকুর হয়ে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে পড়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল। দু-পাশের লোক অবাক হয়ে দেখছে আমাদের।...হঠাৎ শিকদার বাগানের মোড়ে দাঁড়ানো দু-তিন জন লোক আপনা থেকেই এসে আমাদের সঙ্গে জুটে গেল। তারাও, আমাদেরই মতো, হয়তো আগের দিনই 'পথের পাঁচালী' দেখে থাকবে।...'

কফিহাউসের আড্ডা নিয়ে বইটিতে চমৎকার একটি রচনা রয়েছে রণজিৎ দাশের। একটু অংশ তুলে দিই: সে সময় কফি হাউসের হলঘর জুড়ে সন্ধেবেলার— বিশেষত শনিবার সন্ধেবেলার— জমায়েতে দু'একটি টেবিলে বসতেন নকশালপন্থী কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা; শক্তিদা-শরৎদার মতো সিনিয়র কৃত্তিবাসী কবিদের একটি টেবিল ছিল; গদ্যকারেরা বসতেন অন্তত দুটি টেবিল জুড়ে; সিপিআই এবং 'পরিচয়' গ্রুপের লেখক-কবিদের একটি টেবিল ছিল; হাংরি জেনারেশনের লেখকদের ছিল একটি টেবিল।...শনিবার সন্ধ্যায় বাংলা সাহিত্যের কবি-লেখকদের একটা বড় অংশকে পাওয়া যেত কফি-হাউসে।'

আড্ডার প্রসঙ্গে কমলকুমার মজুমদারের কথা ঘুরেফিরে এসেছে অনেকবার। হাংরি জেনারেশনের লেখক দেবী রায়ের লেখায় খালাসিটোলায় সপারিষদ কমলকুমারের বর্ণনা নাট্যদৃশ্যের মতোই মনোরম। অভিনেতা রবি ঘোষের লেখাটিতেও মূল চরিত্র তিনি।

তবে আড্ডা যে কেবল কবি-লেখক কিংবা নির্দিষ্ট কিছু পেশার একচেটিয়া সম্পত্তি, তা তো নয়। সেজন্যই আকাশবাণীর অন্দরের খোঁজখবর আমরা পেয়ে যাই কবিতা সিংহের লেখার সূত্রে। কলকাতা ময়দানের খেলোয়াড়ি আড্ডা থেকে

শুরু করে চিত্রসাংবাদিকের আড্ডা পর্যন্ত বহুবিধ আড্ডায় আমাদের গতায়াত হয়ে যায় এই সংকলনের সৌজন্যে।

আলোচ্য দ্বিতীয় বইটির নাম 'বাঙালির আড্ডা'। এটিও একটি সংকলন, সম্পাদনা করেছেন লীনা চাকী। এই বইয়ের প্রথম লেখাটি শ্রদ্ধেয় প্রাবন্ধিক শিবনারায়ণ রায়ের। লেখাটি শুধু এই বইয়ের নয়, বাংলাভাষায় স্মৃতিচারণধর্মী লেখার ভাণ্ডারেও একটি সম্পদ। রচনাটির শিরোনাম 'পঞ্চাশের দশকে পাইকপাড়ার আড্ডা'। অপার বন্ধুবৎসলতার যে কাহিনি অনবদ্য মুনশিয়ানায় তিনি শুনিয়েছেন, তা আজকের যুগে বিরল, উপন্যাসের চেয়েও মধুময়। সাংবাদিক-সম্পাদক গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে যৌথভাবে পাইকপাড়ায় একটি ফ্ল্যাট কেনা থেকে এ কাহিনির শুরু। তারপর প্রায় কমিউন গোছের বসবাস, জীবন ও বৈঠকখানা প্রায় একাঙ্গী হয়ে যাওয়া, তৎকালীন উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলে তাঁর প্রথিতযশা পড়শি যথা, গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সঙ্গীতজ্ঞ রাজ্যেশ্বর মিত্র, সাহিত্যিক বিমল কর প্রমুখের অনন্ত আড্ডার বিবরণী আমাদের মোহাবিষ্ট করে। দোলের দিন টালা পার্কের আরেক বিখ্যাত বাসিন্দা, সত্যজিৎ রায়ের এককালীন গুরু অন্নদা মুন্সীর খোল গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়া এবং তাঁর নেতৃত্বে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস ও তারাশঙ্করের বাড়িতে চড়াও হওয়ার কাহিনিও কম রমণীয় নয়। প্রত্যেক বাঙালির পড়া উচিত এই লেখাটি। কফিহাউসের আড্ডার আরম্ভ নিয়ে একটি লেখা রয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। কমলকুমারের প্রভাবে আড্ডা একসময় খালাসিটোলায় কিছুদিন স্থায়ী হয়ে চলে এল ডি কে গুপ্তর সিগনেট প্রেসে। সেখান থেকে শুধু আড্ডার জন্য 'বুধসন্ধ্যা' নামে এক ক্লাব খুলে ফেলা। আড্ডার বিচিত্রগতি বোধহয় একেই বলে।

কফিহাউসের প্রসঙ্গক্রমে এসেছে পূর্ববঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলির কথা, শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের কলমে। একটু তুলে না দিলে মেজাজটা বোঝা যাবে না ঠিক: 'তারপর কফিহাউস ক্রমে ক্রমে মুক্তিযুদ্ধের শিবির হয়ে উঠল। ওপার থেকে একে একে অনেক ছেলে এসে পৌঁছল। বন্ধু ইসমাইল মোহাম্মদ, কবি সিকান্দার আবু জাফর, আল মাহমুদ, আহমদ ছফা, বেলাল তো ছিল অনেকদিন থেকেই। বরং এইসময় সে চট্টগ্রামে ফিরে গেল। কফিহাউস থেকে আমরা সংগ্রহ শুরু করলাম ওপারে পাঠাবার জন্য আহতদের চিকিৎসার ওষুধ ও যন্ত্রপাতি। গোপনে বোমা, বন্দুক পর্যন্ত সংগ্রহ করতাম ওখানে পাঠাবার জন্য।'

আবার উত্তর কলকাতার ফড়িয়াপুকুরে নগেন্দ্র কেবিন নামে এক রেস্তোরাঁর আড্ডায় জড়ো হওয়া তৎকালীন দুই প্রতিযোগী দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের মধ্যে অম্লকষায় সম্পর্কের বিবরণী লিখেছেন চণ্ডী লাহিড়ী। যদিও দুটি বইয়ের মধ্যে তিনিই একমাত্র লেখক যিনি প্রচুর আড্ডায় হাজিরা দিয়েও, শেষে স্পষ্ট করেছেন, তিনি আড্ডার ঘোরতর বিরোধী। তাঁর কথায়, 'আড্ডা হল জমিদারি প্রথার হ্যাংওভার। উঠে যাওয়াই ভালো'।

কফিহাউসে আড্ডার সংলাপ ঠিক কেমন হত? বিশেষ করে কৃত্তিবাসের কবিদের আড্ডায়? শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রাঞ্জল লেখা যুক্ত হয়েছে 'বাঙালির আড্ডা' বইটিতে। সেখানে শরৎকুমার একটি উদাহরণ দিয়েছেন: ...এমন সময় দীপক ঢুকল। মৃদু পায়ে আমাদের কাছে এসে বসল। একটু থেমে, একটা চারমিনার ধরিয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমরা কি জানো?' কী? 'বুদ্ধদেব বসু ঈশ্বরে বিশ্বাস করছেন আজকাল।' ওর আশা ছিল এই কথা শুনে আমরা আকাশ থেকে পড়ব। আমাদের মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না দেখে ও বলল, 'উনি আজ আমার কাছে কবুল করলেন।'

বইটিতে কেবল বিখ্যাত ব্যক্তিদের আড্ডার স্মৃতিচারণ ছাপা হয়েছে এমন ভাবলে ভুল হবে। বেশ কিছু লেখা আছে যা রীতিমতো গবেষণাধর্মী। গ্রামীণ মহিলাদের আড্ডা নিয়ে তুলিকা মজুমদারের লেখাটি কিংবা জ্যোতির্ময় দাশের 'আড্ডার সাংকেতিক শব্দাবলি' ভিন্নধর্মী এমনই কিছু উপভোগ্য লেখা।

আড্ডা ভেঙে গিয়েছে। আড্ডাবাজরাও যে যার মতো চলে গিয়েছেন। এখন আড্ডার জন্য মুখোমুখি দেখা হওয়ারও প্রয়োজন তেমন নেই। কারণ সেলফোন নামে এক বস্তু আছে, আছে ইন্টারনেট চ্যাট নামে ভার্চুয়াল বন্ধুত্বের অলীক জগৎ। কলকাতার মানচিত্র থেকে পুরনো আড্ডার ঠেকগুলিও তাই ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে।

ফি রে প ড়া ব ই

গোপালচন্দ্র রায়ের 'শরৎচন্দ্রের বৈঠকি গল্প'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গল্প শুধু লিখতেনই না বলতেনও চমৎকার। মোহিতলাল মজুমদারের কথায়, '...শরৎচন্দ্রের গল্প সকলে পড়িয়াছেন ও মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহার অনুপ্রেরণা আর এক ধরনের, তাহাতে ভাবের সংক্রামতা আরও অব্যর্থ।' মোহিতলাল শরৎচন্দ্রের গল্প বলার ভঙ্গিটিরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

কর্মসূত্রে শরৎচন্দ্র থেকেছেন নানা জায়গায়। কখনও বিহারে, কখনও বার্মা মুলুকে, বাংলায় তো বটেই। সব জায়গাতেই গ্রাম-শহরের নিম্নবিত্ত প্রান্তিক পরিবারগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল। তার ওপর একসময়ে রীতিমতো মন দিয়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করেছেন। ফলে খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁদের জীবনাচরণ। বিভিন্ন আড্ডায় তাঁর বলা এই গল্পগুলিকে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করতেন। অবশ্য আড্ডার মেজাজ-মর্জি বুঝে চরিত্রদের কিঞ্চিৎ বদলিয়ে নিতেন। কিন্তু তা

সত্ত্বেও, এ বই কেবল মুখে বলা গল্পের বই নয়, এ থেকে শরৎ-সাহিত্যের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের খোঁজও পাচ্ছি আমরা।

এ বইয়ের লেখক গোপালচন্দ্র রায় দীর্ঘকাল শরৎচর্চায় নিমগ্ন। নরেন্দ্র দেব, বনফুল, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতো শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিকদের পাশাপাশি বহু কষ্টে হাওড়া-মেদিনীপুর-বালিগঞ্জ-রেঙ্গুন ঢুঁড়ে শরৎচন্দ্রের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন এইসব গল্প। আরও অনেক অজানা কথা জানতে পারছি তাঁর এই মূল্যবান কাজ থেকে। অধুনালুপ্ত 'পুষ্পপাত্র' পত্রিকায় নরেন্দ্রনাথ বসু শরৎচন্দ্রের মুখে শোনা একটি গল্পের ওপর ভিত্তি করেই লিখেছিলেন 'মৃত্যুর পর' নামে একটি গল্প। খোদ শরৎচন্দ্র সেই গল্প ঠিকঠাক করে দিয়েছিলেন।

এই বইয়ের গল্পগুলি পড়ে পাঠকের হয়তো মনে হবে, শরৎচন্দ্র কেন কখনও রম্যরচনা লেখেননি। কারণ তাঁর বলা হাসির গল্পও বাহুল্যবর্জিত, ঋজু আর নিটোল।

সাগরময় ঘোষের
'সম্পাদকের বৈঠকে'

সাগরময় ঘোষ খ্যাতনামা সম্পাদক। তাঁর এ বইটি এক আড্ডা-আখ্যান ঠিকই, কিন্তু তারও চেয়ে বেশি, প্রখ্যাত সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বর্ণন। লেখা আদায় করতে গিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিড়ম্বনায় পড়ার কাহিনিও যুগপৎ বিস্ময় আর মজার উদ্রেক করে। আড্ডার স্রোত ধরে আরও বহু বিষয় উঠে এসেছে। যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুখাদ্যের প্রতি আকর্ষণের গল্প, পেশায় ডাক্তার বনফুলের অলৌকিক ঘটনার প্রতি বিশ্বাসের কাহিনি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতিতে ভাগ বসাতে এক 'নকল' শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব— এরকম নানা অশ্রুতপূর্ব ঘটনার আকর এই বই। প্রথমবারের মতোই ভালোলাগা ফিরে পড়তেও।

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

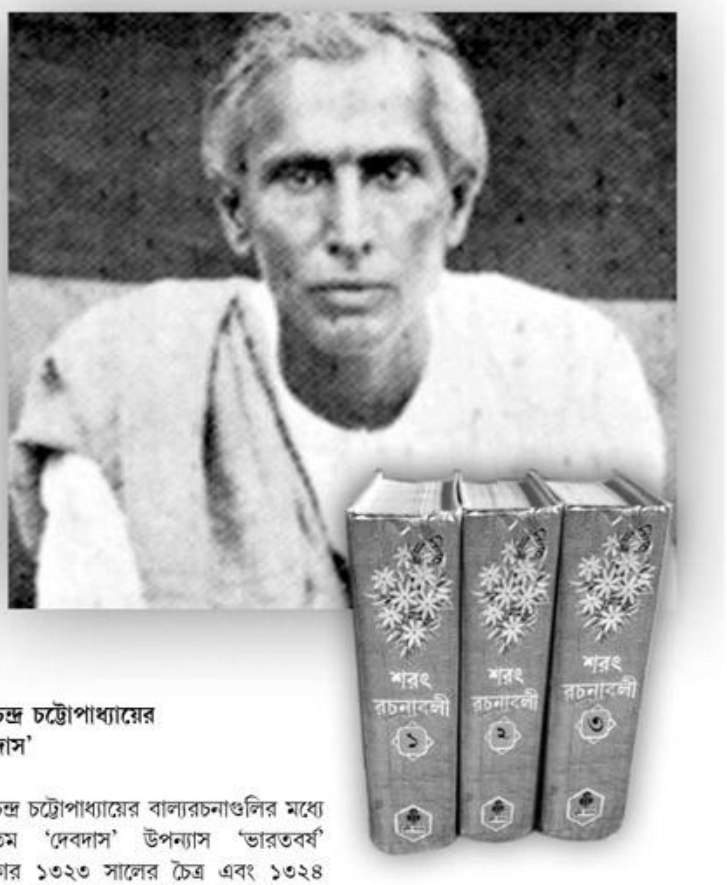

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
'দেবদাস'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাল্যরচনাগুলির মধ্যে অন্যতম 'দেবদাস' উপন্যাস 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩২৩ সালের চৈত্র এবং ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সাম্প্রতিককালে হিন্দি-চলচ্চিত্রে নাট্যায়িত 'দেবদাস' ঔপন্যাসিকের জনপ্রিয়তম উপন্যাস।

তালসোনাপুর গ্রাম। পাঠশালায় পাঠরত নারায়ণ মুখুজ্যের পুত্র বালক দেবদাস এবং নীলকণ্ঠ চক্রবর্তীর কন্যা বালিকা পার্বতী। দিনের পর দিন কেটে যায়— এদুটি বালক-বালিকার আনন্দের-আমোদের সীমা নেই। সমস্ত দিন ধরে রোদে রোদে ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যার সময় ফিরে মারধর খায়, সকালে পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে ছুটে কোথাও পালিয়ে যায়। দেবদাস তাই একটা 'মুখ্যচাষা'ই রয়ে গেল, জননীর এই আক্ষেপে দেবদাসের পিতা তাকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়। দেবদাস চলে গেলে পার্বতীও স্বেচ্ছাতেই ভর্তি হল পাঠশালায়। অনেকদিন পর দেবদাস কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে এল। পার্বতী তার ভালোবাসার দেবদাকে দেখতে ছুটে এল, কিন্তু কিছুই বলতে পারল না দেবদাদাকে। এদিকে, তেরোবছর বয়স্কা, শারীরিক সৌন্দর্যপূর্ণা পার্বতীর বিবাহে উদ্যোগী হলেন তার পিতামাতা। পার্বতীর জননীর ইচ্ছা ছিল দেবদাসের সঙ্গেই তার মেয়ের বিয়েটা হোক— সেই সূত্রেই পার্বতীর পিতামহী পার্বতী-দেবদাসের বিবাহপ্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন দেবদাসের জননীর কাছে। কিন্তু তিনি তীব্র আপত্তি জানালেন। বংশমর্যাদা, কুটুম্ব-প্রতিবেশী— এ সমস্ত কিছুই দাঁড়াল বাধা হয়ে। চূড়ান্ত অসম্মতি জানালেন দেবদাসের পিতাও। পার্বতীর পিতা এসব শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং সুন্দরী মেয়েকে পাত্রস্থ করতে তিনি নিজেই উদ্যোগী হলেন।— স্থির করে এলেন প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ক্রোশ দূরে বর্ধমান জেলার হাতিপোতা গ্রামের জমিদার পাত্র, বিপত্নীক-সপুত্র ভুবন চৌধুরীকে। পারুর সঙ্গে বিবাহ-প্রস্তাবের কথা দেবদাসও শুনল তবে পিতামাতার অসম্মতি জেনে সে আর কিছু বলল না। এদিকে, পার্বতীর পিতৃস্থিরীকৃত বিবাহে মত নেই, কেননা সে দেবদাকে ভালোবাসে।— তাই একদিন রাত একটার সময় সে দেবদার কাছে আসে গোপনে— শুধু দেবদার পায়ের কাছেই একটু স্থান চায় সে। কিন্তু এই সংবাদ গোপন থাকল না দেবদাসের

পিতামাতার কাছে। পিতামাতার অনড় সিদ্ধান্তের কাছে পরাজিত হয়ে, পার্বতীর কাছ থেকে দূরে সরে থাকবার জন্যই দেবদাস আবার পাড়ি দিল কলকাতায়। এরপর সে চিঠিতে জানিয়েও দিল পিতামাতার এই বিবাহে অমতের কথা এবং পার্বতীকে অন্তর থেকে তার না ভালোবাসার কথা। তবে পত্রপ্রেরণের পর থেকেই দেবদাসের অন্যরকম মনে হতে লাগল।— কলকাতায় থেকে থেকে লোকদেখানো কুলমর্যাদা তার কাছে অত্যন্ত অনর্থক মনে হল। সে গ্রামে ফিরে এল পার্বতীর কাছে তার নিজের পিতামাতাকে রাজি করানোর প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু পরিণত পার্বতী স্পষ্টতই জানিয়ে দিল— "তোমার মা-বাপ আছেন, আমার নেই? তাদের মতামতের প্রয়োজন নেই?" যাই হোক, পার্বতী চলে গেল স্বামীর ঘরে, আর সেই রাত্রিটি দেবদাসের কাটল ইডেন গার্ডেনের একটি বেঞ্চের ওপর। তারপর এসে উঠল কলকাতার মেসে বন্ধু চুণিলালের কাছে। চুণিলালের মাধ্যমে তার পরিচয় হল বাইজি চন্দ্রমুখীর সঙ্গে। প্রথমদিন সেখানে ভালো লাগল না দেবদাসের, কিন্তু দেবদাসকে ভালো লাগল চন্দ্রমুখীর, তাকে আবার আনার কথা জানাল চুণিলালকে। এদিকে, পার্বতীর স্বামীর বড় ঘর— তার অনেক ছেলেমেয়ে— তাই পার্বতীর নারীত্বের উত্তরণ ঘটল মাতৃত্বে— সন্তানদের খুব প্রিয় সে, সংসারের চেহারারও পরিবর্তন ঘটল তার হাতে। কিন্তু এদিকে দেবদাস যেন সর্বস্ব খুইয়ে দিশেহারা— পাগলেরই মতো। মদ খাওয়াও ধরেছে; চন্দ্রমুখীর কাছে তো যায়-ই। এরই মধ্যে দেবদাসের পিতার মৃত্যু হল— দেবদাস এল, তার পরামর্শমতোই সম্পত্তি ভাগ হল। পার্বতীও এল, সে জানল— দেবদার এই অস্বাভাবিক আচরণের কথা জমিদারবাড়ির চাকর ধর্মদাসের কাছ থেকে। তাই দেবদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল সে, দেবদা তাকে মেয়ে দেখার কথা বলল, কিন্তু দেবদা এটুকু মুখ ফুটে বলতে পারল না যে 'পার্বতী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকে তার প্রবৃত্তি হবে না'। এইভাবে পিতৃবিয়োগের পর ছমাস বাড়িতে থেকে থেকে সে পার্বতীর চিন্তায় উন্মত্তবৎ হয়ে উঠল— সুখ নেই, শান্তি নেই। মায়ের কথামতো মাকে কাশীতে রেখে সে তাই চলে এল আবার কলকাতায় চন্দ্রমুখীরই কাছে। কিন্তু চন্দ্রমুখী আজ জানে পার্বতীর কথা— পার্বতী-দেবদাসের ভালোবাসার কথা।— সে আজ ওকালতি করল পার্বতীরই হয়ে, দেবদাসের প্রতি নিজের গভীর অনুরক্তিকে অস্বীকার করে। পার্বতীর কথা উঠতেই দেবদাস আর সেখানে থাকতে পারল না। অন্যদিকে, সংসারী পার্বতী খুবই ব্যস্ত— বড় ছেলে মহেন্দ্রর বিয়ে দিয়ে সে এখন কিছুটা নিশ্চিন্তও বটে। কিন্তু তার নতুন পুত্রবধূ সংসারের প্রভূত অর্থব্যয়ের অপবাদ দিলে, পার্বতী সংসারের দায় থেকে নিরস্ত হলেও ভাবনা তার বেড়েছে অনেক। এরই মধ্যে, পাবর্তী তার বাল্যসখী মনোরমার পত্রে জানতে পেরেছে, তার দেবদার অস্বাভাবিক পরিণতির কথা। তাই সে সরাসরি চলে এসেছে তালসোনাপুর গ্রামেই। কিন্তু পায়নি তার দেবদাকে। এদিকে, চন্দ্রমুখী অশ্বত্থঝুরি গ্রামে ঘর বেঁধেছে দেবদাসের অর্থানুগ্রহেই গরিব-দুঃস্থদের সেবা করার জন্য। কিন্তু অনেকদিন দেবদাসের কোনও সংবাদ না পাওয়ায় সে চলে এসেছে দেবদাসের গ্রামে এবং সেখানে দেবদাসকে না পেয়ে এসেছে কলকাতায়। এখানে আসার দেড়মাস পর হঠাৎই এক রাত্রিতে দেখতে পায় পথের ধারে একটা ঘরের সামনে একটা লোক আপনার মনে কী বলছে! বুঝতে পারল লোকটা দেবদাসই। সে খুবই অসুস্থ— মদ্যপান করে করে পেটে ব্যথা অনুভব করছে সে। এইভাবে দুই মাস পরে একটু আরোগ্যলাভের পর ডাক্তারের পরামর্শমতো, হাওয়া পরিবর্তনের জন্য ভৃত্য ধর্মদাসকে নিয়ে দেবদাস যায় পশ্চিমে— এলাহাবাদে। কিন্তু এখানে এসেও সে আবার অনিয়ম শুরু করে। মায়ের কাছে তাই যেতে বলে তাকে ধর্মদাস— কিন্তু মাকে তার এই পোড়ামুখ দেখাতে চায় না দেবদাস। তাই ধর্মদাসকে নিয়ে সে এবার যায় বোম্বাই শহরে। সেখানে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে।— সমস্ত পেট প্লিহা-লিভারে পূর্ণ, এর ওপর জ্বর ও কাশি। বাড়ি ফিরতে চায় দেবদাস। কিন্তু বাড়ি ফেরার নাম করে ট্রেনে উঠে নিদ্রিত ধর্মদাসকে ফেলে রেখে অসুস্থ শরীরে নেমে যায় পান্ডুয়া স্টেশনে। স্থির করে হাতিপোতায় যাবে পার্বতীর কাছে। গরুর গাড়ি অনেক ক্রোশ পথ অতিক্রম করে যখন পৌঁছল হাতিপোতায় তখন দেবদাস মৃতপ্রায়— নিরুত্তর। গাছতলায় নামিয়ে রাখল গাড়োয়ান তাকে। তারপর আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল দেবদাস। পাড়াগাঁয়ের লোক স্পর্শ করতে চাইল না মৃতদেহ—শুষ্ক-পুষ্করিণীতে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলে দেওয়া হল দেহটিকে। পরে পার্বতী মৃতলোকটি তারই ভালোবাসার দেবদা জানতে পেরে পাগলের মতো ছুটে গেল— দাস-দাসীরা কিছুক্ষণ পর পার্বতীর মূর্ছিত দেহ ধরাধরি করে নিয়ে এল।— এক করুণ ট্র্যাজেডিতে সমাপ্ত হল 'দেবদাস'-এর গল্পকাহিনি।

• • •

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অরক্ষণীয়া'

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসটি ১৩২৩ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই বছরেই কার্তিক মাসে, ইংরিজি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গোলোকনাথের ছোটভাই দীননাথ ও দুর্গামণির বারো-তেরো বছরের কন্যা শ্যামবর্ণা

চলচ্চিত্রে দেবদাস। মুক্তি: ১৯৫৫

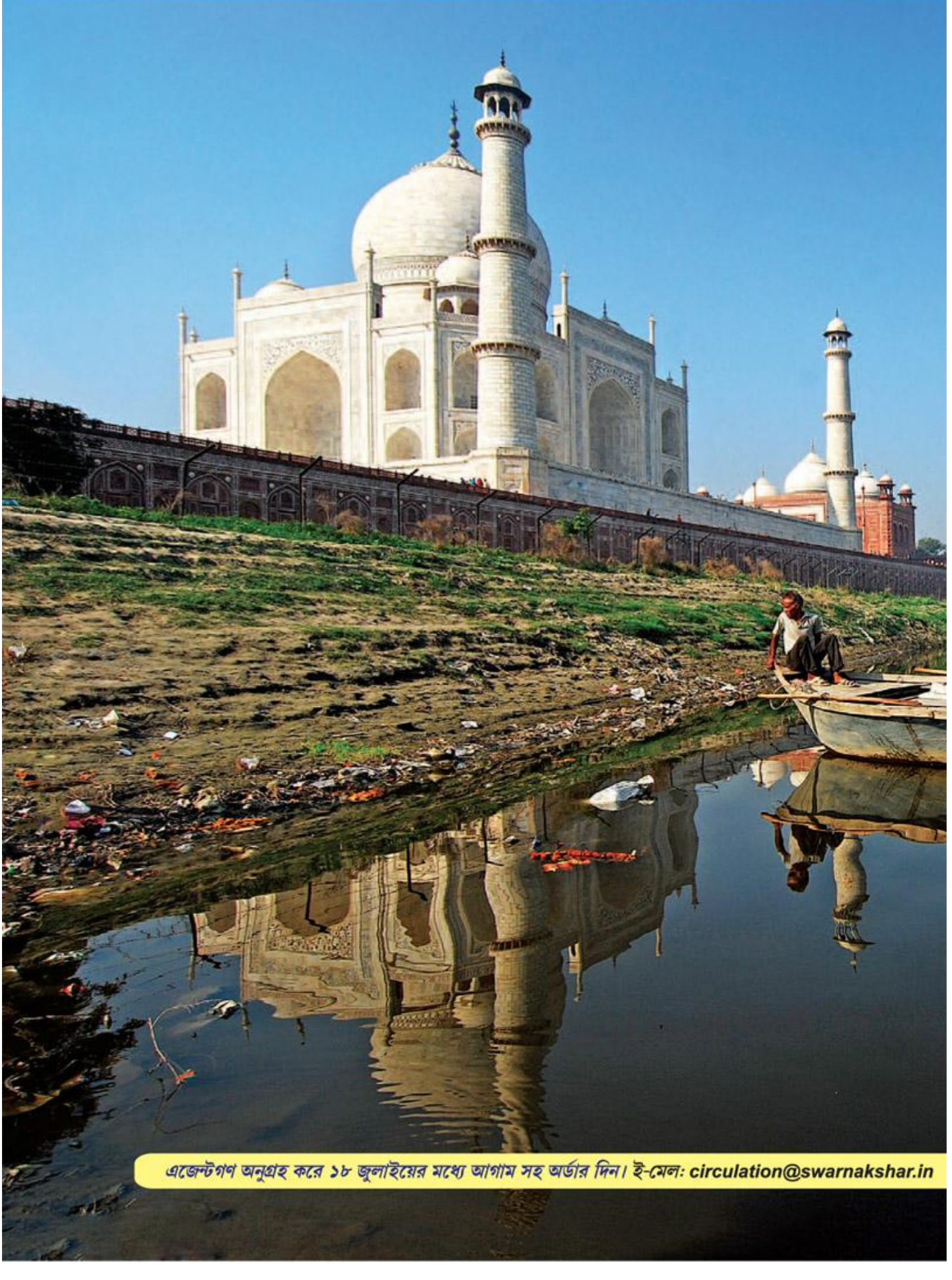

এজেন্টগণ অনুগ্রহ করে ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে আগাম সহ অর্ডার দিন। ই-মেলঃ circulation@swarnakshar.in

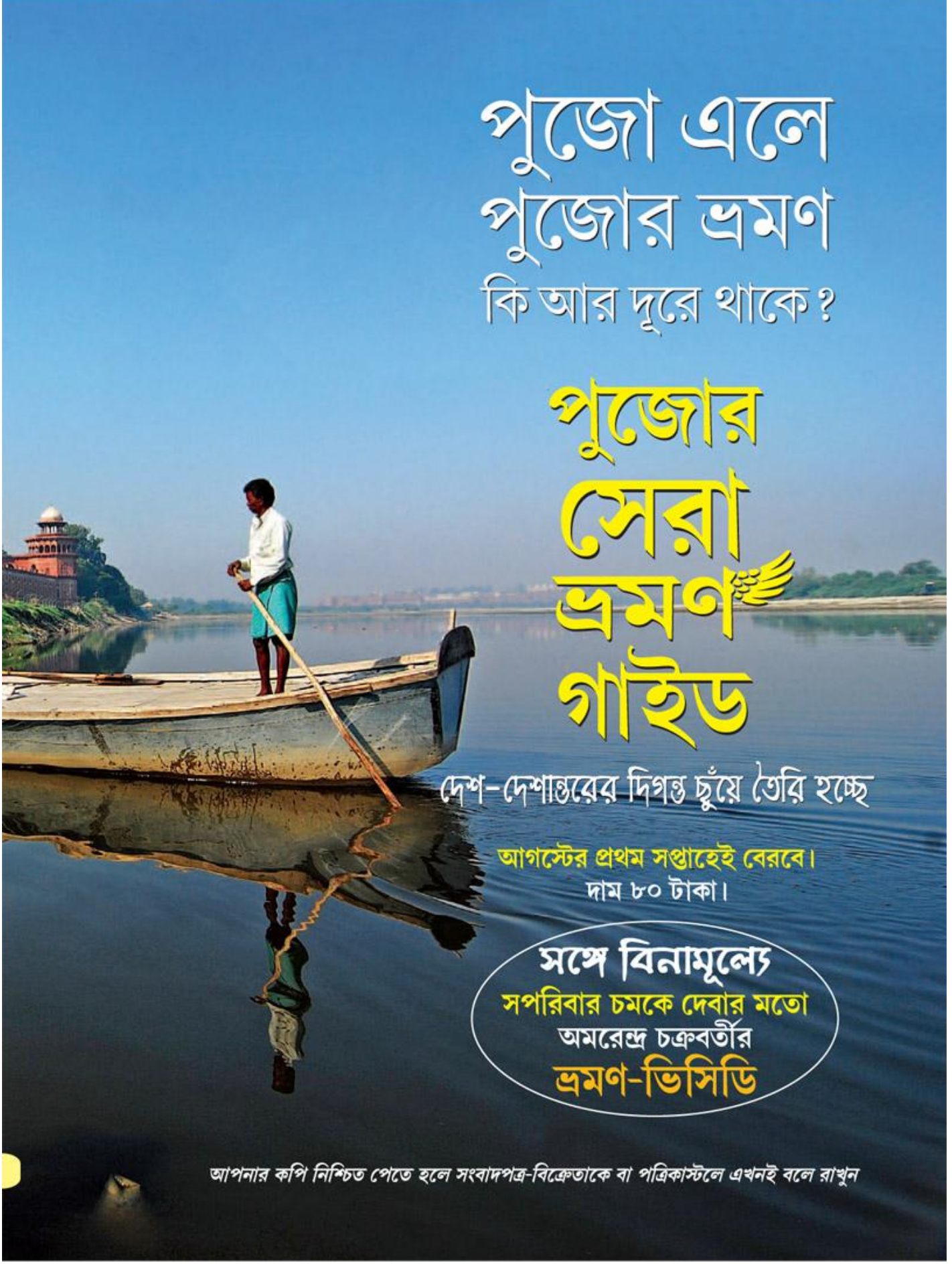

পুজো এলে
পুজোর ভ্রমণ
কি আর দূরে থাকে?
পুজোর
সেরা
ভ্রমণ
গাইড
দেশ-দেশান্তরের দিগন্ত ছুঁয়ে তৈরি হচ্ছে
আগস্টের প্রথম সপ্তাহেই বেরবে।
দাম ৮০ টাকা।
সঙ্গে বিনামূল্যে
সপরিবার চমকে দেবার মতো
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ভ্রমণ-ভিসিডি
আপনার কপি নিশ্চিত পেতে হলে সংবাদপত্র-বিক্রেতাকে বা পত্রিকাস্টলে এখনই বলে রাখুন

জ্ঞানদাকে নিয়েই 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসের কাহিনির বিস্তার। বড়ভাই গোলোকনাথ পূর্বেই মারা গিয়েছেন; কিন্তু তাঁর বিধবা স্ত্রী স্বর্ণমঞ্জরী আছেন— আছেন ছোটভাই অনাথনাথ— কিন্তু দীননাথ ছোটভাই অনাথের সঙ্গে বিবাদে জড়িত থাকার ফলে দীননাথের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী-কন্যার দায়ভার নিতে অনাথের মৌখিক আপত্তি না থাকলেও জ্ঞানদার বিবাহের দায় তিনি সম্পূর্ণতই এড়াতে চেয়েছিলেন। এদিকে, স্বর্ণমঞ্জরীর বোনের ছেলে, অতুলের, জ্ঞানদাদের সংসারে অবাধ যাতায়াত ছিল। দুর্গামণিও অতুলের মাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। স্বামী, দীননাথের মৃত্যুর পর দুর্গামণির একমাত্র সহায় ছিল এই অতুল— তাঁর মনের সকল যন্ত্রণার কথা অতুলকেই তিনি বলতেন। বলতেন— কন্যাসন্তানকে গর্ভে ধারণ করার মতো 'মৃত্যুযন্ত্রণার' কথা— 'আর-জন্মে কত স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণহত্যা করেছিলুম অতুল যে, এজন্মে মেয়ে পেটে ধরেচি।' এই অতুলই জ্ঞানদার পিতা, মৃত্যুপথযাত্রী দীননাথের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল— 'আপনি নিশ্চিন্ত হোন— আজ থেকে জ্ঞানদার ভার আমি নিলুম।' এই কথা শুনে দুর্গামণিও তখন আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু, দীননাথের মৃত্যুর পর সংসারটা খানিকটা পরিবর্তিত হয়েছে— সংসারের সব দায়ই প্রায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বিধবা দুর্গামণির ওপর— তার ওপর সাংসারিক নানা গঞ্জনায়, লাঞ্ছনায় বিপর্যস্ত দুর্গামণিকে শেষপর্যন্ত উঠতে হয়েছে বাপের বাড়িতে, ভাই শম্ভুর কাছে— হরিপালে। অতুলের আপত্তি ছিল এতে— কেননা, জায়গাটা ছিল 'ম্যালেরিয়ার ডিপো'। যাই হোক, দুর্গামণিভ্রাতা শম্ভুর অভিভাবকত্বে ও তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ভামিনীর দেখভালে তাঁদের দিনগুলি একপ্রকার কেটে যাচ্ছিল। মামা শম্ভুর যথার্থ অভিভাবকত্ব সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছিল ভাগনি জ্ঞানদার বিবাহ-ব্যাপারে— তার এপক্ষের বিপত্নীক শ্যালকের সঙ্গে। কিন্তু, জ্ঞানদার ভার পূর্ব হতেই অর্পিত ছিল অতুলের ওপর— তাই বুদ্ধিমতী দুর্গামণি এই বিবাহে প্রথম থেকেই নারাজ ছিলেন। এদিকে, হরিপালে আসার পর অতুলের একটিমাত্র চিঠি ছাড়া আর চিঠি না পাওয়ায় দুর্গামণি সদাশঙ্কিত, চিন্তিতও বটে। তবুও দুর্গামণির মনে একবারের জন্যও উদয় হল না যে, অতুলের মনের গতির পরিবর্তন হতে পারে। যাই হোক, হরিপালে এসে জ্ঞানদা আবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হল। তার অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু জ্ঞানদার মামি, ভামিনী তাকে পাচন করে সুস্থ করতে চাইলে এর পিছনে জ্ঞানদার সঙ্গে তার ভাইয়ের সম্বন্ধ করবার ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন থাকার সন্দেহে— 'পোড়াকাঠ', 'তাড়কা' বউদির হাত থেকে দুর্গামণি মুক্ত রাখতে চাইছিলেন নিজেদেরকে। কিন্তু, শেষপর্যন্ত দেখা গেল, ভামিনীরই আস্ফালনে দুর্গামণি এই বিবাহদায় থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এলেন শ্বশুরবাড়িতে। রোগগ্রস্ত জ্ঞানদার 'পাণ্ডুর' মুখ দেখে জ্যাঠাইমা, স্বর্ণমঞ্জরী 'বাঁশবনের পেত্নী' বললেও সন্তানজননী ছোটবউয়ের অসুস্থ জ্ঞানদার প্রতি করুণার উদয় হল। কিন্তু, অতুলও এল না একবার, এলেন না তার মা-ও। এদিকে বাড়িতে আসার সময়ই জ্বর এসেছিল দুর্গার; প্রতিদিনই জ্বর আসত জ্ঞানদারও, কিন্তু মায়ের অসুস্থতাহেতু তার দৈহিক যন্ত্রণার কথা ভেবে জ্যাঠাইমার আক্রোশ সে মুখ বুজে সহ্য করত। অসুস্থ দুর্গামণি নিজের শারীরিক অক্ষমতায়, সংসারের সহস্র জ্বালায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন মেয়ের প্রতি ব্যবহারে। এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ বাড়িতে অতুলের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে মেয়ের বারণকে অগ্রাহ্য করে কথা না-রাখার জন্য অতুলকে তিরস্কৃত করলে, অতুল সেকথা অস্বীকার করে বড়বউ ও ছোটবউয়ের সামনে চূড়ান্ত অপমান করে দুর্গামণিকে। আসলে, ব্যাপারটা হল— অনাথেরই বড় মেয়ে মাধুরীর সঙ্গে অতুলের বিবাহ স্থিরীকৃত হয়েছে। মাধুরী বাল্যকাল থেকেই মামাবাড়িতে থাকে, এখন বিবাহসূত্রে এই বাড়িতে এলে আরেক নতুন জটিলতার সৃষ্টি হল সংসারে, কেননা মাধুরী অতিশয় সুশ্রী। মাধুরীর এই মাধুর্য মা দুর্গামণির কাছেও জ্ঞানদাকে আরও কুশ্রী করে তুলল। ঠিকও করা হল— যে করে হোক, সত্বর বিবাহ দিয়ে জ্ঞানদাকে এ বাড়ি থেকে বিদায় করা হবে। কিন্তু, রোগজীর্ণ জ্ঞানদাকে পাত্রপক্ষের পছন্দ হল না। এবার অনাথের নিজেরই প্রয়োজনে এবং স্বর্গযাত্রায় দুর্গামণির একটু আগুন পাওয়ার লোভে জ্ঞানদাকে এক অতিশয় বৃদ্ধের হাতে সঁপে দিতে কেউই কুণ্ঠিত হল না। তবে, সেখানে জ্ঞানদার অদ্ভুত সাজসজ্জা পাত্র ও পাত্রপক্ষের হাস্যোদ্রেকের কারণ হল, স্বভাবতই পছন্দ হল না তাদের জ্ঞানদাকে। মুমূর্ষু দুর্গামণি এই দুঃখ সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করলেন অচিরেই। দুর্গামণির মৃতদেহ নিয়ে গেল সবাই শ্মশানে, সবার থেকে পৃথক হয়ে গেল সদ্য মাতৃহারা জ্ঞানদাও। এল অতুলও। দুর্গামণির চিতার সামনে বসে, অতুলের মনে এক শ্মশানবৈরাগ্যের উদয় হল। জীবনের যা কিছু বাহ্য আড়ম্বর, তা সবকিছুই ঘৃণ্য মনে হল তার কাছে, রূপমাধুরীর ভিখারি আর সে নয় আজ— নৈঃশব্দ্যে, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সে বলে ফেলল জ্ঞানদাকে— 'আমি যত অপরাধই করে থাকি না কেন, আমাকে তোমার ফিরে নিতেই হবে।' জ্ঞানদার দুর্বল হাতটি শুধু অতুলের হাতের মধ্যে শিউরে উঠল— তারপর দুজনে ধীরে ধীরে চলতে লাগল বাড়ির উদ্দেশে।

স্টার থিয়েটার

'বিরাজ বউ' শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস যেটি নাট্যে রূপায়িত হয়। ১৯১৮ সালে 'স্টার' থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় হত নাটকটির। পরিচালক ছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। সেসময় অমৃতলাল 'স্টার'-এর অন্যতম মালিক। এঁরই করা ১৯২৩-এ রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের সমালোচনাকে, বাংলা নাট্য সমালোচনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ বলে মনে করা হয়। শরৎচন্দ্রের সব উপন্যাসের মধ্যে 'বিরাজ বউ'-ই প্রথম অনূদিত হয় হিন্দিতে। ১৯১৯ সালে। অনুবাদ করেছিলেন চন্দ্রশেখর পাঠক।

• • •

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
'বিরাজ বউ'

হুগলি জেলার সাতগাঁয়ে বাস করত দুই ভাই— নীলাম্বর ও পীতাম্বর। এ অঞ্চলে 'পরোপকারী' অথচ 'গোঁয়ার' নীলাম্বরের মতো মড়া পোড়াতে, কীর্তন গাইতে, খোল বাজাতে ও গাঁজা খেতে কেউ পারত না। অন্যদিকে, খর্বকায়-কৃশ পীতাম্বর দাদা নীলাম্বরের একেবারে বিপরীত প্রকৃতির লোক ছিল। বড় বৌয়ের নাম ছিল বিরাজ আর ছোট বৌয়ের নাম হল মোহিনী। এছাড়াও নীলাম্বরের কাছে

থাকত তার অবিবাহিতা আদরের ভগিনী হরিমতি ওরফে পুঁটি। বড় বৌ বিরাজের নয় বছর বয়সে বিবাহ হলেও, অসাধারণ ছিল তার পতিপ্রেমভক্তি। নীলাম্বরের জ্বর হলে, সেও খাওয়াদাওয়া সব বন্ধ করে দিত, জানতে চাইলে শুধু বলত— 'মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে তো বুঝতে, স্বামী কী বস্তু!' কিন্তু নীলাম্বরের ব্যস্ততা অধিক পরের প্রতি সেবায়, চিকিৎসায়, তার হাতের অব্যর্থ জলপড়া দিয়ে পরকে সুস্থ করায়; পতিপ্রেমে অবিচল স্ত্রীর প্রতি ততটা একেবারেই নয়। এদিকে ছোট ভাই পীতাম্বর পৃথগন্ন হয়েছে— ছোট ভাইয়ের কাছে কোনও সাহায্য না পেয়ে সর্বস্ব খুইয়ে ছোট ভগিনীটির বিয়ে দিয়েছে নীলাম্বর— এমনকি শেষপর্যন্ত ধনী জামাইয়ের পড়ার খরচও জোগাতে হয়েছে তাকে মাসে মাসে। স্বামীর এই হৃতসর্বস্বতা বারংবার পীড়া দিতে লাগল পতিপ্রেমী বিরাজকে। পুঁটিকে রাজরানি করতে সেও চেয়েছিল, কিন্তু তার জন্য স্বামীর সর্বস্বান্ত হওয়াটা সে মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না কোনওমতেই। এদিকে, এ মুলুকের নতুন জমিদার রাজেন্দ্রকুমারের রূপমুগ্ধ এ বাড়ির পুরনো চাকরানি সুন্দরী সতীসাধ্বী বিরাজ কর্তৃক বিতাড়িত হল। দেনা শোধ দেওয়ার জন্য ডুলু মুখুজ্জে আবার নীলাম্বরের নামে সমন জারি করেছে— একথা বিরাজ জানতে পেরেছে ছোট বৌ মোহিনীর কাছ থেকে। শুভাকাঙ্ক্ষী মোহিনী চেয়েছিল তার সোনার হার দিয়ে বট্‌ঠাকুরের এই দেনা মেটাতে। কিন্তু বিরাজ তাতে রাজি হয়নি, তবে এই ঘটনায় ছোট বৌকে সে এক নতুন রূপে আবিষ্কার করেছে। এদিকে, নীলাম্বর কলকাতা গিয়ে অর্থোপার্জনের বাসনা প্রকাশ করলে, বিরাজ তাকে বাধা দেয়। ইতিমধ্যে দুর্গাপুজো এসে পড়াতে, প্রবল দারিদ্র্যের মাঝেও সুন্দরীকে দিয়ে স্নেহের পুঁটির কাছে কয়েকটি টাকা, কিছু মিষ্টান্ন পাঠিয়েছে নীলাম্বর বিরাজের অজান্তেই। কিন্তু সেকথা বিরাজের কাছে গোপন থাকেনি, ফলত পতিনিষ্ঠ বিরাজ স্বামীর এই আচরণের প্রতি ক্রুদ্ধ হবে— এটাই স্বাভাবিক। এরই মধ্যে একদিন দুই জায়ে যখন স্নানের জন্য বাঁধানো ঘাটে গেল, তখন গাছতলায় নতুন জমিদার রাজেন্দ্রকুমারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার এই প্রবৃত্তির নিন্দা করল বিরাজ। কূট দেবর, পীতাম্বর তা দেখে বৌঠানের আচরণের কদর্য ব্যাখ্যা করে দাদারই সামনে। বৌদির চরিত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ হানতে সে এতটুকু কুণ্ঠিত হল না। বিরাজ এই কথা শুনতে পেয়ে লজ্জায়, ঘৃণায় শিহরিত হল। আহত হল ছোট বৌ মোহিনীও, স্বামীর বিরূপ আচরণের জন্য ক্ষমা চাইল বৌঠানের কাছে। অসম্মানের আঘাতে জর্জরিত বিরাজ, স্বামীর পাতে মোটা চাল দেখে সহ্য করতে না পেরে স্বামীর খাওয়ার সময় গেল না পর্যন্ত স্বামী ডাকা সত্ত্বেও। এরই মধ্যে কয়েকদিন ধরেই বিকেল হতেই বিরাজের শীত করে জ্বর আসে। জনপ্রাণীশূন্য একা ঘরে জ্বরে, দুশ্চিন্তায়, অনাহারে মৃতকল্প যখন বিরাজ, তখনও তার স্বামী নীলাম্বর পরোপকারে মত্ত। কিন্তু প্রবল অসুস্থ বিরাজ তখনও স্বামীর গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় প্রতিবেশী দরিদ্র তুলসীর কাছে চাট্টি চালের ভিক্ষা চাইতে যায়। তিনদিন পর ফিরে এল নীলাম্বর। ঘরে স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে সন্দেহের বশে সে বলেই ফেলল— 'দূর হ সুমুখ থেকে— ও মুখ আর দেখাস নে— অলক্ষ্মী, দূর হয়ে যা!' মার খেয়ে, অশ্রাব্য কটু কথা শুনে লজ্জায়, ধিক্কারে বর্ষার দুরন্ত রাতে বিরাজ গৃহত্যাগ করল। ধূর্ত পীতাম্বর এই গৃহত্যাগের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিল। গ্রামের সবাই জানল, বিরাজ জলে ডুবে মরেছে। বৌঠানের কাছে পূর্বপ্রতিশ্রুতিমতো মোহিনী দাদা নীলাম্বরের ভার নিল।

এদিকে চার বছর পর পুঁটি এল তার স্বামী-পুত্র নিয়ে 'বড়মানুষের মতোই'। সবকিছু জেনেশুনে পথেই সে অনেক কান্নাকাটি করল, তারপর ঠিক করল— দাদাকে নিয়ে সে পশ্চিমে বেড়াতে যাবে। নীলাম্বর চাইল, সদ্য স্বামীহারা বিধবা মোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কিন্তু মোহিনী যেতে চাইল না। এদিকে, 'বিরাজের মরাই উচিত ছিল, কিন্তু বিরাজ মরিল না।' প্রবৃত্তির কাছে নতিস্বীকার করতে না চেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেও সে বেঁচে যায় স্থানীয় লোকেদের তত্ত্বাবধানে, হুগলিরই হাসপাতালের চিকিৎসাধীনে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বিরাজ পথে পথে ঘুরে বেড়ায় পাগলিনির মতো। সঙ্গী একটি জীর্ণবস্ত্র এবং একটি ভিক্ষার ঝুলি। অত্যন্ত দুর্বল, বহুদিনের কাশি যক্ষ্মায় পরিণত, বাঁ হাতটি পঙ্গু, বাঁ চোখটি অন্ধ— এই শরীরকে নিয়েও সে গরুর গাড়িতে চড়ে পৌঁছয় তারকেশ্বরে। সেখানেই পথের মধ্যে একদিন অজ্ঞাতসারেই তার পঙ্গু হাতটি স্খলিত হয়ে পড়লে, এক পথিক তার হাতটি মাড়িয়ে দিয়ে যায়। পরে তার সম্বিৎ ফিরলে, সে তার সঙ্গী ভগিনীকে ভিখারিনিটির কাছে পাঠায়। ভিখারিনিটির মুখের হাসির মাধুর্য দেখে পুঁটি চিনতে পারে তার বৌদিকে। তারা নিয়ে আসে তাকে বাড়িতে— বৌঠান ফিরে এল তার আদরের মোহিনীর কাছে। কিন্তু বিরাজ বুঝতে পারে তার দিন সমাগতপ্রায়। মৃত্যুর পূর্বদিন রাত্রি বারোটার পর সে ভুল বকতে আরম্ভ করে— কিন্তু সেই সবকিছুর মধ্যেই ছিল তার অত্যুগ্র পতিপ্রেম। পরদিনই ভোরবেলায় বিরাজের শ্বাস উঠল— সে আর কথা বলল না। স্বামীর কোলে শুধু মাথাটুকু রেখে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'দুঃখিনী' বিরাজ সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটিয়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিল।

অপরাজিতা রায় (আচার্য)

রুপোলি পর্দায় বিরাজ বউ। মুক্তি: ১৯৭২

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা
গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে
জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়

সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
সংগীত ও পরিচালনা: দীপক চৌধুরী
অভিনয়: সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে
ভাষ্যপাঠ: অনসূয়া মজুমদার
গান: স্বপন বসু ও আরও অনেকে

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: books@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

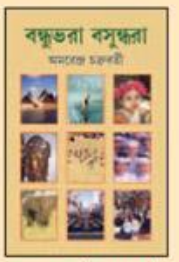

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▸ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
Read / Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
Traveller
To be launched shortly
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com
আরও অনেক বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

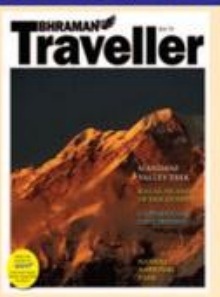

KALER KASHTIPATHAR ◻ Vol. 1 No. 13-14 ◻ 1 May-June 2013 ◻ Rs. 30 Title Code: WBBEN 14529/25/1/2012-TC ◻ Declaration No. 185 dt. 05/09/12

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd.
Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd.,
Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
Read Online ▸ www.ebhraman.com

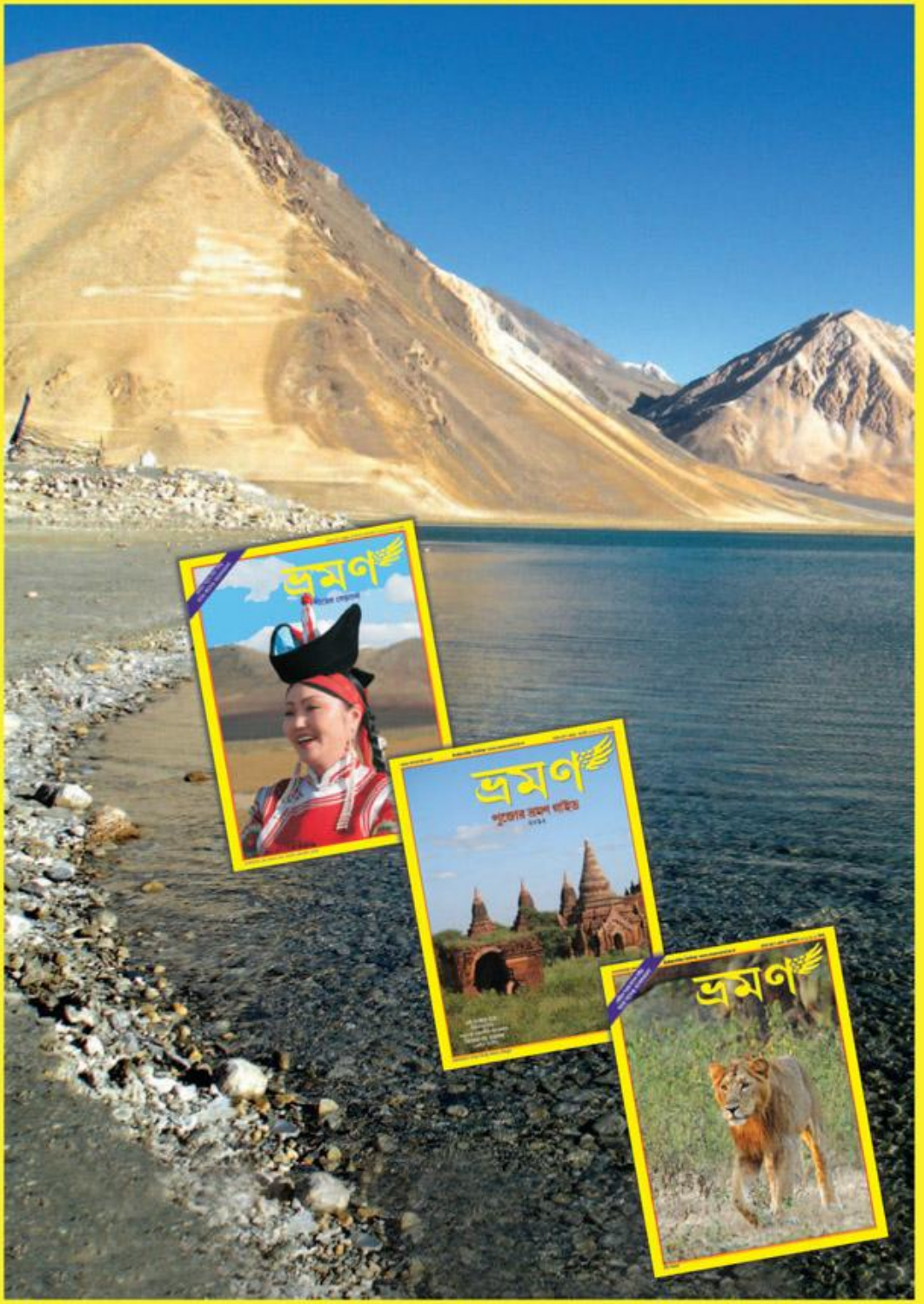

The most read travel magazine in India*

**Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q4*